Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারী অধিকার বনাম নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত ফাতেমা মুনিয়া

রোলঃ 23100120835

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারী অধিকার বনাম নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত ফাতেমা মুনিয়া

রোলঃ 23100120835

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারী অধিকার বনাম নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত ফাতেমা মুনিয়া, আইডিঃ 23100120835 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারী অধিকার বনাম নারীবাদ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নুসরাত ফাতেমা
(মুনিয়া)

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

নুসরাত ফাতেমা মুনিয়া

আইডিঃ 23100120835

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা : 6

নারীর সামাজিক অবস্থান ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা 7

ইসলামে নারীর ধর্মীয়-সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার 14

আল কুরআনে নারী: আল্লাহ দিলেন নারীর মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা 18

কুরআনে নারীর অধিকার: প্রসঙ্গ মীরাছ 52

মীরাছে নারীর হিস্যা ও ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধান 59

মীরাছে নারীর হিস্যা: শরীয়তের হুকুম ও সমাজের প্রচলন 77

শরীয়তের মীরাসনীতি অনুসরণ না করার বহুমুখি কুফল 80

আধুনিক সভ্যতার আধুনিক চিন্তা 92

নারীর নিরাপত্তা আল্লাহর বিধানেই 94

নারীর গৃহে অবস্থান : পরাধীনতা নয়, মৌলিক অধিকার 98

তাঁরা আমাদের পূর্বসুরী 103

মহীয়সী নারীদের বীরত্বগাথা 108

নারী-শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি 132

নারী ক্ষমতায়ন 150

ফেমিনিজম বা নারীবাদ 170

Feminism Classification (নারীবাদের শ্রেণিবিভাগ) 178

নারীবাদের উদ্ভব ও বিস্তৃতি(তরঙ্গসমূহ) 180

(নারীবাদের সমালোচকদের মতে বর্তমান সমস্যাসমূহ) 182

নারী-স্বাধীনতার নামে পর্দাহীনতার দিকে আহ্বান 185

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ এবং সুরক্ষা-ব্যবস্থা 187

পর্দাহীনতার ক্ষতি 191

নারী মুক্তির চূড়ান্ত পরিণতি 192

একজন ইউরোপে বসবাস করা পিতার অভিজ্ঞতা:.....209
দ্বিতীয় দশকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার নতুন সিলসিলা: ইসলামি নারীবাদের সাতকাহন.....209
রিদ্দার পথে একজন মুসলিম ফেমিনিস্টের যাত্রা.....221
মুসলিম সমাজে নারীবাদ দূরীকরণে করণীয়.....228
উপসংহার.....233
রেফারেন্সঃ(ধারাবাহিকভাবে).....234

ভূমিকা :

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন *(আলে ইমরান ১৯)*। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً-

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' *(নিসা ১)*।

আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান

করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি

কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

নারীর সামাজিক অবস্থান ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান ও অধিকার

শুরুতেই আমরা ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলি, যেগুলো সামনের আলোচনা বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি। ইসলাম এই বিষয়গুলো নারীদের দ্বীনি-দুনিয়াবি উপকারের বিষয়টা সামনে রেখেই করেছে। আমরা আরবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব শাইখ আব্বাস মাহমুদ আল উক্কাদ কর্তৃক রচিত কিতাব 'আল মারআতু ফিল কোরআন' থেকে সামান্য আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, বিস্তৃত গবেষণাসমৃদ্ধ এই কথাগুলো একজন সচেতন মানুষের জন্য সত্যের দিকনির্দেশক।

সম্মানিত লেখক ইসলাম-পূর্ব যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও নানা সমাজব্যবস্থায় নারীদের সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন:

হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি-নির্ধারক 'মনুশাস্ত্র' অনুযায়ী বাবা-স্বামী অথবা উভয়ের মৃত্যুর পর (ছেলেদের মতো) নারীর জন্য আলাদা কোনো অধিকারের কথা স্বীকার করা হয় না। মনুশাস্ত্রের আইন অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর জন্য স্বামীর কোনো নিকটাত্মীয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জরুরি। কোনো অবস্থাতেই একজন নারী স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো স্বাধীনতা রাখে না।

হিন্দুদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী, কোনো মেয়ে তার স্বামী থেকে আলাদা থাকতে চাইলেই তার অধিকার খর্ব করা হতো সবচেয়ে বেশি। এই রীতি অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জন্য স্বামীর মৃত্যুর দিন আত্মহত্যা করা বা নিজেকে চিতায় জ্বালানো জরুরি ছিল। চিতার আগুনে নিজেকে ভস্ম করার এই পাশবিক ও অমানবিক রীতি ব্রাহ্মণ সমাজে সেই আদিকাল থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের অপছন্দের কারণে এই বর্বর ও মনুষ্যত্বহীন রীতিকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেওয়া হয় ।

হাম্মুরাবির আইন (ব্যাবিলন যার জন্য বিখ্যাত হয়েছিল) নারীদের গৃহপালিত পশু গণ্য করেছিল। তাদের দৃষ্টিতে একজন নারীর মর্যাদা কতটুকু, সেটা এই আইন দেখেই বোঝা যায়। হাম্মুরাবির আইন অনুযায়ী যদি কেউ কারো মেয়েকে খুন করে, তাহলে খুনির নিজের মেয়েকে মৃত মেয়ের বিনিময়ে দিয়ে দিতে হবে, যাতে মৃত মেয়েটির নিকটাত্মীয়রা তাকে হত্যা করতে পারে, ক্রীতদাসী বানাতে পারে অথবা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে। কিন্তু আইন প্রয়োগের স্বার্থে প্রায়ই এই নিষ্পাপ মেয়েদের হত্যা করা হতো।

প্রাচীন গ্রিসে নারীরা তাদের সকল অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তাদের অনেক বড় বড় বাড়িতে অবস্থান করতে হতো আর সেই বাড়িগুলোর অবস্থানও ছিল রাস্তা থেকে অনেক দূরে! সেই বাড়িগুলোতে ছোট ছোট অল্প কিছু জানালা থাকত। নজরদারির জন্য বাড়ির গেটে সব সময় দারোয়ান রাখা হতো। স্ত্রী ও বাড়ির অন্য মহিলাদের প্রতি অমনোযোগের কারণে গ্রিকের বড় বড় শহরগুলোতে এমন অনুষ্ঠান সাধারণ হয়ে উঠেছিল, যেখানে গায়িকা এবং সুন্দরী মেয়েদের মাধ্যমে বিনোদন নেওয়া হতো। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে পুরুষের সাথে নারীর উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল না বললেই চলে। সে সময়ের দর্শনশিক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও কোনো নারীকে উপস্থিত পাওয়া যেত না, বরং ইতিহাস সাক্ষী, সে সময়ের মানুষের চোখে বংশীয়া-অভিজাত নারীরা পেশাদার নারী বা মুক্ত দাসীদের মতো ন্যূনতম মর্যাদা ও সম্মানেরও অধিকারী ছিল না।

অ্যারিস্টটল স্পার্টার গোত্রের লোকদের ওপর এ ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেছিলেন, তারা নিজ পরিবারের মহিলাদের সাথে নম্র আচরণ করে! তারা নিজ বংশের মহিলাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভ, বিবাহবিচ্ছেদ ও স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে! যার মাধ্যমে তারা সমুন্নত মর্যাদা লাভ করেছে। অ্যারিস্টটল স্পার্টার গোত্রের নৈতিক অধঃপতন ও চরিত্র ধ্বংসের জন্য মহিলাদের এই অপাত্রে স্বাধীনতা প্রদান ও নারীদের স্বাধীনচেতা মনোভাবকেই দায়ী করেছেন।

মহিলাদের সাথে প্রাচীন রোমানদের আচার-আচরণ প্রাচীন হিন্দুদের মতোই ছিল। রোমান আইন অনুযায়ী তারা পিতা-স্বামী এবং পুত্রের নিয়ন্ত্রণেই বসবাস করত। নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও সভ্যতার যুগে তাদের দাবি ও চিন্তা এটাই ছিল, মহিলাদের একবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব নয়, আবার তাদের গলা থেকে পরাধীনতার শিকল খুলে ফেলাও সম্ভব নয়।সুতরাং বিশ্ববিখ্যাত লেখক কাটোর এই উক্তিটি আজও আমাদের মাঝে সুপরিচিত: NONGUAM EXVITUR SERVITUS MULIE BRIO

রোমের নারীরা এ ধরনের অমানবিক ও পৈশাচিক বিধিনিষেধ থেকে সে সময় মুক্তি পায়, যখন রোমান দাসরা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় এবং স্বাধীনচেতা রোমান নারীদের দাস হিসেবে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় নারীদের কিছু অধিকার ও কর্তৃত্ব উল্লেখ করার পর শাইখ আব্বাস মাহমুদ আল উক্কাদ লিখেছেন:

এই পৃথিবীর বুকে ইসলাম নিজের সভ্যতা ও উৎকর্ষের মাধ্যমে বিপ্লব সৃষ্টি করার আগেই মিসরীয় সভ্যতা ও আইনকানুন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যে রোমান সভ্যতার পতন ও তার বিলাসিতা চিত্তবিনোদনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পার্থিব জীবনকে ঘৃণা করার প্রবণতা জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবন-পরিবার এবং সন্তানের প্রতি মানুষের অনীহা ও বিরক্তি ভাব তৈরি হয়েছিল। সন্ন্যাসী কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য দেহ ও নারীকে অপবিত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। নারীদেরই তখন সমস্ত পাপ ও অকল্যাণের উৎস মনে করা হচ্ছিল এবং কোনো ধরনের প্রয়োজন ছাড়াই তাদের থেকে দূরে থাকাকে সমাজের দৃষ্টিতে ভালো মনে করা হচ্ছিল।

এই মধ্যযুগীয় ধারারই অন্যতম একটা প্রভাব ছিল, খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু ধর্মতাত্ত্বিক নারীর মানব প্রকৃতিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছিলেন এবং ম্যাকনের সভায় তাঁরা প্রশ্ন করছিলেন, তারা কি আত্মাহীন দেহ, নাকি প্রাণবিশিষ্ট শরীর, যার সাথে জন্ম-মৃত্যু ও সফলতা-ধ্বংস সম্পৃক্ত হতে পারে? সে সভায় উপস্থিত লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এটাই মনে করেছিলেন এবং এ মতামতই উপস্থাপন করেছিলেন যে নারীদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা থেকে বঞ্চিত এবং হজরত ঈসা (আ.)-এর মা মরিয়ম আলাইহাস সালাম ছাড়া অন্য কেউ এই নিয়মের বহির্ভূত নন।

রোমান যুগের এই প্রভাব-প্রবণতা তৎপরবর্তী মিসরীয় সভ্যতায় নারীদের অবস্থানকেও প্রভাবিত করেছিল। মিসরের লোকজনের ওপর রোম সাম্রাজ্যের জুলুমের আধিক্য তাদের বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়াত্যাগের কারণ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সে সময়ের অনেক লোক এই বৈরাগ্যবাদকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র (যার মধ্যে তারা নারীকে শয়তানের ষড়যন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার মনে করত) থেকে দূরে থাকার অসিলা মনে করত।
হিন্দুধর্মে মহিলাদের অধিকার ও সম্মান

এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকসের লেখক নারী সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে লিখেছেন:

ব্রাহ্মণ ধর্মে বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আইন অনুযায়ী সমাজের প্রত্যেক মানুষের বিয়ে করা উচিত। কিন্তু মনুশাস্ত্রের আইন অনুযায়ী, স্বামী স্ত্রীর প্রধান পরিচালক। স্বামীকে অসন্তুষ্টকারী কোনো কিছুই তার করা উচিত নয়, এমনকি যদি সেটা হয় অন্য কোনো নারীর সাথে সম্পর্ক রাখা! এমনকি মনুশাস্ত্রের আইন অনুযায়ী, কোনো পুরুষ মারা গেলে নারীর জন্য মুখে তার নাম উচ্চারণ করাও উচিত নয়। যদি কোনো মহিলা দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহলে সে প্রথম স্বামীর উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকবে। কোনো মহিলা যদি নিজ স্বামীর অবাধ্য হয়, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। মনুশাস্ত্রের আইন অনুযায়ী, একজন মহিলা কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। সে মোহর পেতে পারে না, স্বামী মারা গেলে তাকে নিজের বড় ছেলের অধীনে থাকতে হয়,

এমনকি স্বামীর এটা অধিকার আছে যে সে চাইলে নিজের স্ত্রীকে লাঠি দিয়েও মারতে পারে!

ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে (RAY STRACHEY) ভারত সম্পর্কে লিখেছেন :

ঋগ্বেদে (যাতে মানুষের আদি পুরুষের আলোচনা ও বিবরণও আছে) নারীদের নিম্নপর্যায় এবং অপমানজনক স্থান দেওয়া হয়েছে। পরে লোকদের এটা বোঝানো হয়েছে যে তারা আধ্যাত্মিকভাবে বিপর্যস্ত; বরং তারা আত্মাহীনের মতোই। মৃত্যুর পর পুরুষের উত্তম গুণাবলি ও সংস্পর্শ ছাড়া সে মানবমনে বেঁচে থাকতে পারে না। সমাজের রীতিনীতির শিকল (যা ধীরে ধীরে মানবসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসে ছিল) ধর্মীয় অনুশাসন পালনের নামে একজন নারীর সমস্ত আশাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, একজন মহিলার পক্ষে কোনো উচ্চাভিলাষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জন্ম দেওয়া অসম্ভব করে তুলেছিল। এ সময় জন্মদানকারী মায়েরা নিজ মেয়েকে নিজেদের ঘর-বিছানা, অলংকারপ্রীতি, অশুভ লালসা-কামনা, ক্রোধ-বিশ্বাসঘাতকতা এবং চরিত্রবিধ্বংসী অন্যান্য স্বভাব শিক্ষা দিত। অবস্থা এতটাই করুণ ছিল, সমাজে মিথ্যাকে যতটা খারাপ মনে করা হয়, মহিলাদের ঠিক ততটাই খারাপ মনে করা হতো। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এটা একটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য ছিল।
মনুশাস্ত্রের আইন অনুযায়ী, নারীরাই পুরুষকে পৃথিবীতে খারাপ পথে পরিচালিত করেছে। আর পুরুষদেরও এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে তারা নারীর সংস্পর্শে থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব হতে পারে। বাল্যবিবাহের প্রথা, বিধবাদের প্রতি ঘৃণা, নারীর পর্দা সে সমাজে এতটা অবহেলিত ছিল, যা কল্পনাতীত।
সন্তান জন্মদানকারী নারীর গুরুত্ব সেখানে একটি চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়ে বেশি ছিল না। মানবতাবিবর্জিত সে সমাজে একটি কন্যাশিশুর মৃত্যু তার জন্য বলতে গেলে রহমতই ছিল। কারণ, তার জন্ম হচ্ছে এমন এক সমাজে, যেখানে তাকে সন্দেহকারী, মন্দের উৎস, প্রতারক, জান্নাতের রাস্তার প্রতিবন্ধক এবং জাহান্নামের দরজা মনে করা হয়।

ভারতীয় সমাজে মহিলাদের অবস্থা

ব্রাহ্মণ্য যুগ এবং হিন্দুত্ববাদী সভ্যতায় নারীর মর্যাদা বৈদিক যুগের মতো ছিল না। মনুশাস্ত্রের আইন অনুযায়ী (ড. লি ব্যানের মতে) নারীদের সব সময় দুর্বল ও অবিশ্বস্ত মনে করা হতো। নারীদের আলোচনা এলেই তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান-অপদস্থতার সাথে উল্লেখ করা হতো। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীরা এতটাই নিপীড়িত ছিল যে স্বামী মারা গেলে নারীও যেন 'জীবন্ত মৃতদেহে' পরিণত হতো! তাকেও জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। সে সমাজে নারীরা কখনোই দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত না। তার ভাগ্যে যেন তিরস্কার-ভর্ৎসনা ও অপমান-অপদস্থতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একজন নারী বিধবা হয়ে যাওয়ার পর নিজের মৃত স্বামীর ঘরের চাকরানি ও দাসী হিসেবেই তাকে অধিকাংশ সময় জীবন পার করতে হতো। তৎকালীন সমাজের অধিকাংশ নারী স্বামীর সাথে নিজেকে জীবন্ত চিতায় দগ্ধ করত।

ড. লি ব্যান লিখেছেন, বিধবাদের নিজ স্বামীর মৃতদেহের সাথে নিজেকে পোড়ানোর কথা মনুশাস্ত্রে উল্লেখ নেই। তবে জানা যায়, এই প্রথাটি ভারতে প্রচলিত ছিল। কারণ, গ্রিক ঐতিহাসিকেরা এটার কথা উল্লেখ করেছেন।
মোটকথা, এই সবুজ-শ্যামল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর নৈসর্গিক দেশে- যা বাস্তবেই প্রাকৃতিক অর্থ-সম্পদ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল-খোদাপ্রদত্ত আসমানি শিক্ষা থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল। শরিয়তের গ্রহণযোগ্য উৎসসমূহ দীর্ঘদিন এখানে অনুপস্থিত থাকার কারণে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের জল্পনা-কল্পনা ও বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক নিয়মনীতি ও কুসংস্কারের বিস্তার হয়েছিল। সে সময়ের পৃথিবী অজ্ঞতা-কুসংস্কার, নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা, স্বার্থপর কামনা ও শ্রেণিবাদের বৈষম্যের কারণে অন্যায় পথে ধাবিত হচ্ছিল।পুরো বিশ্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও যোগ্য নেতৃত্বলাভের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত হচ্ছিল।

জাহেলি যুগে মহিলাদের মর্যাদা ও অধিকার

জাহেলি সমাজে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্যবহার সাধারণ ব্যাপার ছিল কঠিনভাবে তাদের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছিল। নারীর সম্পত্তি পুরুষের নিজস্ব সম্পদ বলেই

বিবেচিত হতো।তারা সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের কোনো কাউকে বিয়ে করারও অনুমতি দেওয়া হতো না। অন্যান্য সম্পত্তি এবং পশুদের মতো তারাও উত্তরাধিকারসূত্রে একে অন্যের কাছে স্থানান্তরিত হতো। পুরুষেরা তাদের পূর্ণ অধিকার আদায় করে নিত কিন্তু নারীরা তাদের অধিকার ভোগ করতে পারত না। পানাহারের অনেক জিনিস থেকে নারীরা বঞ্চিত ছিল। নারীবিদ্বেষ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো!

প্রখ্যাত আরব ঐতিহাসিক হাইসাম ইবনে আদি উল্লেখ করেছেন, নারীদের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা আরবের সব গোত্রেই প্রচলিত ছিল কিন্তু সমাজের একজন সেটা অনুসরণ করলেও অন্যান্য দশজন সেটার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না। ইসলাম পৃথিবীর বুক আলোকিত না করা পর্যন্ত চলতেই থাকে এই বর্বরতা ও পৈশাচিকতা। কেউ কেউ তো ক্ষুধার ভয়, মেয়ের খরচ সামলাতে না পারার কারণে, আর কেউ কেউ লজ্জা ও দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করত। আরবের কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এ-জাতীয় অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের কিনে নিত এবং তাদের নতুনভাবে বাঁচতে সাহায্য করত।
সা'সায়া' বিন নাজিয়াহ আরবদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত তিনি ফিদিয়া দিয়ে ৩০০ মেয়েকে জীবন্ত কবর দেওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কখনো এমনো হতো, বাবার ব্যবসায়িক দীর্ঘতার কারণে মেয়ে বড় হয়ে যেত। নিষ্ঠুর বাবা ছোটবেলায় তাকে জীবন্ত দাফনের সময় পেতেন না। পরবর্তী সময়ে এই মূর্খ-পাষাণ বাবা প্রতারণা করে মেয়েকে বিভিন্ন বাহানায় ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে জনমানবহীন স্থানে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাকে জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম গ্রহণের পর অনেক আরব্য সাহাবি এ রকম হৃদয়বিদারক, দুঃখজনক ও করুণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ইসলামে নারীর ধর্মীয়-সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার

ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে, বিশ্বের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানে নারীজীবনে যে বিপ্লব এনেছে, তা শিক্ষিত নারীদের জেনে রাখা উচিত। এখানে আমি সংক্ষেপে ইসলামে নারী অধিকারের সেই সমুন্নত দিকগুলো আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, রীতিনীতি, আইনকানুন ও শিক্ষাকে যদি ইসলামের অনন্য ও সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থার সাথে তুলনা করা হয়, ইসলাম নারীর মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য, তাকে মানবসমাজে যথাযথ সম্মান প্রদানের জন্য, নিষ্ঠর আইন, অন্যায় প্রথা, সমাজের গর্হিত অভ্যাস, পুরুষের স্বার্থপরতা-অহংকার থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেগুলো যদি একজন সচেতন মানুষ জানতে পারেন, তবে তার চোখ খুলে যাবে। তিনি সচেতন হবেন। এই সমুন্নত ও সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা একজন শিক্ষিত ও বাস্তববাদী মানুষকে অবশ্যই ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি দিতে ও কোরআন-সুন্নাহর আইনের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করবে। নারী সম্পর্কে জাহেলি দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোরআনের ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বোঝার জন্য গভীরে না গিয়ে সাদামাটাভাবে পবিত্র কোরআনুল কারিম ও হাদিসে নববির অধ্যয়নই যথেষ্ট।

আপনি অবশ্যই জেনে থাকবেন, দ্বীনি বিষয়ে, দ্বীনের বিভিন্ন আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও আকিদার ক্ষেত্রে, ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে, কমপক্ষে আমরা যে উম্মাহর সাথে সম্পৃক্ত আছি, যে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত আছি, সেই দ্বীনের মূল কাজগুলো থেকে কখনোই নারীদের বঞ্চিত করা হয়নি। দ্বীনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের অবহেলা করা হয়নি; বরং এ ক্ষেত্রে তারাও পুরুষদের মতো সরাসরি ইলমচর্চা ও দ্বীনি মজলিশে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা ও অধিকার রাখেন। কারণ, পুরুষদের মতো তাদের দায়িত্বেও আছে স্বতন্ত্র বিধিবিধান, মাসআলা-মাসায়েল, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। এ ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে তারা চাইলে পুরুষদের মতোও সমান অংশগ্রহণকারী হতে পারেন। চাইলে তারা একইভাবে দ্বীনি জ্ঞান, ইসলামের সেবায় সমান অংশ নিতে পারেন। তাকওয়া, কল্যাণকর কাজ, নেক কাজে সহযোগিতা এবং সমাজ বিনির্মাণে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারেন।

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আমল কবুল হওয়া, জাহান্নাম থেকে মুক্তি, পারলৌকিক সুখ ও পরকালের সাফল্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সব সময় পুরুষের সাথে মহিলাদের আলোচনাও করা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারিমে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرا

পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (সুরা নিসা: আয়াত:১২৪) পবিত্র কোরআনুল কারিমের এই আয়াতে মুমিন নর-নারীর পারলৌকিক পুরস্কারপ্রাপ্তির সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। যে সকল অজ্ঞ-অদূরদর্শী ও বিদ্বেষী খ্রিষ্টান-পৌত্তলিক লেখক 'ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান নেই' বলে অযথা চিল্লাচিল্লি করছেন ও নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করছেন, আমরা তাদের পবিত্র কোরআনুল কারিম পড়ে দেখার অনুরোধ করছি। পাশাপাশি এ কথাও মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি, ইসলাম নারী জাতির স্বাধীনতা, অধিকার, গৌরব ও মর্যাদার যে সুউচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছে, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে তার কোনো তুলনাই হয় না। পৃথিবীতে এমন অনেক ধর্ম আছে, যেখানে নির্দিষ্ট কিছু কাজ পুরুষের জন্য একচেটিয়া। তাতে নারীর অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। সে সমাজের বাস্তবতা হলো, নারীরা তো সেসব কাজ করতেই পারেন না, বরং উল্টো শোনা যায়, নারীরা সেটি স্পর্শ করলে বা তার কাছে গেলে সেটি অদ্ভুত হয়ে যায়। নারীর সঙ্গ-ছোঁয়া সেটিকে ধ্বংস করে দেয়।

খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মগুলোর একটি। সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লোক খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। ইয়োরোপে খ্রিষ্টধর্মের অকল্পনীয় বিস্তৃতি ও বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও এটি অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে।

ইতিহাস আমাদের বলে, মধ্যযুগে একটা সময় এমনো অতিবাহিত হয়েছে, যখন নারীরা তাদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সে সময় নারীরা কোনো কিছুর মালিক হতে পারত না। তাদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা কোনো জমির মালিক হতে

পারত না। এমনকি অনেক ইবাদত ও শরয়ি দায়িত্বও তাদের জন্য অবৈধ ছিল। সে সময়কার মানুষ নারীদের অস্পৃশ্য মনে করে তাদের ছায়া থেকে পালিয়ে বেড়াত। তৎকালীন সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক নারী ও অল্পবয়স্ক মেয়েকে বৈরাগী বানিয়ে উপত্যকায় বসিয়ে দিয়েছিল। এসব মেয়ের মায়েরা যখন কান্নাকাটি ও চিৎকার করতে করতে নিজেদের মেয়েকে খুঁজতে আসত, তখন এসব সন্ন্যাসী পালিয়ে বেড়াত, যাতে এসব নারীর ছায়াও তাদের ওপর পতিত না হয়।

এটা তো পবিত্র কোরআনুল কারিমের এক অলৌকিক মুজেজা যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই কিতাবে সব বিষয়ে নারীদের কথা আলাদা আলাদা উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ে যদি নারী-পুরুষের কথা একসাথে আলোচনা করা হতো, তাহলে অনেকেরই হয়তো সেটা বুঝতে সমস্যা হতো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কথাও আলোচনা করেছেন তাদের উৎসাহিত করার জন্য, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। নারীদের একান্ত সমস্যাগুলো দূর করার জন্যও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এমনকি পবিত্র কোরআনুল কারিম ও হাদিসে নববির এমন অনেক বিধান, যেগুলোতে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ নেই, সেখানেও নারীদের কথা আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনুল কারিমে শুধু আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য, ধর্মীয় উপাসনা, দ্বীনি কর্তব্য পালন, নামাজ-রোজা আদায়ের ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমতা ও অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষানুযায়ী নারীরা সামর্থ্যবান পুরুষ, ওলামায়ে কেরাম, যুদ্ধক্ষেত্রের মহান বীর, অসীম সাহসী, অটল-অবিচল, দৃঢ়সংকল্প, সৎ কাজের আদেশদাতা, অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী, নেতৃত্বদানকারী শাসকবর্গ, ইসলামি সমাজ পর্যবেক্ষক এবং সঠিক পথ অনুসরণকারীর মতো আদর্শবান হওয়ার পাশাপাশি পুরুষদের মতো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে মানুষকে আহ্বানকারী এবং দ্বীনের দায়ী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে ঐক্যবদ্ধ

ও একে অপরের সহযোগী হিসেবে দেখতে চান। পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্টভাবে বলেছেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পর একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজ থেকে বাধা দেয়, তারা নামাজ আদায় করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে।তারা এমন লোক,যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা নিজ রহমত অবতীর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ৭১)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্মান ও মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছার মাধ্যম হিসেবে নিখুঁত শারীরিক গঠন, লিঙ্গের বৈচিত্র্য, দৈহিক রং ও দেশ-জাতি-বংশ-গোত্রের ঊর্ধ্বে শুধু তাকওয়াকেই প্রাধান্য দান করেছেন। পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَانْثَى وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتْقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানুষেরা। আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। সবকিছুর খবর রাখেন। (সুরা হুজুরাত: আয়াত ১৩)

নারীর মাঝে সাহস সঞ্চার, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটাতে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাদের (INFERIORITY COMPLEX) থেকে দূরে রাখার জন্য পবিত্র কোরআনুল কারিম ও হাদিসে নববিতে আলোচিত নারীদের গুণাবলিই

যথেষ্ট। পবিত্র কোরআনুল কারিম ও হাদিসে নববির এই সমুন্নত শিক্ষার ফলস্বরূপ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মহিলারা ইসলামি জ্ঞানের শিক্ষক, প্রশিক্ষক, জিহাদকারী এবং রোগ-ব্যাধিতে সেবা-শুশ্রূষাকারী, সাহিত্যিক, লেখক, কোরআনুল কারিমের হাফেজ, হাদিস বর্ণনাকারী, আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ উপাসনাকারী, দুনিয়াবিরাগী এবং সমাজসেবক হয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন প্রচুর নারীর কথা আলোচিত হয়েছে, যারা ছিলেন ইলমের ময়দানে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। যাদের থেকে অসংখ্য মানুষ ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন, অসংখ্য মানুষ নিজেদের পরিশুদ্ধ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য নারীর কথা পাওয়া যায়, যারা অভাবনীয় ব্যক্তিত্ব ও অকল্পনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সামগ্রিক অর্থেই তারা ছিলেন আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

ইসলাম একজন মুসলিম নারীকে যেসব অধিকার দিয়েছে, তার কয়েকটি হলো: সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের অধিকার, ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার, (প্রয়োজনের সময়) স্বামী থেকে তালাক গ্রহণের (খুলা) অধিকার, বাগ্‌দান শেষ করার অধিকার (যদি নারীর বিয়েতে সম্মতি না থাকে) দুই ঈদ, জুমা ও জামাতের সাথে নামাজে অংশগ্রহণের অধিকার। এগুলো ছাড়া অন্য আরো অসংখ্য অধিকারের কথা ফিকহসম্পৃক্ত লিখিত বইগুলোতে পাওয়া যায়।

আল কুরআনে নারী: আল্লাহ দিলেন নারীর মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা

بأي ذنب قتلت وإذا المولودة سئلت

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে; কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।-(সূরা তাকভীর, আয়াত: ৮-৯)

এই আয়াতে নারীর বিষয়ে জাহেলী যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সে সমাজে পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীর অবস্থান। কন্যা সন্তানের জন্ম সেখানে ছিল অভিশাপ

আর অপমানের বিষয়। যেন তা মহাপাপ বা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ। অপমানবোধ আর মর্যাদা রক্ষায় জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা সন্তানকে। কত হীন মানসিকতা ও কতটা অপমানবোধ হলে মানুষ নিজের ঔরসজাত সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারে। সেখানে তো নারীকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। না নিজের সত্তার ওপর ছিল তার কোনো অধিকার, না সম্পদের উপর; বরং সে নিজেই ছিল সম্পদ; ওয়ারিসসূত্রে যার হাত বদল হত।ইসলাম এল, নারী মুক্তি পেল। ঘোষণা হল, কত নিষ্ঠুর তোমাদের এ কাজ।

কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হল 'সুসংবাদ'

يتوارى من القوم مِن سُوءِ مَا يُشرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ

أم يدشة في التراب ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের 'সুসংবাদ' দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। (সূরা নাহ, আয়াত: ৫৮-৫৯)

কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হচ্ছে 'সুসংবাদ'।
আধুনিক জাহেলী যুগে আজো কিন্তু নারীর জন্ম 'সুসংবাদ' নয়।
তখন নারীকে পুঁতে ফেলা হতো জন্মের পর। আর এখন পুঁতে ফেলা হয় জন্মের আগেই (বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন জানতে পারে আগত শিশু নারী)
অধিকার আর মর্যাদা কি কাগজে কলমে আর শ্লোগানে সম্ভব? হৃদয় যদি মেনে না নেয়, ছিড়ে যায় কাগজ, ভেঙে যায় কলম, থেমে যায় শ্লোগান।
জাহেলী যুগে নারী ছিল অবহেলিত নির্যাতিত, নারীর প্রতি পুরুষের হীন মানসিকতার কারণে।
ইসলাম সে মানসিকতারই সংশোধন করেছে।

নারী ছিল পুরুষের কাছে অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মত। ইসলাম নারীকে বানাল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী।

নারী নিজেই ছিল পুরুষের সম্পদ, যা ভোগ দখল করা যেত, ইসলাম নারীকে দিল সম্পদের অধিকার। কারো অধিকার নেই তার সম্পদে। কিন্তু তার আছে অধিকার পিতার সম্পদে, স্বামীর সম্পদে, সন্তানের সম্পদে। তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হয় পিতার, নয় স্বামীর, না হয় সন্তানের। কেউ নেই তো রাষ্ট্রের। নারী অভিভাবকহীন নয়; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

কিন্তু একটি পুরুষ এই অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখে কেবল বালেগ হওয়া পর্যন্ত। পশ্চিমে অবশ্য নারীর বেলায়ও তাই। ফলে তাকে পড়তে হয় বিপদে। আর এটাই হয়তো 'সমঅধিকার' দাবিদারদের ইনসাফ।মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নারীর ছিল না। ইসলাম বলল, না; তার মতামত ছাড়া হবে না।

স্বামী গ্রহণে নারীর মতই চূড়ান্ত। যদি সে ন্যায়ের উপর থাকে।

জাহেলী যুগের নির্যাতিতা, অবহেলিতা নারী নবীর দরবারে এসে বলার অধিকার পেল, আল্লাহর রাসূল। আমার স্বামী আমার প্রাপ্য হক দেয়নি। বলতে পারল নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা; 'না, অমুক আমার পছন্দ নয়।'

তবে নারীর ভরণ পোষণে যেমন তার অভিভাবক দায়িত্বশীল, যেন ভরণ পোষণের পিছে ছুটতে গিয়ে সে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় (যেমনটি ঘটে পশ্চিমা নারীর বেলায়, জীবিকার অর্জনে সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়) তেমনি নারী যাতে বৈবাহিক জীবনেও ক্ষতির সম্মুখীন না হয় এ ব্যাপারেও নারীর অভিভাবক দায়িত্বশীল। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে অনিরাপদ ছেড়ে দেয়নি ইসলাম। তবে নারীকে দিয়েছে মত প্রকাশের অধিকার। অভিভাবক যদি তার প্রতি অবিচার করে, সে বলতে পারবে।

অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নারীকে স্বাধীনতার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ স্বাধীনতা বা অধীনতামুক্ত হওয়ার অর্থ কী? পিতা ও স্বামীর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বার্থান্বেষী, কপট শত পুরুষের অধীন হওয়া। অধীনতামুক্ত বলে কোনো বিষয় নেই। (একমাত্র আল্লাহই অধীনতামুক্ত) নারীকে আহবান জানানো হচ্ছে স্বনির্ভর হতে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কিন্তু পায়ের তলের ঐ মাটিই যদি নারীকে গ্রাস করতে উন্মুখ হয় তখন?

ইসলাম দিল নারীর নিরাপত্তা। নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকানোও নিষেধ। পুরুষকে বলে দিল, হে পুরুষ। তোমার দৃষ্টি অবনত রাখ, আর লজ্জাস্থানের হেফাজত কর।

আরো বললো, কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়। কারণ, তা নারীর বিপদের কারণ হতে পারে। নারীর প্রতি সকল প্রকারের অন্যায়কে ঘোষণা করল মহাপাপ, কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে।
আর নারীকেও বাতলে দিল নিরাপদ থাকার পথ।

আজকের 'পুরুষতান্ত্রিক' সমাজ নারী মুক্তির মেকি শ্লোগান দিয়ে কী পেতে চায়? আর নারীকেই বা কী দিতে চায়? নইলে নারীকে কেন হতে হয়; নতুন মডেলের গাড়ির 'মডেল', পণ্যের এ্যাডে 'নারীপণ্য'? অর্থের বিনিময়ে কেন কেনা যায় নারীর রূপ-যৌবনের চিত্র? নারীকে রক্ষা না করে কেন তাকে ধোকা দেয়া হয় এই বলে, 'তুমি যৌনকর্মী (তুমি কর্ম করে খাচ্ছ)? নারী কেন ওয়েটার? কেন সে রূপ-যৌবন নিলামকারী বিমানবালা, সেলসম্যান? কেন ইডেন, জাহাঙ্গীরনগর ও অন্যান্য নারী কেলেঙ্কারী নারীবাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের বিষয় হয় না....? আরো কত শত দৃষ্টান্ত, যা কারো অজানা নয়। তারপরও...?
ওরা যদি নারীর মর্যাদা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই চাইত, তাহলে নারীর মর্যাদা আর নিরাপত্তা রক্ষা হয় এমন পথই বেছে নিত। যেটা করেছে ইসলাম। ইসলাম কি নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অস্বীকার করে? তাহলে দেন মোহর, মিরাস এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তা ঠিক রেখে অর্থ উপার্জনের অধিকার কেন দিয়েছে? (তার উপর তো কারো ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেই)
নারী শুধু ভাবে, নারীর জন্য এত শর্ত কেন ইসলামে? তারই নিরাপত্তার জন্য, মর্যাদা রক্ষার জন্য।

ইসলাম কি শিক্ষার অধিকার দেয়নি নারীকে? দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার নামে নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ছেড়ে দেয়নি।তাই আজ ভাবতে হবে, কে নারীর প্রকৃত কল্যাণকামী?
সব শ্লোগান যখন থেমে যায়, নারীর যখন চোখ খোলে (সবকিছু হারানোর পর) তখন সবকিছুর দায় ও বোঝা কাকে বহন করতে হয়? এমনকি পশ্চিমেও? আর আইন? সেওতো অবলা হয়ে গেছে।

ইসলাম দিয়েছে নারীর নিরাপত্তা আর মর্যাদা। শুধু তাই নয়, যে পুরুষের কাছে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, তার চরিত্রের ভালো মন্দের বিচারক বানানো হল নারীকে। ঘোষণা হল, তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষ সবচেয়ে ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।

নারী নাম উচ্চারণ ছিল অপমানের, সেখানে আল কুরআনের সূরার নাম হল 'নারী' (সূরা নিসা)।,

ঘোষণা হল, নারীকে স্বযত্নে লালন পালন করা পিতামাতাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে।
যে 'রব' নারীকে অবহেলা আর জুলুমের আঁস্তাকুর থেকে তুলে এনে এত অধিকার, ইনসাফ আর মর্যাদা দিলেন তিনি কি তাঁর অমঙ্গল চান? তাহলে তার নির্দেশনার সাথে বিদ্রোহ কেন? নারীর কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর নির্দেশনায় নাকি চতুর স্বার্থান্বেষী ভোগবাদীদের মেকি শ্লোগানে?!
নারী ছিল মা হাওয়া। আদমের অর্ধাঙ্গিনী, জীবনসঙ্গিনী। তারপর? তারপর অলক্ষুণে, ভোগের পণ্য, অমর্যাদার কারণ। তারপর আবার কন্যা, জায়া, জননী। নারীর পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত। মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে সমাসীন। মত প্রকাশে স্বাধীন, নিজের সম্পদের একচ্ছত্র আধিকারী। তারপর? তারপর আবার অপ্রত্যাশিত নারীর জন্ম, অধিকারের মেকি শ্লোগানে বঞ্চিত, থোকাগ্রস্ত। আবার ভোগের পণ্য। নিলামের পণ্য। সে যুগেও কেনা বেচা হতে, এখনো...। সেদিন জুলুম ছিল, চতুরতা ছিল না। কিন্তু আজ...? সেদিনও পৃথিবীতে তার আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত, আজও...। সে যুগের কবি নারীর রূপ যৌবন, যৌবনের আবেদন নিয়ে আলোচনা করত কবিতায়, আর আজ তার রূপ-যৌবন ফেরি করা হয় টিভি পর্দায়। আর কত বলবো, ইতিহাসের পাতা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে এ অন্যায়ের বিবরণে; গ্রীক সভ্যতায়, ভারতীয় সভ্যতায়, চীন-সভ্যতায়, বৌদ্ধ ধর্মে, ইহুদী ধর্মে, খ্রীষ্টধর্মে, হিন্দু ধর্মে অমর্যাদা, অবহেলা আর জুলুমের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল নারী ও নারীত্ব। ইসলাম তাকে সেখান থেকে রক্ষা করে সমাসীন করেছে মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।
আদর্শহীন পুরুষ ইসলামে স্বীকৃত হক যথাযথ দেয় নি। তার দায় তো ফেলা যায় না ইসলামের উপর। যে ইসলাম ইনসাফ ফিরিয়ে দিল, তাকেই অভিযুক্ত করা হল না-ইনসাফির অপবাদে?। আজ নারীর নিজেকেই নির্ণয় করতে হবে, কে তার কল্যাণকামী আর কে শঠ ও প্রবঞ্চক।

আলকুরআনে বলা হয়েছে-

ضرَبَ اللهُ مَثلا للذين كفروا إمرأة لوح وامرأة لوم كاننا تَحْتَ عَبْدَيْرَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْرَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُنَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

অর্থ: আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও দূতের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। তারা উভয়েই আমার দু'জন সৎকর্মশীল বান্দার বিবাহাধীন ছিল; কিন্তু তারা (স্ত্রীদ্বয়) বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে আল্লাহর পাকড়াওয়ের সামনে তারা (নূহ ও লুত) তাদের কোনো কাজে আসেনি। আর তাদেরকে বলা হল, (জাহান্নামে) প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।-সূরা তাহরীম: ১০

যত নিকটাত্মীয়ই হোক আখিরাতে কাফের মুমিনের দ্বারা কোনো উপকার পাবে না। যেমন আমরা এই আয়াতে দেখি, স্বামী নবী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর কোনো উপকারে আসছেন না, কারণ স্ত্রী কুফরী করেছে। এই আয়াতের পরপরই আল্লাহ তায়ালা ফিরআউনের স্ত্রীর মাধ্যমে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন; খোদাদ্রোহী স্বামীর স্ত্রীও ঈমান আনার দ্বারা নাজাত পেয়েছেন ও চির স্মরণীয় ও আদর্শ হয়ে আছেন।

হযরত নূহ আ.-এর স্ত্রী তার মহাত্মা স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করত এবং তাকে পাগল বলত। তাঁর গোপন বিষয় কাফিরদের কাছে ফাঁস করে দিত। আর হযরত লুত আ.-এর স্ত্রীও ছিল স্বামীর অবাধ্য। সেও তাঁর শত্রুদের সাহায্য করত। (রুহুল মাআনী) আর ফিরআউনের স্ত্রী ছিলেন হযরত আসিয়া রা.। তিনি মূসা আ. এর উপর ঈমান এনেছিলেন। ফিরআউন এ সংবাদ জানতে পেরে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, চার হাত-পায়ে পেরেক পুঁতে তাঁকে প্রখর রোদে ফেলে রাখা হয়, তবুও তিনি ঈমান ত্যাগ করেননি। (তাওযীহুল কুরআন)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করবে। এ কারণে নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হযরত নূহ আ. ও হযরত লুত আ. এর স্ত্রী নাজাত পায়নি; বরং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতার কারণে তাদেরকে আযাবের শিকার হতে হয়েছে। সুতরাং নাজাতের মানদন্ড হল ঈমান ও আমলে ছালেহ। অতএব নিজ আত্মীয় যত বড় ওলী বা বুযুর্গ হোক না কেন নিজে নেক আমল না করে সে পার করে নিবেন ভেবে

বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শরীফে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে এসেছে। সূরা শু'আরা এর ২১৪ নং আয়াত-

وانذر عشيرتك الأقربين

(অর্থ) "আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন" যখন নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং (নিকটাত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত ও আখেরাতের ভয় দেখালেন, একপর্যায়ে) বললেন, হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমা। হে সাফিয়্যা বিনতে আবদিল মুত্তালিব। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা। আমার সম্পদ থেকে যা চাও দিতে পারব, কিন্তু আল্লাহর পাকড়াওয়ের সামনে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না।-সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৩৫০

হাঁ, ঈমান ও আমলে ছালেহ যদি থাকে তাহলে আল্লাহ পরবর্তী বংশধরকে পূর্ববর্তীদের (সন্তান-সন্ততিকে পিতা-মাতার) সাথে মিলিয়ে দিবেন যদিও তাদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য থাকে। সূরা তুরের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, (অর্থ) এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাহলে তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকে মিলিয়ে দিব এবং তাদের কর্মফল সামান্যও কমাব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

আলোচ্য আয়াত থেকে আরো বোঝা যায়, একের কর্ম ও কীর্তি যেমন অপরকে মুক্তি দিতে পারে না তেমনি একজনের মন্দ কর্মের ফলও অন্যকে ভোগ করতে হবে না। স্ত্রীর ঈমান না আনা ও মন্দ কর্মের জন্য না নূহ ও লুত আ. কে পাকড়াও করা হবে, না সন্তানের কারণে নূহ আ. জিজ্ঞাসিত হবেন। তবে প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করবে।

আর প্রত্যেকের দায়িত্বে নিজের অধীনস্থদের তালীম-তরবিয়তের বিষয়টিও শামিল আছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে আরো বোঝা যায়, আমলের ছাওয়াবের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যিনিই ঈমান এনে নেক আমল করবেন তিনিই আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি পাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, (অর্থ) পুরুষ হোক নারী হোক মুমিন অবস্থায় যেই নেক আমল করবে তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের আমলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।-সূরা নাহল: ৯৭

বিবি আসিয়া ঈমান এনেছেন এবং নেক আমল করেছেন সুতরাং তিনি নারী হয়েও শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসিত। পক্ষান্তরে স্বামী ফিরআউন ঈমান আনেনি ফলে সে পুরুষ হয়েও নিকৃষ্ট ও ধিকৃত।
আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন-

إني جاعل في الأرض خليفة

পৃথিবীতে আমি খলীফাহ বানাতে চাই। (সূরা বাকারা (২): ৩০)

তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা শুধু একজন পুরুষ (বা হযরত আদম আ.) কে সৃষ্টি করার ঘোষণা ছিলো না, বরং নর ও নারী সম্মিলিতরূপে যে 'মানব' সেই মানব সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। অর্থাৎ সেটা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ের সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। কারণ পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ও খেলাফত শুধু পুরুষ দ্বারা সম্ভব ছিলো না। আদমের খেলাফতে হযরত হাওয়ার ভূমিকা ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য। জান্নাতে আমাদের বাবা হযরত আদম (আ.) কে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন নিজের মধ্যে তিনি একটি শূন্যতা, একটি অভাব এবং অশান্তি অনুভব করছিলেন। তিনি যখন ঘুমুলেন তখন তাঁর বামপার্শ্বের অস্থির ঊর্ধ্ব-অংশ থেকে প্রথম নারী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। কেন? আদম যেন তাঁর সঙ্গ দ্বারা সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করেন। বস্তুত পৃথিবীর প্রথম নারী ছিলেন প্রথম পুরুষের জন্য স্রষ্টার পক্ষ হতে জান্নাতের চেয়েও মূল্যবান উপহার। কারণ জান্নাত তার অফুরন্ত নায-নেয়ামত সত্ত্বেও আদমের অন্তরের শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা, অভাব ও অশান্তি দূর করতে পারেনি। একা একা জান্নাত ভোগ করে আদমের অন্তরে শান্তি আসেনি। হযরত হাওয়াকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়ার পরই আদমের কাছে জান্নাত জান্নাত মনে হয়েছিলো। জান্নাতের বাগানে দু'জনের এই

যে শান্তির সম্পর্ক, এটা শুধু ঐ দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উভয়ের সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها

তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি 'নফস' থেকে এবং বানিয়েছেন তার থেকে তার জোড়া যেন সে তার কাছে স্বস্তি লাভ করে। (সূরা আরাফ: ১৮৯)

সুতরাং বোঝা গেলো, পৃথিবীর প্রতিটি স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। এজন্যই আল্লাহর নামকে মাধ্যম করে এবং মোহর আদায় করে একটি জান্নাতি উপহাররূপেই নারীকে গ্রহণ করতে হয়। আর এজন্যই বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و إنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله

আর তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানতরূপে, আর তোমরা তাদের 'লজ্জাস্থান'কে হালাল করেছো আল্লাহর কালিমাকে মাধ্যম করে।' (সহীহ বুখারী ১/৩৯৭)

তো উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো-

(ক) ফিরেশতাদের সভায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খেলাফতের যে ঘোষণা, প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো নর ও নারীর সম্মিলিত যে 'মানবরূপ' সেই মানবসৃষ্টির ঘোষণা। (তাতে হযরত আদম আ.-এর ভূমিকা অবশ্যই প্রধান, তবে হযরত হওয়া আ.-এর ভূমিকাও ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য।)

(খ) নারী হচ্ছে নরের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করা।

(গ) পুরুষের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করা এবং নারীর জীবনে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা। কারণ কোন নারী যদি তার পরিবারে লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হয়; তার জীবনে যদি অশান্তি থাকে তাহলে সে পুরুষের জন্য সুখ-শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম কিছুতেই হতে পারবে না।

হযরত আদম আ. যত দিন জান্নাতে ছিলেন, তারপর যতদিন দুনিয়াতে জীবনযাপন করেছেন মা হাওয়াকে তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনীরূপে প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে দান করেছেন এবং সর্বদিক থেকে তাঁর সুখ-শান্তি নিশ্চিত করেছেন। ফলে তিনি নিজেও মা হাওয়ার সঙ্গে থেকে সুখ-শান্তি লাভ করেছেন।

হযরত আদম (আ.)-এর ইনতিকালের পর মানবজাতি যত দিন তাদের পিতার তরীকার উপর ছিলো এবং নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করেছিলো তত দিন তারা সুখে শান্তিতেই জীবন যাপন করেছে। নারীর কাছে সে সুকুন ও স্বস্তি পেয়েছে।

কিন্তু একটা সময় এলো যখন মানুষ আল্লাহর বিধান ও শরীআত ভুলে গেলো এবং শয়তানের প্ররোচনায় হিদায়াত ও সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট হলো তখন অন্যান্য অনাচারের সঙ্গে নারীজাতির উপরও নেমে এলো বিভিন্ন অনাচার-অবিচার। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় নারীজাতিকে কী কী দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে এখানে আমরা সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী

গ্রীক ও রোমান সমাজে নারীকে মনে করা হতো সকল অনিষ্টের মূল এবং সবচে' নিকৃষ্ট প্রাণী। পরিবারে মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা কোন নারীর মর্যাদাই দাসীর চেয়ে বেশী ছিলো না। নারী ছিলো বাজারে বেচা-কেনার পণ্য। পরিবার-প্রধান যে কোন নারীকে বাজারে বিক্রি করতে পারতো।কারণ আইনগতভাবেই নারী ছিলো পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তি।

কোন পর্যায়েই নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিলো না। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারতো না এবং হস্তান্তরও করতে পারতো না।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অধিকার ছিলো না। পরিবারের প্রধান পুরুষ যে স্বামী নির্বাচন করতো তাকেই গ্রহণ করতে নারী বাধ্য ছিলো।

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া থাকে, এটাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান। সে হিসাবে গ্রীক ও রোমান উভয় সভ্যতারই শেষ দিকে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। নারীসমাজ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত উশৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং সমাজের সর্বত্র নগ্নতা ও যৌননৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়লো, যার অনিবার্য ফলরূপে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

তুরস্কের সুপ্রসিদ্ধ নারী বুদ্ধিজীবী খালিদা এদিব খানম গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় নারীর লাঞ্ছনা সম্পর্কে 'তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা করেছেন। ইহুদিজাতি ও খৃস্টধর্মে নারীকে অভিশপ্ত মনে করা হয়, কারণ তাদের ধারণায় আদমকে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান হাওয়াকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলো। উভয়জাতির বিশ্বাস ছিলো যে, স্ত্রীলোক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ তার মধ্যে মানবাত্মা নেই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ৫৮৬ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে এক ধর্মসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, স্ত্রীলোককে মানুষ বলা তো যায়, তবে তাকে শুধু পুরুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

খৃস্টধর্মের প্রভাবে নারীর প্রতি পাশ্চাত্যজগতের আচরণ ছিলো চরম অবমাননামূলক, যা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এমনকি ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্বামীর অধিকার ছিলো স্ত্রীকে বিক্রি করার। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের পরও নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার কথা সেখানকার চিন্তানায়কদের মাথায় আসেনি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী নাগরিক আইনে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীর অধিকার ছিলো না কোন বিষয়ে কোন পক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার।

হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা ছিলো সবচে' করুণ। এ প্রসঙ্গে শুধু সতীদাহ-এর কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট, যা এই মাত্র সেদিন সংস্কারবাদী নেতা রাজা রামমোহন রায় ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে বাতিল করিয়েছেন।

আরব জাহিলিয়াতের সমাজেও আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মর্মন্তুদ ইতিহাস। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কন্যাসন্তানের জন্মকে তখন মনে করা হতো চরম কলঙ্কের বিষয়। জাহেলি সমাজের এই চিত্রটি দেখুন আলকোরআনে-

وإذا بشر إحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيسكه على مون أم بدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

(আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেয়া হতো তখন দুশ্চিন্তায় তার মুখ কালো হয়ে যেতো, আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। ঐ জঘন্য খবরের কারণে মানুষের কাছ থেকে সে মুখ লুকিয়ে ফিরতো। (আর দিশেহারা হয়ে ভাবতো যে কী করবে সে?) লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। কত মন্দ ছিলো তাদের এ মনোভাব। (সূরা নাহল: ৫৮)

সেখানে নারীর জন্মগ্রহণই ছিলো অপরাধ, আর বেঁচে থাকা ছিলো আরো বড় অপরাধ। তাই অধিকাংশ সময় জন্মদাতা পিতা কন্যাসন্তানকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতো এবং নিজের হাতে জ্যান্ত দাফন করে ফেলতো। অসহায় মায়ের বাধা দেয়ার কোন অধিকার ছিলো না। তাই কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার আশঙ্কায় মা ভুলে যেতো তার প্রসববেদনা। অস্থির পেরেশান হয়ে শুধু ভাবতো পিতার নিষ্ঠুরতা থেকে কীভাবে সে বাঁচাবে তার সন্তানকে? কোথায় কীভাবে লুকাবে সে তার কলিজার টুকরোকে? কোরআনে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ ভাষায় এই নিষ্ঠুর প্রথার নিন্দা করে বলা হয়েছে-

وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت 0

আর যখন জ্যান্ত দাফনকৃত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো (তখন কী জবাব দেবে তোমরা?) (সূরা আত-তাকভীর: ৮৫৯)

তো এই ছিলো ইসলামের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা ও মর্যাদাগত অবস্থান। এককথায় যদি বলি তাহলে বলতে হয়, মানুষ হিসাবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিলো না। চরম লাঞ্ছনা ও যিল্লতি ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই ছিলো না।

প্রথম কথা এই যে, মৌলিক মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

বিকৃত ইহুদিধর্ম ও খৃস্টধর্ম যেখানে আদমের বিচ্যুতির জন্য হাওয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে ইসলাম সেখানে আদম ও হাওয়া দুজনকে ভুল ও ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ক্ষেত্রে অভিন্ন সাব্যস্ত করেছে। ইরাশাদ হয়েছে-

فأزلهما الشيطن عنها

শয়তান উভয়কে তা থেকে বিচ্যুত করেছে। (সূরা বাকারা: ৩৬)

ভুল শোধরানো সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا

তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। (সূরা আরাফ: ২৩)

তবে যেহেতু পরিচালক হিসাবে আদমের দায়িত্ব ছিলো বেশী সেহেতু এককভাবে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে-

فنسى ولم تجد له عزما

সে ভুলে গিয়েছিল। আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (সূরা ত্বহা ১১৫)

নারী ও পুরুষের মৌলিকভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে-

من لباس لكم و أنتم لباس لهن

এবং নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। তবে তাদের উপর পুরুষদের এক পর্যায়ের প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা: ২২৮)

এই এক পর্যায়ের প্রাধান্য হল, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধানের মর্যাদা, যা সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর এটি স্বামী-স্ত্রীর জীবন চলার পথে একটি অপরিহার্য বিষয়।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

إنما النساء شقائق الرجال

অর্থাৎ নারীরা হলো পুরুষের সমতুল্য। (সুনানে আবু দাউদ ১/৩১)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

من كانت له أنثى فلم بندها و لم يهنها و لم يؤثر ولده الذكور عليها أدخلها الله الجنة

যে ব্যক্তি কন্যসন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন। (সুনানে আবু দাউদ,হাদীস: ৫১০৩)

দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

و من عمل صلحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب আর যে কোন পুরুষ বা নারী নেক আমল করবে, আর সে মুমিন হবে, তাহলে তারা জান্নাতে দাখেল হবে এবং সেখানে তাদেরকে বেলা হিসাব রিযিক দান করা হবে। (সূরা মুমিন: ৪০) আরো ইরশাদ হয়েছে-

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض

অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন (আর বললেন) যে, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না, সে পুরুষ হোক, বা নারী। তোমরা তো পরস্পরের অংশবিশেষ। (সূরা আলইমরান: ১৯৫)

নারীর সঙ্গে পুরুষের যতগুলো সম্পর্ক হতে পারে প্রতিটি সম্পর্ককে ইসলাম অনন্য মর্যাদা ও মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে নারীকে শুধু সমমর্যাদা নয়, বরং অগ্রমর্যাদা দান করেছে।

প্রথম সম্পর্ক হলো মা হিসাবে। তো ইসলাম ও তার নবীর কাছে মায়ের যে মর্যাদা তা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সভ্যতা এমনকি আধুনিক সভ্যতাও কল্পনা করতে পারেনি। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের আদেশ করেছি। (কারণ) তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে।' (সূরা আহকাফ: ১৫) এখানে পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গে সদাচার কেন করতে হবে তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে পিতার কোন অবদানের কথা বলা হয়নি, শুধু মায়ের ত্যাগ ও কষ্টের কথা বলা হয়েছে। অথচ পিতারও বিরাট অবদান রয়েছে সন্তানের জীবনে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মাতার ত্যাগ ও কষ্টের তুলনায় পিতার ত্যাগ ও কষ্ট খুবই সামান্য।

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৯৭১)

আফসোস, যে ধর্মের নবী তাঁর উম্মতকে মাতৃজাতি সম্পর্কে এমন উপদেশ দান করেছেন সে ধর্মকে আজ নারী অধিকারের বিরোধীরূপে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। পক্ষান্তরে যেসকল ধর্ম ও সভ্যতার হাতে এবং যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নারীজাতি বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছে তারা পেয়ে যাচ্ছে বেকসুর খালাস, বরং উলটো সেজে বসেছে নারীদরদী।

ফিরে আসি হাদীছের আলোচনায়। শুধু এই হাদীছই নয়, বরং অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ছাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি জিহাদে গমন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছেন? ছাহাবী বললেন, আছেন। তখন তিনি বললেন, যাও তার কাছে বসে থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়েরই কাছে। (মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৯; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১৩/৮০)

অন্য বর্ণনায় আছে, 'জান্নাত হলো মায়েদের কদমের নীচে।' (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস:৭৩৩০)

দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো স্ত্রী হিসাবে। তো এ সম্পর্কে দেখুন, কোরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-

و عاشر و من بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

আর তোমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসবাস করো সদাচারের সাথে। আর যদি (কোন কারণে) তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে হতে পারে যে, তোমরা এমন কোন কিছুকে অপছন্দ করলে, আর আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ রেখে দিলেন। (সূরা নিসা: ১৯)

এ বিষয়টি হাদীছ শরীফে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন, 'কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে যেন সম্পূর্ণ অপছন্দ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৪৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৯৭৯)

এখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের এমন একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যার উপর আমল করলে এখনই আমাদের সংসার 'জান্নাত-নযীর' হয়ে যেতে পারে।

দু'জন নারী-পুরুষ যখন একত্রে ঘর-সংসার করবে তখন একজনের সবকিছু অপরজনের ভালো লাগবে এটা হতেই পারে না। কিছু আচরণ ভালো লাগবে, কিছু মন্দ লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পুরুষের করণীয় হলো, স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর শোকর আদায় করা যে, আলহামদু লিল্লাহ আমার স্ত্রীর মধ্যে এই এই ভালো গুণ।আল্লাহর শোকর আদায় করবে, আবার আন্তরিকভাবে স্ত্রীর প্রশংসা করবে। তখন হাত আল্লাহ তার মন্দ স্বভাবগুলো দূর করে দেবেন।

সুতরাং পুরুষের কর্তব্য হলো স্ত্রীর ত্রুটিগুলোর প্রতি ক্ষমাসুন্দর হওয়া, আর ভালো গুণগুলোর কদর করা। কারণ পূর্ণতা তো কোন মানুষেরই নেই। না নারীর, না পুরুষের।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و عاشر و من بالمعروف، فإن كرهتمو من فعسى أن تكرهوا شيأً و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই যে তার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের জন্য সর্বোত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৪২; জামে তিরমিযী, হাদীস: ১১৬২)

উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কেমন ছিলো তার বিশদ বিবরণ সীরাতের কিতাবে রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য তা পড়া এবং নিজেদের জীবনে তা আমলে আনা, যাতে প্রতিটি সংসার হতে পারে শান্তির জান্নাত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কোন নারীকে প্রহার করেননি, বরং যখনই ঘরে প্রবেশ করতেন (তাঁর মনের অবস্থা যেমনই হোক) পবিত্র মুখমন্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত থাকতো। তিনি নিজের কাজ

নিজে করা পছন্দ করতেন, এমনকি ছেঁড়া জুতা নিজের হাতে সেলাই করতেন। (শামাইলে তিরমিযী; আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ)

বর্ণিত আছে, তিনি যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, ঘরের দরজা খুব আস্তে খুলতেন যাতে ঘরের লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুছল্লায় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন তখন ঘুমের অবস্থায় মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পা মুছল্লার উপর চলে আসতো। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় কোমলভাবে মা আয়েশা (রা.)-এর পা সরিয়ে তবে সিজদায় যেতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৫১২)

এজন্য কখনো বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। সুবহানাল্লাহ।

একটি হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

استوصوا بالنساء خيرا

আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ করো। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৬৩)

কন্যা ও ভগ্নি হিসাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ শুনুন, যার খোলাছা হলো, কারো ঘরে যদি তিনজন বা দুজন কন্যা বা ভগ্নি থাকে, আর সে তাদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দান করে, তারপর তাদেরকে উত্তম পাত্রে বিবাহ দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) কোন কোন বর্ণনায় আছে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। কোন বর্ণনায় আছে, তাহলে সে আর আমি জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি থাকবো। তারপর তিনি দুই আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে ইশারা করলেন। এক হাদীছে আছে-

لا تكرهوا البنات فإنهن المؤسسات الغاليات

তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গতা পোষণকারী মূল্যবান সম্পদ।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ১৭৩০৬)

যে কোন পরিবারে আপনি পিতা-মাতার প্রতি কন্যাসন্তানের অনুভব-অনুভূতি এবং সেই তুলনায় পুত্রসন্তানের অনুভব-অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, অবশ্যই আপনার বুঝে আসবে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন কনাসন্তানদের সম্পর্কে একথা বলেছেন।

নারীদের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি

নারীসমাজের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি কেমন ছিলো এবং তাদের কষ্ট ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কত সজাগ ছিলেন এবং তাদের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাঁর কিরূপ আস্থা ছিলো তা নীচের বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যাবে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلوة

তোমাদের দুনিয়াতে সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ১২২৩৩)

এই হাদীছটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কারণ সুগন্ধি ও নারীর একত্র উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বভাব ও ফিতরত এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী সুগন্ধির মতই সিণন্ধ ও পবিত্র। সুগন্ধি যেমন হৃদয়ে মস্তিষ্কে কোমল ও সিগন্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করে, নারীর সংস্পর্শও তেমনি কোমলতা, সিণগ্ধতা ও পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত এখানে পছন্দ করার কথা বলা হয়নি, বরং পছন্দ করানোর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ নবীর অন্তরে নারীর এই প্রিয়তা ও পছন্দনীয়তা নিছক মানবিক কোন আকর্ষণ

নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ ঐশী বিষয়। আল্লাহ তা'আলার গায়বি ইশারা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এটি যত না জৈবিক তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। বলাবাহুল্য, এতে স্ত্রীজাতির আধ্যাত্মিক মর্যাদাও প্রকাশ পায়। অথচ ইসলামের পূর্বে নারীকে অপবিত্র সত্তা বলে সাব্যস্ত করেছে।

স্ত্রীজাতির সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কতটা সজাগ ছিলেন তা নীচের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ঘটনার খোলাছা এই যে, একবার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে কোন শিশুর কান্নার আওয়ায পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে সালাম ফেরালেন, আর বললেন, আমি নামায সংক্ষিপ্ত করেছি, যাতে ঐ মা তার সন্তানের কারণে পেরেশান না হয়। (সহীহ বুখারী, সালাত অধ্যায়)

একসফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, আনজাশা নামে এক ছাহাবী উট দ্রুত হাঁকিয়ে নিচ্ছেন। ঐ উটের আরোহী ছিলো নারী। তখন তিনি ছাহাবীকে ধীরগতিতে ও কোমলভাবে উটচালনা করার আদেশ দিয়ে বললেন-

رويدك يا أنجشة، رفقا بالقوارير

ধীরে হে আনজাশা। কাচের পাত্রগুলোর প্রতি কোমল হও। (বুখারী ও মুসলিম)

নারীকে কাচের পাত্রের সঙ্গে উপমা প্রদান করা কত যে প্রজ্ঞাপূর্ণ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই একটি উপমা দ্বারাই উম্মতকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি কত কোমল এবং তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষকে কত সতর্ক, সাবধানী ও কোমল হতে হবে।

(এটা অবশ্য আলাদা বিষয় যে, মুসলিম নারীদের প্রতি মুসলিম পুরুষদের বর্তমান আচরণ কিরূপ? বর্তমানে কতজন মুসলমান এমন আছেন, যারা নবীর এই মহামূল্যবান উপদেশের প্রতি যত্নবান? ঘরে ও সফরে নারিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তারা কী পরিমাণ

খেয়াল রাখে? কী পরিমাণ কোমল আচরণ করে? আর কাল কেয়ামতের দিন তাদের নবীর কাছে তারা কী জবাব দেবে?)
ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা যেখানে নারীর শিক্ষার কোন অধিকারই স্বীকার করেনি। এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও এই সেদিন পর্যন্ত যেখানে নারীশিক্ষাকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো সেখানে ইসলাম সেই প্রথম দিন থেকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান অধিকার ঘোষণা করেছে।

কারণ এটা তো বলাই বাহুল্য যে, দ্বীন ও শরীয়াতের উপর আমল করা পুরুষের জন্য যেমন ফরয তেমনি নারীর জন্যও ফরয। আর শরীয়তের ইলম অর্জন না করে শরীয়তের উপর আমল করা সম্ভব নয়।

رب زدنى علما

হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। (সূরা ত্বহা: ১১৪)

এই প্রার্থনা তো পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহর কাছে করে থাকে। আর এটা শুধু জ্ঞান অর্জনের দু'আ নয়, বরং অধিক থেকে অধিক জ্ঞান অর্জনের দু'আ।
طلب العلم فريضة على كل مسلم ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২২৪; তবরানী-আওসাত, হাদীস: ৯) এ হাদীছ ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া তলবে ইলমের যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই।

فعلمها وأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها

তাকে ইলম শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো, আর তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীছে স্বয়ং পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যেন তার তাদের অধীন নারীদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে, আর এর বিনময়রূপে জান্নাতের ঘোষণা এসেছে।

বর্ণিত আছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। পুরুষেরা তো আপনার উপদেশ এককভাবে নিয়ে গেলো। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার একটি দিন নির্ধারণ করে দিন যখন শুধু আমরা আপনার কাছে আসবো। আপনি আমাদের ঐ ইলম থেকে শিক্ষা দান করবেন যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দান করেছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আবেদন গ্রহণ করে বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্র হও। (সহীহ বুখারী, ইলম অধ্যায়)

এ হাদীছ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জনের জন্য নবীর কাছে যেমন নারীদের আলাদা সময় পাওয়ার হক ছিলো তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত ওয়ারিছীনে নবীর কাছেও সেটা পাওয়া তাদের হক।
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহতুল মিমিনীনের লেখা শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেও সীরাতের কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য স্ত্রীছাহাবী লিখতে জানতেন।হযরত আয়েশা (রা.) ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এবং সমকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা বোঝা যায় নিমেণাক্ত বর্ণনা থেকে।

হযরত ওরওয়া বিন যোবায়র তাঁর খালা সম্পর্কে বলেন, ফারায়েযের ইলম, হালাল-হারামের মাসায়েল এবং কোরআনের ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে বড় আলিম আমি দেখিনি। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মসরূক বলেন, আল্লাহর কসম, বড় বড় ছাহাবাকে আমি তাঁর কাছে মীরাছের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি।

হযরত ওরওয়া আরো বলেন,
সাহিত্য, কবিতা, চিকিৎসা এবং আরবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি।
হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার মর্যাদা ছিলো অনেক পুরুষ সাহাবীরও উপরে।
জ্ঞানচর্চা ও তলবে ইলমের ক্ষেত্রে আরো বহু স্ত্রীছাহাবীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়।

যেসকল স্ত্রীছাহাবী কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত খানসা, সু'দা বিনতে কোরায়য (হযরত উছমান রা.-এর খালা), নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য। বর্ণিত আছে যে,

হযরত খানসা (রা.)-এর কবিতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরো কিছু শোনাও। (ইলইসাবা, ইবনে হাজার ৪/২৪৮৬-২৪৮৭)

নারীসমাজের ইলমচর্চার এ ধারা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিলো।কারীমাহ আলমারওয়াযিয়্যাহ ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছাহ। বহু মুহাদ্দিছ পর্দার আড়াল থেকে তাঁর কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ইবনে আসাকির বলেন, ইমাম বুখারী যেসকল নারী মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তাঁর নারীশায়খ-এর সংখ্যা ছিলো আশির উপরে। ইমাম যাহাবী রহ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে যেখানে বহু পুরুষ বর্ণনাকারী মিথ্যাচারী বলে অভিযুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন দোষ-দুর্বলতার কারণে পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছেন সেখানে কোন নারীবর্ণনাকারী অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত সব্যস্ত হননি।

হানাফী ফিকহ-এর সুপসিদ্ধ কিতাব 'বাদায়েউস সানায়ে'-এর রচয়িতা আল্লামা কাসানী রহ, এর স্ত্রী হলেন ফাতেমা। তিনি এত উচ্চস্তরের ফকীহা ছিলেন যে, তিনি, তাঁর পিতা আল্লামা সমরকন্দী ও স্বামী আল্লামা কাসানী, এই তিনজনের সম্মিলিত স্বাক্ষরে ফতোয়া জারি করা হতো।

এমনকি হিন্দুস্তানের ইতিহাসেও এর নমুনা রয়েছে। ভুপালের প্রসিদ্ধ আলিম মুফতি মাওলানা আব্দুল কাইউম (রহ.)-এর স্ত্রী ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লহ দেহলবী (রহ.)-এর খান্দানের নারী। তিনি এত বড় আলিমা ছিলেন যে, কোন কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে মুফতী আব্দুল কাইউম (রহ.) বলতেন অপেক্ষা করো, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে বলছি।

সালাফ ও খালাফের এই ধারাকে পুনর্জীবিত করা এখন সময়ের দাবি।

ওলামায়ে কেরামের নিকট নিবেদন, তারা যেন নারীদের শিক্ষা ও তারবিয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং উপযুক্ত ও আদর্শ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং সবচে' বড় কথা, আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার জন্য সবচে' গুরুত্বপূর্ণ, সবচে' কঠিন ও কষ্টকর যে দায়িত্ব তা হলো সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রসব। কে পালন করবে এ মহা-দায়িত্ব? আমাদের আল্লাহ এজন্য পুরুষের পরিবর্তে নারীকে নির্বাচন করেছেন এবং নারীর দেহসত্তা ও মানসসত্তাকে সেভাবেই তৈরী করেছেন।

তারপর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক প্রতিপালন, তার শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। দুনিয়ার মানুষ গর্ব করে বলে, আজকের শিশু আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক। আমরা বলি, আজকের শিশু হলো আগামী দিনের আদর্শ মা, আদর্শ বাবা এবং আলিমে দ্বীন, দাঈ ইলাল্লাহ ও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। তো কে পালন করবে শিশুকে গড়ে তোলার এ মহাদায়িত্ব? এখানেও নারীর ভূমিকাই বড়। এজন্যই ইসলাম নারীকে জীবিকার দৌড়ঝাঁপ থেকে এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেন সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বস্তির সঙ্গে, নিরাপত্তার সঙ্গে এবং মর্যাদার সঙ্গে পালন করে যেতে পারে। পুরুষের কর্তব্য নারীর এই ত্যাগ ও কোরবানিকে কৃতজ্ঞচিত্তে মূল্যায়ন করা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কৃতার্থতার সঙ্গে পালন করে যাওয়া।

কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার সঙ্গে কেন? উত্তরে বলা যায়, মাতৃত্ব দিয়ে নারীকে আল্লাহ গৌরবান্বিত করেছেন, আর পিতৃত্ব দিয়ে পুরুষকে আল্লাহ মুক্তি দান করেছেন। মাতৃত্বের গৌরব অর্জন করার জন্য পৃথিবীর প্রতিটি নারীকে প্রতিবার জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয় এবং দীর্ঘ নয়মাস ব্যথার সাগর পাড়ি দিতে হয়। পক্ষান্তরে পুরুষকে শুধু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও বায়ভার বহন করতে হয়।

আল্লাহ তো নারী ও পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা। তিনি জানেন, মাতৃত্ব কীভাবে অর্জিত হয়, আর পিতৃত্ব লাভ হয় কার কষ্টের সুফলরূপে। আল্লাহ বলেছেন-

ووسينا الانسان بوالديه احسانا حمتله امه كرها ووضعته كرها

(আর মানুষকে আমি উপদেশ দিয়েছি তার মা-বাবার সঙ্গে সদাচার করার। তার মা তাকে বহন করেছে কষ্ট করে এবং প্রসব করেছে কষ্ট করে।)

আল্লাহ তাআলা পিতামাতা উভয়ের প্রতি সদাচারের আদেশ করার পর বিশেষভাবে মার কষ্টের কথা বলেছেন। এভাবে আল্লাহ নারীর মাতৃত্বকে মহিমান্বিত করেছেন এবং সম্ভবত এ বিষয়েও তাম্বীহ করেছেন যে, পুরুষের পিতৃত্বের পিছনেও নারীর গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসববেদনার অবদান।

তো পুরুষ তার এমন জীবনসঙ্গিনীর জন্য একটু ছাদের ছায়া, একটুকরো রুটির অন্ন এবং একখন্ড বস্ত্রের আবরণ যোগাড় করবে না? করতে হবে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই করতে হবে। পুরুষের এটা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, আইনগত দায়িত্ব। ইসলামী খিলাফত কায়েম হলে রাষ্ট্রশক্তি পুরুষের এই দায়িত্বপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে, করতে বাধ্য। এ জন্য নারীকে কেন তার মূল দায়িত্ব ছেড়ে ঘর থেকে বের হতে হবে? কেন তাকে দুনিয়ার ঝামেলায় জড়াতে হবে?

অন্তত মুসলিম বিশ্বে যত সরকার আছে, পাশ্চাত্য ও জাতিসঙ্ঘের হাতে 'নৃত্যপুতুল' না হয়ে তারা সত্যি যদি নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে চায় তাহলে আইন করে এ বিষয়টি নিশ্চিত করুক।

ইসলাম নারীসমাজের উপর দ্বিতীয় যে ইহসান করেছে তা এই যে, তাকে তার নিজস্ব পরিমন্ডলে সম্পদ উপার্জনের এবং সঞ্চয়ের অধিকার দান করেছে। মীরাছ ও মোহররূপে যে সম্পদ সে লাভ করবে, নিজের শ্রম দ্বারা যে সম্পদ সে উপার্জন করবে সেগুলোর উপর তার পূর্ণ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। নারী যতই সম্পদশালী হোক, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নিজের নয়। হাঁ, সচ্ছল নারী যদি স্বামীকে হাদিয়া দেয়, ছাদাকা দেয়, দিতে পারে এবং সে জন্য সে দ্বিগুণ আজর পাবে। যেমন হাদীছ শরীফে এরকম ময়মূন এসেছে-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী ও কয়েকজন ইয়াতিমের জন্য খরচ করতেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে সদাকা করতে উৎসাহিত করলেন। তখন যায়নাব রা. স্বামীকে বললেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার জন্য ও আমার তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীম

শিশুদের জন্য যে খরচ করে থাকি তা ঐ সদাকার মধ্যে গণ্য হবে কি না। তিনি বললেন, আমার লজ্জা করে, তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। হযরত যায়নাব দরবারে নববীর দুয়ারে হাযির হলেন। দেখা গেলো, আরো কতিপয় নারী একই উদ্দেশ্যে সেখানে একত্র হয়েছে। এর পর তারা সকলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে বিষয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উত্থাপন করলেন, আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন যে, তারা দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবে, সাদাকা করার এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৪৬৬)

পাশ্চাত্যে নারীসমাজের দুর্দশা

আধুনিক যুগে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন মূলত শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যে, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরও শুরু হয়েছিলো পাশ্চাত্যসমাজে। নারী-স্বাধীনতা ও ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ, এদু'টোর পিছনে অভিন্ন কারণ কাজ করেছে। প্রথমেই আসে ধর্ম ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের বিষয়টি। ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিমসমাজে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। বরং ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্যায় এগিয়ে এসেছে। কারণ ইসলাম হলো বিজ্ঞানময় ধর্ম। তাই ইসলাম তার অনুসারীকে আলকোরআনের মাধ্যমে শুরু থেকেই আহবান জানিয়েছে যেন আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য সে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করে। ইসলামী জাহানে যখন বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ, পাশ্চাত্য তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। অনেক পরে মুসলিমজাহানের অনুসরণে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তবে উভয় সভ্যতার মধ্যে একটি বুনিয়াদি পার্থক্য ছিলো। ইসলামে জ্ঞানসাধনা ও বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য ছিলো সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ ও স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা, যা অতি বড় ইবাদত; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার মূলে ছিলো প্রকৃতির গোপনশক্তিকে আয়ত্ত করে সম্পদ আহরণ করা।

মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই যে, ইউরোপে গীর্জার ধর্মনেতারা বিজ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে চরম হিংস্রতার সঙ্গে রুখে দাড়িয়েছিলেন। সে ইতিহাস বড় মর্মন্তুদ, যার বিবরণ তুলে ধরার এখানে অবকাশ নেই। গীর্জার অসহায় ধর্মনেতাদের অবশ্য এছাড়া উপায়ও ছিলো না।

কারণ বিজ্ঞান খৃষ্টধর্মের বিশ্বাসের বুনিয়াদ ধরেই নাড়া দিয়েছিলো। ফলে শুরু হয়ে যায় বিজ্ঞান ও খৃষ্টধর্মের সঙ্ঘাত। তাতে স্বাভাবিকভাবেই খৃষ্টধর্মের পরাজয় ঘটে।
যদি বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর পাশ্চাত্যের খৃষ্টজগত ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতো তাহলে মানবসভ্যতার ইতিহাস আজ অন্যরকম হতো, কিন্তু তা হয়নি। বিজ্ঞান পাশ্চাত্যকে নিয়ে গেছে নাস্তিক্যবাদ ও চরম ভোগবাদের দিকে।

একই ভাবে ইসলাম যেখানে আবির্ভাবলগ্নেই চরম লাঞ্ছনা ও দুর্গতির শিকার নারীজাতিকে তার প্রাপ্য মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে পাশ্চাত্যে এই কিছুদিন আগেও নারী তার মৌলিক মানবিক অধিকার থেকেই ছিলো বঞ্চিত, যার সংক্ষিপ্ত চিত্র পিছনে আমরা তুলে ধরেছি। পাশ্চাত্যে ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা সবকিছু ছিলো নারী-নির্যাতনের হাতিয়ার। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই প্রতিটি ক্রিয়ার সমান একটি প্রতিক্রিয়া থাকে। সেই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপে সেখানে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় এবং শুরু হয় অবধারিত সংঘর্ষ। একদিকে ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা যেমন নারী-অধিকার আন্দোলনে সোচ্চার স্বাধীনচেতা নারীদের উপর চরম হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যদিকে নারীসমাজও সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন করে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ইউরোপে নারীসমাজ যে অমানবিক নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার ছিলো তাতে তাদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ছিলো স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। কিন্তু তাদেরকে আলোর সিঁড়ি এবং মুক্তির রাজপথ দেখিয়ে দেয়ার কেউ ছিলো না। একথা বলারও কেউ ছিলো না যে, 'যে অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য ধর্ম, সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহ, তা ইসলাম ও মুসলিম-সভ্যতা শুরু থেকেই তোমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে দিয়ে রেখেছে।'

এসব কথা তাদের বলার কেউ ছিলো না, বরং লালসাগ্রস্ত সুচতুর একদল পুরুষ তাদের সামনে তুলে ধরে সমঅধিকার ও অবাধ স্বাধীনতার অলীক স্বপ্ন। কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো গৃহের নিরাপদ বেষ্টনীর বাইরে এনে নারীকে ভোগের পাত্রী ও লালসার শিকার করা। স্বাভাবিক কারণেই পুরুষের সে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে।

তো পাশ্চাত্যের নারী-আন্দোলনের ফল কী দাঁড়িয়েছে? নারী তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব থেকে কোনভাবেই অব্যাহতি পায়নি এবং পাওয়া সম্ভবও নয়। তদুপরি

নিজের ভরণপোষণের দায় এবং পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্বও চেপেছে তার উপর। জীবন ও জীবিকার কঠিন রণাঙ্গনে নারীকেও নামতে হয়েছে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। 'একঠোঙ্গা' মিষ্টি যত সহজলভ্য, পুরুষের কাছে নারী হয়ে উঠলো তার চেয়েও সহজলভ্য। অথচ শত লাঞ্ছনার পরও নারী ছিলো পুরুষের কাছে দুর্লভ সম্পদ।

স্বাধীনতার নামে কিছু সুযোগ, কিছু সুবিধা পাশ্চাত্য-নারীর সামনে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে, যা আগে সে কোনভাবেই ভোগ করতে পারেনি, কিন্তু বিনিময়ে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে তার নারীত্ব, সতিত্ব, মাতৃত্ব, সম্মান, গৌরব ও মর্যাদা। ঘরে হয়ত তাকে একজন পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জন করতে হতো, এখন বাইরে তাকে হতে হয় বহুপুরুষের লালসার শিকার।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা তকী উছমানী, আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন, বড় সুন্দর লিখেছেন, 'আশ্চর্য তামাশার বিষয় এই যে, নারী যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার রান্না করে, ঘরদোর সাজায় তখন সেটা হয় পশ্চাদপদতা ও মৌলবাদিতা, পক্ষান্তরে এই নারী যখন বিমানবালা হয়ে চারশ পুরুষের জন্য ট্রে সাজিয়ে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লালসা-দৃষ্টির শিকার হয় তখন সেটা হয় সম্মান ও মর্যাদা।' (ইছলাহী মাওয়াইয, পৃ. ১৫৪)

এখানে আমি মুসলিম নারী-সমাজের পক্ষ হতে যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে, প্রত্যেক জাহিলিয়্যাতের মতো পশ্চিমা জাহিলিয়্যাত ও নারীর প্রতি পশ্চিমা প্রতারণামূলক শোষণ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় নিঃসন্দেহে ইসলামেই আছে। তবে তা যদি শুধু বইয়ের পাতায় কিংবা মৌখিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এই শিক্ষার কোনো ফায়েদা চোখে পড়বে না। এর জন্য অপরিহার্য হল, খায়রুল কুরূনের পরিবারগুলোর মতো আমাদের সকল পরিবার নারীর জন্য ঐ ইসলামী শিক্ষার বাস্তব নমুনা হওয়া। আমাদের প্রত্যেক আলিম ও মুবাল্লিগের ঘর যেন অন্যদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন দাওয়াত ও ইলমে দ্বীনের ব্যাপক চর্চা এবং মুবাল্লিগ ও মুআল্লিমদের পরিবারে এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এই দায়িত্ব পালনের এখন আর কোনো বিকল্প নেই।

আমি আমার সমাজের পক্ষ হতে আবারও বলবো, আল্লাহর নামে, ইসলামের নামে আমাদের কোন শেকায়াত নেই। আল্লাহর কাছে, ইসলামের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের পেয়ারা নবী আমাদের অনেক দিয়েছেন, আমাদের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত দিয়েছেন; ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজ। আল্লাহর ওয়াস্তে ঘরে আমাদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু নিশ্চিত করুন। আমাদের ত্যাগ ও আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন, নারীও মানুষ; তারও ইচ্ছা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, চাহিদা ও প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস করুন, আমাদের ঘরগুলোতে যদি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা তাদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ পেতে থাকেন তখন পৃথিবীর সকল নারী এই সত্যকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে এবং পশ্চিমা সভ্যতার আপাত সৌন্দর্য ও নারীবাদীদের কপট শ্লোগান তাদের প্রতারিত করতে পারবে না। তারা ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নিজেই নিজের মান-মর্যাদা ও ইযযত-আব্রুর হেফাযত করবে। পাশ্চাত্যে নারী-স্বাধীনতার বিষফল আমাদের দেশে নারী-স্বাধীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে এবং স্বার্থবাদী পুরুষদের সুচতুর প্রচারণা ও প্ররোচনায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীসমাজের একটা অংশ তাতে যথেষ্ট বিভ্রান্তও হয়েছে, আমার মনে হয়, এর পিছনে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত কোরআন-সুন্নায় মুসলিম নারীর যে আদর্শ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে, সোনালী যুগের মুসলিমসমাজে যার বাস্তব নমুনা বিদ্যমান ছিলো, এখনকার মুসলিম সমাজে তা বিদ্যমান নেই। সুতরাং আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমাদের প্রথম কাজ হবে, অন্তত নিজেদের সমাজে ইসলামের সোনালী অতীতের সেই নমুনা আবার ফিরিয়ে আনা, যা দেখে বৃহত্তর মুসলিম নারীসমাজ প্রতারণাকারীদের প্রতারণা বুঝতে পারবে, ইসলামের দেয়া নারী-অধিকারের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধানো নারী-স্বাধীনতার মোহজালে তারা আটকা পড়ছে; অথচ এর ভিতরের কদর্যতা তাদের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। এখানে আমি সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

একথা সত্য, পাশ্চাত্যের নারী আজ কিছু স্বাধীনতা ভোগ করছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রমাণও দিচ্ছে। তাদের জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যও

এসেছে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাই, পাশ্চাত্যে প্রতিটি নারী হিলারি ক্লিন্টন নয়। (অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাকেও ক্লিন্টনের নাম, যশঃ ও অপযশঃ সবই বয়ে বেড়াতে হয়।)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা তকী উছমানী বড় শিক্ষণীয় কথা লিখেছেন, 'নারীরা এখন এ ধোকায় আছে যে, বাইরে বের হয়ে আমার মর্যাদা বেড়েছে। আসলে এ থোকা দিয়েই তাকে বাইরে বের করে আনা হয়েছিলো। কিন্তু এখন সবকিছু বুঝেও আবার ঘরে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সে দ্বিধা-দ্বন্দের শিকার।
তাকে এই ধোকা দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা বাইরে বের হও এবং পুরুষ যত মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে তোমরাও তা অর্জন কর। তোমরাও রাষ্ট্রপ্রধান হও। তোমরাও বড় বড় কাজ করো যেমন পুরুষ করছে। কিন্তু পরিসংখ্যান দেখুন, বাইরে বের হয়ে আসা কোটি কোটি নারীর মধ্যে ক'জন রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছে। হাতের আঙুলে তাদের গোনা যাবে, আর কোটি কোটি নারীকে রাস্তায় এনে বে-আব্রু করা হয়েছে। (ইছলাহী মাওয়াইয, পৃ. ১৫৩)

পাশ্চাত্যে কর্মজীবী নারীদের শতকরা ক'জন সরকারী-বেসরকারী উচ্চ পদে চাকুরী করে? এবং সেজন্য তাদেরকে কী পরিমাণ মূল্য দিতে হয়? পনেরো দিনও হয়নি, আই, এম, এফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল)-এর ব্যবস্থাপনা প্রধান হোটেল পরিচারিকার উপর যৌননির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। এর আগে তিনি তার সহকর্মী একনারী অর্থনীতিবিদের উপরও যৌন হামলা চালিয়েছিলেন তবে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়েছিলেন। এখন তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারীর পক্ষ হতে অসংখ্য অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। বলাবাহুল্য, এরা সবাই উচ্চসমাজের নারী। পক্ষান্তরে সিংহভাগ নারীকেই করতে হয় সামান্য বেতনের নিমণস্তরের অসম্মানজনক কাজ, আর তাদের মন ও দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে প্রতিদিন। 'তাদের কাঁদবারও সুযোগ নেই'একথা বলেছেন আমেরিকার সি, এন, এন, এর একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা। তিনি নিমণস্তরের কর্মজীবী নারীদের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিলেন।

ড. মুস্তফা সিবাঈ বলেন, 'পাশ্চাত্য-নারীর স্বাধীন ও জৌলুসপূর্ণ জীবনের যে চিত্র আমাদের দেখানো হয়, বাস্তবে তা খুব কম নারীর ভাগ্যেই জোটে। কোটি কোটি সাধারণ

নারীর জীবন সেখানে দাসীর চেয়েও জঘন্য। এমনকি বাইরের জৌলুসি জীবনের ভিতরেও আছে এমন আগুন-যন্ত্রণা যা অতীতে কোন জাতির নারী কোন সভ্যতার অধীনে ভোগ করেনি।

আমাদের দেশেও একই চিত্র আপনি দেখতে পাবেন। হাতে গোনা কিছু নারী কর্পোরেট চাকুরি করছে এবং ভোগবিলাসের জীবন যাপন করছে। অন্যরা হয় সাধারণ কর্মক্ষেত্রগুলোতে নিগৃহীত হয়, আর না হয় পথে মাথায় ইটের বোঝা বয়। এর নাম যদি হয় অধিকার ও স্বাধীনতা, তাহলে দূর থেকে তাকে 'প্রণাম'।

পারিবারিক ব্যবস্থায় ধ্বস

পৃথিবীর সকল প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা এবং সকল ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা এ বিষয়ে একমত যে, মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কোন মূল্যে পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য। সেই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক সকল সমাজবিজ্ঞানী এটাও স্বীকার করেন যে, নারীই হলো পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার অর্থই হলো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া, আর সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে, আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা হতে বাধ্য।

নারীর বাইরে আসা এবং কর্মজীবী হওয়ার কারণে ইউরোপ আমেরিকায় আজ পারিবারিক ব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। একে তো পাশ্চাত্যের পুরুষ বিবাহবিমুখ হয়ে পড়েছে। তদুপরি কোন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হচ্ছে না। একজন সমাজবিজ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, 'এমন স্বামী বা স্ত্রী এখন আপনি কমই দেখতে পাবেন, যে বলবে, এটা তার তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ নয়। খুব কম সন্তানই এখন আপন মা, কিংবা আপন বাবাকে কাছে পায়। কুমারি মাতার সংখ্যা দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে না, বরং আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে।'
এর প্রধান কারণ হলো, স্ত্রী অর্থ উপার্জন করে সংসারে অর্থের যোগান দিচ্ছে, কিন্তু স্বামীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছে না। ফলে পুরুষ ঘরের বাইরের জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে নারীও শেষ পর্যন্ত একই পথে

পা বাড়ায়। ফলে পারস্পরিক অবিশ্বাস এমন চরম আকার ধারণ করে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে তাদের অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা হয় সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত। তারা ব্যাপকহারে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সহিংস অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, যার প্রধান কারণ পারিবারিক তত্ত্বাবধানের অনুপস্থিতি। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে খোদ পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তারা সমাজ ও সভ্যতার পতন ঘনিয়ে আসছে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন। তারা প্রায় সবাই একমত যে, নারীর বহির্মুখী কর্মজীবনই পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের পূজনীয় দার্শনিক রাসেলও এ কথা বলেছেন। প্রখ্যাত তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ জন সিমন বলেন, 'নারী হয়ত কিছু অর্থ উপার্জন করছে, কিন্তু এর ফলে পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

আগস্ট কাউন্ট তার 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' গ্রন্থে বলেন, 'সঠিক অর্থে মানব-উন্নয়ন করতে হলে নারী-জীবন যথাসম্ভব পরিবারকেন্দ্রিক ও ঘরোয়া হতে হবে এবং বাইরের কাজ থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে, যাতে সে তার প্রধান দায়িত্ব পালন করতে পারে।'

তিনি আরো বলেন, 'এজন্য স্ত্রীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচোভ তার সুবিখ্যাত 'প্রেস্ট্রয়কা' গ্রন্থে বলেছেন, 'মেয়েদের আমরা বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে এসেছি। তাতে উৎপাদন হয়ত কিছু বেড়েছে, কিন্তু এত বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে যা রোধ করার কোন উপায় নেই। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করে উপায় বের করতে হবে, কীভাবে নারীকে ঘরে আনা যায়।'

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা

সবকিছু হারিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তানায়কগণ পরিবার সম্পর্কে আজ যা ভাবছেন, ইসলাম চৌদ্দশ বছর আগেই তা বলে দিয়েছে এবং এরই উপর গড়ে উঠেছে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা। কোরআন বলেছে-হে নারীসমাজ, তোমরা তোমাদের ঘরে স্থির থাকো।

ইসলামী বিশ্বে এত অন্যায়-অনাচার, এত অবক্ষয়-অধপতন এবং 'দুশমনানে ইসলামের' এত ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের পরো এখন পর্যন্ত যে পারিবারিক ব্যবস্থা কিছু না কিছু টিকে আছে তার মূল কারণ কিন্তু এটাই যে, মুসলিম উম্মাহর সিংহভাগ নারী এখনো ঘরে আছে এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দেখভাল করছে, যদিও অধিকাংশেরই সে শিক্ষা নেই।

পৃথিবীতে কোন প্রতিষ্ঠান একজন পরিচালক ও ব্যবস্থাপক ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, একই ভাবে টিকে থাকতে পারে না দু'জন পরিচালকের উপস্থিতিতে। সুতরাং পৃথিবীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও সবচে' মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবার যেন সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় এবং উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়, পরিবারের জন্য পরিচালক দরকার এবং একজন পরিচালক দরকার। তো ইসলাম তাকেই পরিবার-পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে যার কাঁধে পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এটাই একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। এর বাইরে যা কিছু করা হবে তা শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।

পাশ্চাত্য কী চায়?

পাশ্চাত্যসভ্যতার কর্ণধারগণ আজ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, তাদের সমাজ ও সভ্যতার অবক্ষয়ের মূল কারণ কী এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? কিন্তু অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং পরিবার-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে সমাজ ও সভ্যতার দেহে পচন ধরা শুরু হয়ে গেছে। এখন আর ফিরে আসার কোন উপায় নেই। এ বিষয়ে মিসরের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, ড. মুস্তফা সিবা'ঈ নিজের বড় শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, '১৯৫৬ সালে লন্ডনে জনৈক ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমার কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমরা এর ভালোটুকু গ্রহণ এবং মন্দটুকু বর্জন করি।

তিনি বললেন, এটা সম্ভব নয়। কারণ সভ্যতার সত্তা অবিভাজ্য। যেমন, ইউরোপে শিল্পবিপ্লব পরিবার ভেঙ্গেছে, কারণ কাজের জন্য নারীকে বাইরে আসতে হয়েছে, যা অনিবার্য ছিলো, অথচ সেটাই পরিবার ভাঙ্গার কারণ ছিলো। (এখন কোনটা নেবেন, কোনটা বাদ দেবেন?)

আমি বললাম, আমার মতে শিল্প বিপ্লব আপনাদের পরিবার ভাঙ্গার কারণ ছিলো না, কারণ ছিলো নারীর গৃহত্যাগ, আর তা অনিবার্য ছিলো না; বরং আপনারাই নারীকে বের করেছেন, প্রথমত নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায়, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার কারণে। আপনারা চাননি কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং মা হিসাবে নারীর আর্থিক দায়িত্বভার বহন করতে। ফলে তারা বাড়ির বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

তিনি জানতে চাইলেন, এরূপ সমস্যায় আপনারা কী করবেন?

আমি বললাম, ইসলামে নারীর জীবিকা হয় পিতার উপর, না হয় স্বামীর উপর, (কিংবা সন্তানের উপর।) কোন অবস্থাতেই তার নিজের উপর নয়।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, পাশ্চাত্য এতটা স্বার্থত্যাগে অক্ষম।
আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। পানির জাহাযে বেলজিয়াম যাওয়ার পথে এক ইতালীয় তরুণীর সঙ্গে কথা হয়। অক্সফোর্ডে অধ্যয়নরতা এই তরুণী আমার কাছে ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে চায়। আমি যখন বললাম, ইসলাম নারীকে উপার্জনের কষ্ট থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, সে গৃহকর্ত্রীরূপে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে, তখন সে অকপটে বললো, মুসলিম নারীর প্রতি সত্যি আমার ঈর্ষা হয়। কত ভালো হতো আপনাদের দেশে যদি আমার জন্ম হতো! আমি বললাম, তুমি কি পারো তোমার সমাজের নারীকে গৃহমুখী হওয়ার এবং পুরুষকে তার দায়িত্ব পালন করার আবেদন জানাতে?

এবারও সে অকপটে বললো, সময় পার হয়ে গেছে। নারী এখন বাইরের জীবনের স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন ঘরোয়া জীবন তার জন্য কঠিন হবে, যদিও আমি বিশ্বাস করি, এতেই তার শান্তি নিহিত।'

মোটকথা পাশ্চাত্যের চিন্তানায়কগণ জানেন যে এটা এখন অসম্ভব, অন্যদিকে মুসলিম সভ্যতায় পারিবারিক ব্যবস্থা এখনো সম্পূর্ণ অটুট। সুতরাং দুই সভ্যতা 426/425 ইসলামী :: সভ্যতার বিজয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, যদি না মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাকেও গুঁড়িয়ে দেয়া যায়। এজন্যই পাশ্চত্যের চিন্তানায়কগণ

তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে তাদের সমাজদেহের পচনব্যাধি আমাদের সমাজেও ছড়িয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।

কুরআনে নারীর অধিকার: প্রসঙ্গ মীরাছ

আমরা যে কথাটি সব সময় বলে এসেছি এবং আমৃত্যু বলে যাব, তা হচ্ছে, নারীর কুরআনী অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন। ব্যক্তি ও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটিই নারীর মুক্তি ও মর্যাদার একমাত্র পথ। এবং এ পথেই প্রতিষ্ঠিত হবে নারীর সকল অধিকার। পক্ষান্তরে অধিকার অধিকার বলে যতই চিৎকার করা হোক অযৌক্তিক ও মৌল ভিত্তিহীন কাজকর্মের দ্বারা নারীর অধিকার কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না; বরং তা নারীর মুক্তি ও মর্যাদাকে করবে সুদূর পরাহত। তাই নারী সমাজেরও কর্তব্য, সাফসাফ জানিয়ে দেওয়া, ব্যক্তি ও সমাজের কাছে আমাদের একমাত্র দাবি, আর তা হল নারী-সমাজের কুরআনী অধিকার প্রতিষ্ঠিত কর।
আজ মুসলিম সমাজের প্রতিটি পুরুষকে শপথ করতে হবে যে, আমি ব্যক্তি জীবনে নারীর সকল প্রাপ্য যথাযথভাবে পরিশোধ করব, তেমনি সমাজ-জীবনেও তাঁর কুরআনী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করব। ঈমানদার নারী ও পুরুষের এই মিছিলে যারা শামিল হতে চায় তাদের নিয়ে পথে আলো ছড়াতেই আমাদের এই সামান্য আয়োজন।

এখানে মীরাছ বিষয়ে কয়েকটি লেখা পত্রস্থ হল। লেখাগুলি পাঠ করে কারো মনে যদি মীরাছ আদায়ের প্রেরণা জাগে তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাদের সকল আমালকে কবুল করুন। আমীন।

পুত্র-কন্যার মাঝে সমতা: কিছু নির্দেশনা

হাদীসে শরীফে কন্যাসন্তানের লালন-পালনের ছওয়াব ও ফযীলত যেমন আছে তেমনি আছে তার অধিকারসমূহের বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাষায় নারীর অধিকারসমূহ বলে দিয়েছেন। আর এই অধিকারগুলো প্রধানত

এমন, যা থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হত জাহেলি যুগে। বর্তমানে যুগের অবস্থাও তা থেকে ভিন্ন নয়। তাই এখানে তাদের অবহেলিত কিছু অধিকারের কথা আলোচনা করা হল, যেন এই অবহেলার নিরসন হয়।

সন্তানদের প্রতি মমতা প্রকাশে সমতা

কারো কাছে পুত্রসন্তান বেশি প্রিয়, কারো কাছে কন্যাসন্তান। তবে অধিকাংশ মানুষই পুত্রসন্তান বেশি পছন্দ করে। মমতা ও মনের টান যেহেতু মানুষের ইচ্ছাধীন নয় তাই কারো প্রতি মনের টান বেশি হলে বা কম হলে মানুষ অপরাধী হয় না, কিন্তু এর প্রকাশটি যেহেতু মানুষের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের অধীন তাই এ বিষয়ে সমতা বজায় রাখা অপরিহার্য। অনেকে এই সমতা রক্ষা করে না। পুত্র-কন্যার মাঝে অসম আচরণ করে। পুত্রকে বেশি আদর করে, উপহার বেশি দেয়, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে কন্যার খোঁজখবরও নিতে চায় না। আচার-আচরণে পিতামাতা থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়, যা দ্বারা সন্তানের মনে এই সংশয় জাগে যে, মা-বাবা অমুককে বেশি স্নেহ করেন, আমাকে কম। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এমন অসম আচরণ অন্যায়। কিয়ামতের দিন এ জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

হাদীসের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রন্থ 'মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক'-এ ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (মৃত্যু: ১২৬ হি.-২১১ হি.) বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। ইতিমধ্যে ঐ সাহাবীর এক পুত্র তার কাছে এল। তিনি তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পর তার এক কন্যাও সেখানে উপস্থিত হল। তিনি তার হাত ধরে নিজের কাছে বসালেন। এটি লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

ولو عدلت كان خيرا لك، قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل .وفي رواية الطحاوي :فهلا عدلت بينهما ؟

অর্থাৎ উভয় সন্তানের প্রতি তোমার আচরণ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। তোমরা নিজেদের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। এমনকি চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রেও।-মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯/১০০

সকল সন্তানকে সমান উপহার দেওয়া

সন্তানদের প্রতি আদর স্নেহ প্রকাশের মতো হাদিয়া-উপহারের ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা জরুরি। সুতরাং পিতামাতা যখন সন্তানদেরকে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় কিংবা কোনো খাদ্যদ্রব্য দিবেন তখন সকলকে সমান হারে দিতে হবে। কন্যাকে ঠিক ততটুকুই দিবে যতটুকু পুত্রকে দেওয়া হয়েছে। ছেলেকে বেশি আর মেয়েকে কম কিংবা এর বিপরীত করা যাবে না। বিশেষ করে আনন্দের উপলক্ষগুলোতে যখন সন্তানদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয় তখনও সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য। যেমন ঈদের দিনে ঈদি সমান হারে দেওয়া, কোনো সফর থেকে ফেরার পর হাদিয়া-উপহার দিলে সবাইকে সমান দেওয়া ইত্যাদি।

হাদীস শরীফে আছে, বশীর ইবনে সাদ রা. একবার নিজপুত্র নুমান ইবনে বশীরকে কিছু জিনিস হাদিয়া করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাক্ষী বানানোর জন্য নুমানকে তাঁর নিকট নিয়ে এলেন। নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরুপ উপহার দিয়েছ? তিনি বললেন, জ্বী না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم وفي رواية :قاربوا بين أولادكم

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। (আর এতটুকু চেষ্টা অবশ্যই কর যে, উপহার-সদাচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অংশ যেন কাছাকাছি হয়।)-সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৪০৫৯, ৪০৬৪; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯/৯৮

প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলো ব্যতিক্রম

পিতামাতা যদি কোনো সন্তানের প্রয়োজনের খাতিরে অন্যদের চেয়ে তার পিছনে কিছুটা বেশি খরচ করে, যেমন কারো অসুস্থতার সময় কিংবা পড়াশোনার জন্য অথবা ছেলে বা মেয়ে কোনো সফরে যাচ্ছে; একজনের সফর অল্প সময়ের, অন্যজনের সফর দীর্ঘ, একজনের সফরে অর্থের প্রয়োজন বেশি, অন্যজনের কম এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে তাদেরকে প্রয়োজন অনুপাতে কম-বেশি দিলে দোষ নেই। যে সন্তানের যতটুকু প্রয়োজন পিতামাতা তার জন্য ততটুকু খরচ করতে পারেন।

জীবদ্দশায় সম্পত্তি বণ্টন অপরিহার্য নয়

অনেকে জীবদ্দশাতেই স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ সন্তানদের মাঝে বণ্টন করতে চায়। প্রথমত এটা কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত পিতামাতার জীবদ্দশায় তাদের সম্পদে সন্তানদের কোনো অধিকার সাব্যস্ত হয় না; বরং পিতামাতাই নিজ সম্পদের মালিক। তারা ইচ্ছা করলে সন্তানদের মাঝে তা বণ্টন করতেও পারেন, ইচ্ছা করলে নাও করতে পারেন। সন্তানরা পিতামাতার কাছে এই দাবি করতে পারে না যে, আপনারা যা কিছু উপার্জন করেছেন তা আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিন।

অনেক সন্তান এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং এই বলে পিতামাতাকে বাধ্য করে যে, আপনার তো এখন আর এই সম্পদের প্রয়োজন নেই, এগুলো তো এখন আমাদের অধিকার। তাই জীবিত অবস্থায়ই সবকিছু বণ্টন করে ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যান। আপনার মৃত্যুর পর আমরা ঠিকমতো সম্পদের হিস্যা পাব কি পাব না-এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। সুতরাং এখনই জমিজমা বণ্টন করুন।

মনে রাখতে হবে যে, পিতামাতাই তাদের সম্পদের মালিক। সুতরাং বণ্টন করা, না করার বিষয়ে তারা স্বাধীন। অবশ্য পিতামাতা যদি মনে করেন যে, তাদের জীবদ্দশাতেই সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া সমীচীন হবে তাহলে তারা তা করতে পারেন। যদি না করেন তবে এর সুযোগও তাদের রয়েছে।

জীবদ্দশায় যেভাবে সম্পদ বণ্টন করা হবে

যদি পিতামাতা জীবদ্দশাতেই সন্তানদের মাঝে নিজেদের সম্পদ বণ্টন করতে চান তবে এরও অবকাশ আছে। যদিও মীরাছের অধিকার ব্যক্তির মৃত্যুর পরই সাব্যস্ত হয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বের সম্পদ বণ্টন যেহেতু অগ্রিম মীরাছ বণ্টনের নিয়তে হয়ে থাকে তাই এক্ষেত্রেও উত্তম হল শরীয়তের মীরাছ-ব্যবস্থার নীতিমালা অনুযায়ী তা বণ্টন করা এবং প্রত্যেককে তার হিস্যা হস্তান্তর করে দেওয়া। তবে এই অগ্রিম বণ্টন যেহেতু প্রকৃত মীরাছ বণ্টন নয় তাই এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েকে সমান হারে দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে।(-তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম ২/৭৫)

মনে রাখা উচিত যে, মৃত্যু-পূর্ব সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ছেলে বা মেয়েকে বঞ্চিত করা কিংবা মীরাছের প্রাপ্য হিস্যা থেকে কম দেওয়া জায়েয নয়। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

বিবাহের কারণে কন্যার অধিকার রহিত হয় না

আমাদের সমাজের অবস্থা তো এই যে, একে তো পিতা তার জীবদ্দশায় মেয়েদেরকে সম্পদ দেয় না। এমনকি যদি বলা হয়, আপনি তো সব সম্পদ ছেলেদেরকেই দিয়ে দিলেন, মেয়েদেরকে কিছু দিলেন না? তখন জবাবে বলে, আমি তো মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি। বিবাহের সময় তাকে যা কিছু দিয়েছি তাতেই তার পাওনা আদায় হয়ে গেছে। এই ধারণা ভুল। বিয়ের সময় মেয়েকে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়ার কারণে তার মীরাছের হক শেষ হয়ে যায় না। তেমনি এ কারণে তাকে পিতার সম্পদ থেকেও বঞ্চিত করা যায় না।

ছেলের বিয়েতে পিতা যেমন খরচ করেন তেমনি মেয়ের বিয়েতেও করবেন। সাধারণত দেখা যায়, পুত্রের বিয়েতে বেশি খরচ করা হয়। এটাও ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা উচিত। এর সহজ উপায় হল, নিজের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে আগেভাগেই নির্দিষ্ট করে নিবে যে, প্রত্যেক পুত্র-কন্যার বিয়েতে এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করব। এরপর সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থেকে ছেলে-মেয়ের বিয়ের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়

করবে। যদি কারো ক্ষেত্রে কিছু বেঁচে যায় তাহলে নগদ আকারে তা প্রদান করবে। এমন যেন না হয়, এক সন্তানের বিয়েতে বেশি খরচ করা হল, অন্য সন্তানের বিয়েতে কম। কারণ এটাও এক ধরনের অন্যায়, যা শরীয়তে অপছন্দনীয়।
মোটকথা মেয়ের বিয়েতে সবকিছু দিয়ে দিয়েছি, এখন আর তার কোনো অধিকার নেই, জীবদ্দশাতেও সে আর কিছু পাবে না, মৃত্যুর পরও মীরাছের সম্পদে তার কোনো অধিকার থাকবে না-এটা স্পষ্ট জুলুম এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

সম্পদের হস্তান্তর অপরিহার্য

কোনো কোনো পিতামাতা তাদের জীবদ্দশায়ই তাদের সম্পদ শুধু মৌখিক বা লিখিত আকারে বণ্টন করে দেন। যেমন ঐ জমি এই ছেলের নামে, অমুক দোকান ঐ ছেলের নামে, অমুক ফ্ল্যাট এই মেয়ের নামে, অমুক প্লটটি অমুক মেয়ের নামে ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেকের অংশ পৃথক পৃথক করে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত মৌখিক বা লিখিত ঘোষণার পরও সম্পদ পিতামাতার কব্জাতেই থাকে। এমনও হয় যে, একটি বণ্টনযোগ্য সম্পদ একাধিক সন্তানের নামে লিখে দেওয়া হয়। যেমন একটি বড় দোকান বা বাড়ি দুই-তিন সন্তানের নামে লিখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকের অংশ তার কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। মনে রাখতে হবে যে, হস্তান্তর করা ছাড়া শুধু মৌখিক বা লিখিত বণ্টনের কোনো গ্রহণযোগ্যতা শরীয়তে নেই এবং এভাবে তাদের মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং তা যথারীতি পিতার সম্পদ বলেই গণ্য হয়। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর মীরাছ বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় তা বণ্টন করতে হবে।

তাই জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টন করতে চাইলে সঠিক পদ্ধতি এই যে, প্রথমে বণ্টনযোগ্য সকল সম্পদ পৃথক পৃথক করে ভাগ করবে। এরপর সন্তানদের হাতে তা হস্তান্তর করবে। আর সম্পদ বিভিন্ন ধরনের হলে কমপক্ষে এসবের চাবি, ডকুমেন্ট বা মালিকানা সার্টিফিকেট ইত্যাদি হস্তান্তর করতে হবে। আরো সহজ ও উত্তম পন্থা এই যে, যিনি জীবদ্দশায় তার সকল সম্পদ বণ্টন করতে চান তিনি প্রথমে মুফতীর কাছ থেকে তার করণীয় বুঝে নিবেন। এরপর সে নিয়মে বণ্টন করবেন। যেন তার এই বণ্টনটি শরীয়তের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য হয়।

যাইহোক, মেয়েকে তার প্রাপ্য হিস্যা থেকে কম দেওয়া বা একেবারেই না দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জুলুম ও নাজায়েয। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি তার ওয়ারিশকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের অংশ থেকে বঞ্চিত করবেন।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১৬/২১৫

নারীর প্রতি এই অবিচার মূলত জাহেলি যুগ থেকে চলে আসা ভ্রান্ত চিন্তারই কুফল। জাহেলি যুগে আরবের কাফিররা কন্যাসন্তানকে কোনো কিছুই মনে করত না। এমনকি তাদেরকে বাঁচার অধিকারটুকু দিতেও প্রস্তুত ছিল না। আর এখন মুসলমানরাও মেয়েদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করে। এমনকি জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে বঞ্চিত করে। বিয়েশাদিতে প্রথাগত সামান্য কিছু ব্যয় করেই মনে করে যে, তাদের হক আদায় হয়ে গেছে। এখন অবশিষ্ট সম্পদে তাদের কোনো অধিকার নেই, এতে শুধু পুত্রদের অধিকার। এই চিন্তা ও রীতি সম্পূর্ণ ভুল; বরং পিতার সম্পদে পুত্র-কন্যা উভয়ের অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা জরুরি। আর আগেও বলা হয়েছে যে, সন্তানের প্রয়োজনের কারণে হাদিয়া-উপহারের ক্ষেত্রে কম-বেশি করতে কোনো দোষ নেই। তাই কোনো মেয়ে যদি অভাবী হয়, যার আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন, আর ছেলে স্বচ্ছল, প্রয়োজনের সকল কিছুই তার আছে, এ অবস্থায় পিতা যদি মেয়েকে কিছু বেশি দেন তাহলে কোনো দোষ নেই। তবে সকলেই যদি অভাবী হয় কিংবা আর্থিক দিক থেকে সকলের অবস্থা এক ধরনের হয় তাহলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে কম-বেশি করবে না।
মোটকথা, শরীয়তের অনেক বিধান রয়েছে, যে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। এজন্য ইলমে দ্বীন অর্জনের চেষ্টা করা সকলের জন্য অপরিহার্য।

["বেটী আল্লাহ কী রহমত আওর যিন্দেগী মে তাকসীমে জায়দাদ কা তরীকা" শীর্ষক পুস্তিকা অবলম্বনে।]

মীরাছে নারীর হিস্যা ও ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধান

একমাত্র ইসলামই নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। কারণ ইসলাম মানবরচিত কোনো জীবন-ব্যবস্থা নয়; বরং আল্লাহ রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত। আল্লাহ তাআলা সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মীরাছের বিধান, যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধান ও নীতি।

মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে জীবিত আত্মীয়দের কার হিস্যা কতটুকু তা কুরআন মজীদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং তা অকাটা ও দ্ব্যর্থহীন। এতে পুরুষের হিস্যা যেমন আছে তেমনি আছে নারীর হিস্যা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

للرجال نصيب من ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

অর্থ: পিতা-মাতা এবং নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ।-সূরা নিসা: ৭

সাধারণত কুরআন মজীদে আহকাম ও বিধানের বিস্তারিত বিবরণ থাকে না, উসূল ও মূলনীতি থাকে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ থাকে হাদীস শরীফে। যেমন কুরআন মজীদে নামাযের আদেশ করে বলা হয়েছে-

اقيموا الصلاة

নামায আদায় কর। কিন্তু নামায আদায়ের পদ্ধতি, রাকাত-সংখ্যা ও বিস্তারিত মাসায়েল এসেছে হাদীস শরীফে।

পক্ষান্তরে উত্তরাধিকারের বিষয়টি একেবারে ভিন্ন। প্রত্যেক ওয়ারিসের অংশ এক এক করে কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করে পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতার অংশ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

اباء كم وابناءكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا، فريضة من الله أن الله كان عليما حكيما

তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা তা জান না। নিশ্চয় এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা নিসা (৪):১১১

এ কারণেই মীরাছের নির্ধারিত হিস্যার উপর আপত্তি করা, জুলুম বা বৈষম্যের অভিযোগ তোলার অর্থ সরাসরি আল্লাহ তাআলা উপর অভিযোগ তোলা। আল্লাহ তাআলা মীরাছের বিধান সম্পর্কে বলেছেন-

تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم .ومن بعض الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

অর্থ: এইসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।-(সূরা নিসা: ১৩-১৪)

এ নিবন্ধে নারীর হিস্যা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলোর উপর সামান্য আলোকপাত করতে চাই তা এই:

১. ইসলামের মীরাছ-ব্যবস্থায় নারীর হিস্যা সুসংরক্ষিত। অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ বা জীবনব্যবস্থায় এর দৃষ্টান্ত দেখানো যাবে না।

২. পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ হিস্যা দেওয়া হয়েছে বলে যারা ইসলামের এই বিধানের সমালোচনা করেন তারা এই বিধানটিকে খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করেন।

৩. যেসব ক্ষেত্রে একজন পুরুষকে দু'জন নারীর সমান হিস্যা দেওয়া হয়েছে তা যৌক্তিক ও স্বাভাবিক নীতিমালার কারণেই দেওয়া হয়েছে।

১. ইসলামের মীরাছ-ব্যবস্থায় নারীর হিস্যা সুসংরক্ষিত

১. নারী মা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পায়, কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ।

২. নারী দাদী ও নানী হিসেবে পুরো সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পায়।

৩. নারী কন্যা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির অর্ধেক পায়, দুই বা ততোধিক কন্যা হলে সকলে মিলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায়। আর ভাইয়ের সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।

৪. নারী পৌত্রী হিসেবে দাদার সম্পদ থেকে কখনো অর্ধেক পায়, কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ এবং পৌত্রের সাথে হলে পৌত্রের অর্ধেক পায়।

৫. নারী সহোদরা বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়। দুই বা ততোধিক হলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায় এবং সহোদর ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।

৬. নারী বৈমাত্রেয় বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়, কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ এবং একাধিক থাকলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায়। ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।

৭. নারী বৈপিত্রেয় বোন হিসেবে কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ পায়, একাধিক থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ পায়।

৮. নারী স্ত্রী হিসেবে কখনো চার ভাগের এক ভাগ, কখনো আট ভাগের এক ভাগ পায়।

শরীয়তে নারীর নির্ধারিত অংশ অন্যভাবেও দেখানো যেতে পারে। যথা:

ক. স্থায়ী ওয়ারিসদের মাঝে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান

ওয়ারিসদের মধ্যে নিকটবর্তীদের কারণে দূরবর্তীগণ কখনো অংশ কম পায়, কখনো সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। কিন্তু ছয় প্রকারের ওয়ারিস এমন আছে, যারা কখনো বঞ্চিত হয় না। তাদের তিন প্রকার পুরুষ: পিতা, পুত্র ও স্বামী। আর তিন প্রকার নারী: মাতা, কন্যা ও স্ত্রী।
এরা সকলেই স্থায়ী ওয়ারিস।

খ. যাবিল ফুরুষের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ
কুরআন মজীদে যে সকল ওয়ারিশের অংশ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে যাবিল ফুরুষ বলে। মোট ১২ প্রকার ওয়ারিস যাবিল ফুরুষের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে ৪ প্রকার পুরুষ, ৮ প্রকার নারী।

যাবিল ফুরুষ পুরুষগণ হচ্ছে: ১. স্বামী ২. পিতা ৩. দাদা, দাদার পিতা ৪. বৈপিত্রেয় ভাই।

যাবিল ফুরুষ নারীগণ হচ্ছে: ১. স্ত্রী ২. মাতা ৩. দাদী, নানী, দাদীর মাতা, দাদার মাতা ৪. কন্যা ৫. পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা ৬. সহোদরা বোন ৭. বৈমাত্রেয় বোন ৮. বৈপিত্রেয় বোন।

গ. আসাবাতেও নারী বেশি

যাবিল ফুরুযগণ তাদের অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ যারা পায় তাদেরকে আসাবা বলা হয়। আসাবা তিন স্তরের। প্রথম স্তরে চার প্রকারের পুরুষ। দ্বিতীয় স্তরে চার প্রকারের নারী আর তৃতীয় স্তরে শুধু এক প্রকারের নারী।

ঘ. কুরআন মজীদে উল্লেখিত মীরাছের নির্ধারিত হিস্যা সর্বমোট ৬টি। আর তা হল দুই ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ এবং তিন ভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ ও ছয় ভাগের এক ভাগ। এই অংশগুলো যাদের জন্য নির্ধারিত তাদের মধ্যেও নারীর সংখ্যা বেশি।

নিম্নে তফসীল দেওয়া হল:

দুই ভাগের এক ভাগ: বিভিন্ন অবস্থায় মোট পাঁচ প্রকারের ওয়ারিস এই অংশ পায়। তারা হচ্ছে : ১. স্বামী ২. কন্যা ৩. পুত্রের কন্যা ৪. সহোদরা বোন ৫. বৈমাত্রেয় বোন।

এদের চার প্রকারই নারী, এক প্রকার হল পুরুষ।

চারভাগের এক ভাগ: এটি পায় দুই প্রকারের ওয়ারিস: ১. স্ত্রী ২. স্বামী।

আটভাগের এক ভাগ: এটি স্ত্রীর অংশ।

তিনভাগের দুই ভাগ মোট চার প্রকারের ওয়ারিসের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। এরা সকলেই নারী: ১. দুই বা ততোধিক কন্যা ২. দুই বা ততোধিক পৌত্রী ৩. দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন ৪. দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন।

তিনভাগের একভাগ: এটি নির্ধারিত তিন প্রকারের ওয়ারিসের জন্য। তার মধ্যে দুজনই নারী:

১. মাতা ২. বৈপিত্রেয় বোন একাধিক হলে।

ছয়ভাগের এক ভাগ: এটি মোট সাত প্রকারের ওয়ারিশের জন্য নির্ধারিত। তন্মধ্যে দুই প্রকার পুরুষ ও পাঁচ প্রকার নারী: ১. পিতা ২. দাদা ৩. মাতা ৪. পৌত্রী (একজন হলে) ৫.বৈমাত্রেয় বোন ৬. দাদী, নানী, দাদার মাতা ৭. বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন।

নারীর অংশ নির্ধারিত থাকার সুফল

মোটকথা ইসলামী শরীয়তে নারীর হিস্যা সুসংরক্ষিত। আর নারীর অংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণে সর্বাবস্থায় সে তার নির্ধারিত অংশ পায়। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই স্তরের পুরুষের অংশ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে সে কোনো অংশ পায় না। নীচের দুটি উদাহরণ লক্ষ করুন: ১. শরীফা বেগম নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন আপন বোন ও একজন বৈমাত্রেয় বোন রেখে গেছেন। তাদের মীরাছের হিস্যা হবে নিম্নরূপ:

পক্ষান্তরে হাসিনা বেগমও নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন সহোদর বোন ও এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে গেছেন। তাদের মীরাছের হিস্যা হবে এ রকম:

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরীফা বেগমের বৈমাত্রেয় বোন সাত ভাগের এক ভাগ তথা শতকরা ১৪.২৮৫% অংশ পেলেও ঐ আত্মীয়দের উপস্থিতিতেই হাসিনা বেগমের বৈমাত্রেয় ভাই কিছুই পায়নি।

নিকটতর ওয়ারিস থাকার কারণে যে সকল দূরবর্তী ওয়ারিস সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যেও পুরুষ বেশি, নারী কম। অর্থাৎ এগার প্রকারের পুরুষ ও পাঁচ প্রকারের নারী। নিম্নে তফসীল দেওয়া হল:

১. দাদা: পিতা থাকলে, তেমনি পরদাদা বঞ্চিত হয় দাদা থাকলে।

২. সহোদর ভাই: পিতা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের কোনো একজন থাকলে।

৩. বৈমাত্রেয় ভাই: পিতা, পুত্র, পৌত্র বা সহোদর ভাইয়ের কেউ থাকলে, তেমনি সহোদর বোন থাকলে (যদি কন্যার কারণে বোন আসাবা হয়)।

৪. বৈপিত্রেয় ভাই: পিতা, দাদা বা পরদাদা, তেমনি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকলে।

৫. পৌত্র: পুত্র থাকলে। তদ্রূপ প্রপৌত্র বঞ্চিত হয় পৌত্র থাকলে।

৬. ভাতিজা (সহোদর ভাইয়ের পুত্র) পিতা, দাদা, পুত্র বা পৌত্র অথবা প্রপৌত্র কোনো একজনের উপস্থিতিতে, তেমনি সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপস্থিতিতে।

৭. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রের উপস্থিতিতে। তেমনি সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই কিংবা সহোদর ভাইয়ের পুত্র থাকলে।

৮. চাচা (পিতার সহোদর ভাই) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র থাকলে কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

৯. চাচা (পিতার বৈমাত্রেয় ভাই) আপন চাচা থাকলে কিংবা আপন চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১০. চাচাত ভাই (পিতার সহোদর ভাইয়ের পুত্র) চাচা (পিতার বৈমাত্রেয় ভাই) থাকলে, কিংবা এই চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১১. চাচাত ভাই (পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র): আপন চাচার পুত্র থাকলে কিংবা ঐ চাচাত ভাই যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

নারীগণ

১. দাদী, নানী: মা থাকলে।

২. পৌত্রী: পুত্র থাকলে, কিংবা একাধিক কন্যা থাকলে (যদি পৌত্রী আসাবা না হয়)।

৩. সহোদরা বোন: পিতা, পুত্র, পৌত্র কোনো একজন থাকলে।

৪. বৈমাত্রেয় বোন: সহোদরা বোন (যখন আসাবা হয়), পিতা, পুত্র, পৌত্র কেউ থাকলে। তেমনি দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন থাকলে (যদি তারা আসাবা না হয়)।

৫. বৈপিত্রেয় বোন: পিতা, পুত্র, কন্যা কোনো একজন থাকলে তেমনি পৌত্র বা পৌত্রী থাকলে।

এক পুরুষ দুই নারীর অংশ পায়-এটা ইসলামী উত্তরাধিকারের সর্বক্ষেত্রের নীতি নয়

ইসলামের সম্পূর্ণ মীরাছ-ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, ইসলামে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ হিস্যা দেওয়া হয়েছে। ধারণা দেওয়া হয় যে, এটা মূলত নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্যমূলক চেতনারই প্রতিফলন। (নাউযুবিল্লাহ)

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে চাই যে, মীরাছের হিস্যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে তা ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং এখানে বৈষম্যের কথা সভয়ে পরিহার করা উচিত। এরপর ইসলাম-বিদ্বেষীদের প্রচারণার অসারতা বোঝার জন্য এ বিষয়ে চিন্তা করতে পারি।

ইসলামের মীরাছ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয় যে, পুরুষকে পুরুষ হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং নারীর দ্বিগুণ দেওয়া হয়েছে-এটা সম্পূর্ণ অসত্য প্রচারণা। কারণ গোটা মীরাছ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে তিনটি অবস্থা দেখা যায়: ১. নারী কখনো পুরুষের সমান অংশ পেয়ে থাকে। ২. কখনো পুরুষের চেয়ে বেশি পেয়ে থাকে। ৩. কখনো পুরুষ বেশি পেয়ে তাকে। নীচে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। নারীর অংশ পুরুষের সমান

ক. দাদা-দাদী দুজনের হিস্যা ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পুত্র ৪৫.১৬৬%, দাদী ১৬.৬৬%, দাদা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫%।

খ. পিতা-মাতা দুজনেরই হিস্যা ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫%, ও পুত্র ৫৪.১৬৬%।

এটা কুরআন মজীদেরই বিধান। ইরশাদ হয়েছে-

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

উল্লেখ্য, প্রথম উদাহরণে মৃতের কন্যার হিস্যা মৃতের স্বামীর চেয়ে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে কন্যার হিস্যা মৃতের পিতার চেয়ে বেশি।

গ. বৈপিত্রেয় ভাই বোন একত্রে থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিবে। অর্থাৎ বৈপিত্রেয় একভাই এক বোন ৩৩.৩৩%, সহোদর দুই বোন ৬৬.৬৬% পাবে।

এই বিধানটিও কুরআন মজীদে আছে। ইরশাদ হয়েছে-

وان كان رجل يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

অর্থ: যদি পিতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা ভগ্নী তাহলে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশে।-সূরা নিসা: ১২)

এসব উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, একই মাইয়েতের মীরাছে বিশেষ কিছু নারী ও পুরুষকে সমান হিস্যা দেওয়া হয়েছে।

২. নারীর অংশ পুরুষের চেয়ে বেশি

মীরাছে পুত্র ও ভাইয়ের অংশ যেহেতু নির্ধারিত নয় তাই ভাই ও পুত্র কখনো বোন ও কন্যা থেকে কম পেয়ে থাকে। যেমন মাইয়্যেতের পিতা, মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রীর সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যা যতটুকু পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে তারা তার চেয়ে কম পেয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরূপ: স্ত্রী ১১.১১%, পিতা ১৪.৮১%, মাতা ১৪.৮১% এবং প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরূপ: স্ত্রী ১২.৫%, পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬% এবং প্রত্যেক পুত্র ২৭.০৮% করে পাবে। তাহলে ১ম ক্ষেত্রে প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% পাচ্ছে, অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথে পুত্র পাচ্ছে ২৭.০৮%।

আরেকটি উদাহরণ: মাইয়্যেতের স্বামী, পিতা ও মাতার সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যারা যে অংশ পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে পুত্ররা তার চেয়ে কম পায়। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরূপ: স্বামী ১৯.৯৯%, পিতা ১৩.৩৩%, মাতা ১৩.৩৩% এবং প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% করে পাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরূপ: স্বামী ২৫%, পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬% এবং প্রত্যেক পুত্র ২০.৮৩% করে পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% সম্পদ পেয়েছে অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথেই প্রত্যেক পুত্র পাচ্ছে ২০.৮৩%।

তেমনি কখনো বোন ভাই থেকে বেশি পায়। নীচের ছকটি দেখুন মাইয়েতের স্বামী, মাতা, বৈপিত্রেয় বোন ও বৈমাত্রেয় বোন থাকলে প্রত্যেকের মীরাছের হিস্যা হয় নিম্নরূপ: স্বামী ৩৭.৫%, মাতা ১২.৫%, বৈপিত্রেয় বোন ১২.৫% ও বৈমাত্রেয় বোন ৩৭.৫%। পক্ষান্তরে স্বামী, মাতা, বৈপিত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তাহলে প্রত্যেকের হিস্যা হয় নিম্নরূপ: স্বামী ৫০%, মাতা ১৬.৬৬%, বৈপিত্রেয় বোন ১৬.৬৬% ও বৈমাত্রেয় ভাই ১৬.৬৬%।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ক্ষেত্রে যে আত্মীয়দের সাথে বৈমাত্রেয় বোন শতকরা ৩৭.৫% পেয়েছে তাদের সাথেই বৈমাত্রেয় ভাই পেয়েছে তার অর্ধেকেরও কম।

এই উদাহরণগুলির সারকথা হল, একই ধরনের আত্মীয় রেখে দু'জন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে, কিন্তু আত্মীয়তার ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়েও এক মাইয়েতের নারী ওয়ারিসরা অপর মাইয়েতের পুরুষ ওয়ারিসদের চেয়ে সম্পদ বেশি পেয়েছে।

আর একই মাইয়েতের পুরুষ ওয়ারিসের চেয়ে নারী ওয়ারিস বেশি পাওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে গিয়েছে। যেখানে মৃতের কন্যাকে মৃতের স্বামীর চেয়ে এবং মৃতের কন্যা মৃতের পিতার চেয়ে বেশি পেয়েছে।

সমপর্যায়ের পুরুষ মীরাছ পায় না কিন্তু নারী পায়

১. নানী ছয় ভাগের এক ভাগ পায়, কিন্তু নানা কিছুই পায় না।

২. মৃতের স্বামী এবং সহোদরা বোনের সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন অংশ পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে সে পায় না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে অধিক হিস্যা দেয়া হয়নি। কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের হিস্যা সমান, কোনো ক্ষেত্রে বেশি। আর তা দুই মাইয়েতের মীরাছ তুলনা করলে যেমন পাওয়া যায় তেমনি এক মাইয়েতের মীরাছেও পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামে পুরুষের হিস্যা নারীর দ্বিগুণ-এটি ইসলামী মীরাছ-ব্যবস্থার খন্ডিত উপস্থাপনা।

এক পুরুষ পায় দুই নারীর অংশ

তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান অংশ পেয়ে থাকে। এটাও কুরআন মজীদেরই বিধান। ইরশাদ হয়েছে-

يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

এই আয়াতের বিধান হল, মাইয়েতের পুত্র-কন্যা দুটোই যদি থাকে তাহলে পুত্র পাবে কন্যার দ্বিগুণ। তেমনি পৌত্র ও পৌত্রী থাকলে পৌত্র পাবে পৌত্রীর দ্বিগুণ।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

এই আয়াতের বিধান হল মাইয়েতের সহোদর ভাই-বোন দুজনই যদি থাকে তাহলে ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ। একই কথা বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সারকথা

উপরের মীরাছ বণ্টন সংক্রান্ত শরীয়তের বিধিবিধানের কিছু অংশ উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। মনোযোগের সাথে পাঠ করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামের মীরাছ বণ্টনের মূল ভিত্তি কখনো এই নয় যে, কাউকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে অধিক দেওয়া হবে, আর কাউকে শুধু নারী হওয়ার কারণে কম দেওয়া হবে বা বঞ্চিত করা হবে; এ কারণেই উপরে আমরা দেখেছি যে, সর্বক্ষেত্রে না পুরুষকে অগ্রাধিকার পেয়েছে, না নারীকে; বরং কোথাও পুরুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোথাও নারীকে। আল্লাহ রাববুল আলামীন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় এবং নারী-পুরুষ উভয়েরই খালিক ও মালিক। উভয়ের জন্যই তিনি রহমানুর রাহীম। সুতরাং বান্দা ও বান্দির কাজ হল তাঁর বিধানের সামনে সমর্পিত হওয়া।

যেসব রহস্য ও তাৎপর্য মীরাছের আসমানী বিধানের পিছনে সক্রিয় তা সম্যকরূপে অবগত আছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তবে শরীয়তের নীতিমালা ও সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা ইসলামের মনীষীগণ যতটুকু উপলব্ধি করেছেন তা-ও সত্যান্বেষীদের প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট।

এক পুরুষ দুই নারীর সমান অংশ পাওয়ার কারণ

একথা সুস্পষ্ট যে, কম-বেশি শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে নয়; বরং দায়িত্ব, খরচ ও মৃতের সাথে সম্পর্কের মতো গভীর ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাপ্তি ও অধিকারের অভিন্নতার দাবি করেন তাদের বক্তব্যের অসারতা বোঝার জন্য অনেক বেশি জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তাদের দর্শন মেনে নিলে তো গোটা পৃথিবীই অচল হয়ে যাবে।

ধরুন একটি কোম্পানিতে কিছু পুরুষ এবং মহিলা কর্মরত আছেন। সেখানে প্রত্যেকের যোগ্যতা ও দায়িত্ব অনুসারে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা আবদুল করিম। তার বেতন ২০ হাজার টাকা। খালেদা ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন সাধারণ কর্মচারী। তার বেতন ১০ হাজার টাকা। এখন কোনো নারীবাদী যদি এখানে নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য দেখতে পান এবং এই বৈষম্য দূর করার দাবি তোলেন তাহলে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে? একই কথা উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রেও চিন্তা করা দরকার। এখানেও পুত্র ও ভাইকে কন্যা ও বোনের চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে তাদের দায়িত্ব ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নতার কারণে। এই ভিন্নতাকে বিবেচনা না করে 'নারী-পুরুষের সমান অধিকার' নীতিতে সম্পদ বণ্টন করাটাই হবে বৈষম্য।

একটি সর্বস্বীকৃত নীতি হল, "দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি"
বলা হয়েছে। অর্থাৎ যার দায় বেশি তার প্রাপ্তি বেশি, যার দায় কম তার প্রাপ্তি কম। পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর। শত্রুর মোকাবেলা করার দায়িত্বও পুরুষেরই। পরিবার ও সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ, তাদের চিকিৎসা ও বাসস্থানের দায়িত্বও পুরুষের উপর। নারীর উপর এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। বরং নারীর সকল খরচ পুরুষকে বহন করতে হয়। এমনকি যদি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তাহলেও ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রীর ভরণ পোষণ ও থাকার ব্যবস্থা পুরুষের দায়িত্বে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর তাদেরকেও (তালাকপ্রাপ্তাদেরকে) বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও।

তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে।... সামর্থ্যবান তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার সামর্থ্য কম সে সেই অনুযায়ী ব্যয় করবে।-(সূরা তালাক: ৬-৭)

সন্তান এবং সন্তানের মাতার খরচের দায়িত্ব পিতার উপর। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) সন্তানের পিতার উপর দায়িত্ব নিয়ম অনুযায়ী মাতার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা।-(সূরা বাকারা : ২৩৩)

মোহর আদায়ের দায়িত্ব পুরুষের উপর। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশিমনে তাদের মোহর দিয়ে দাও।-(সূরা নিসা: ৪)

বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলে প্রদেয় মোহর ও অন্যান্য সম্পদ স্ত্রী থেকে ফেরত নেওয়া নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও (সঙ্গত কারণে শরীয়তসম্মত পন্থায় তালাক ও নিকাহর মাধ্যমে) এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করে থাক তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।-(সূরা নিসা (৪): ২০)

স্ত্রীকে অঢেল সম্পদ দিলেও তা কিছুই নেওয়া যাবে না। এই স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে আবারও মোহর পাবে। কিন্তু পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করলে সেখানেও তাকে দিতে হবে। মোটকথা পুরুষের উপর খরচের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। নারীর উপর তা করা হয়নি।

তাছাড়া আরেকটি দিকও এখানে আছে। অনেকেরই হয়ত শুনতে ভালো লাগবে না, কিন্তু কথাটা বাস্তব। তা এই যে, পুরুষ দ্বারা বংশ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

পুত্র দ্বারা পিতার বংশ সংরক্ষিত হয়। কিন্তু কন্যা দ্বারা সংরক্ষিত হয় অন্যের বংশ। তদ্রূপ ভাই দ্বারা পিতার বংশ সংরক্ষিত হয়, আর বোন অন্যের বংশ বিস্তার করে। যার

সম্পদ বণ্টন হচ্ছে তার বংশ যার দ্বারা সংরক্ষিত হবে সেই অধিক সম্পদের অধিকারী হবে-এটাই তো যুক্তিযুক্ত।

নারীর ভরণ-পোষণ সবসময় পুরুষের জিম্মায়

নারী যখন কন্যা তখন তার ভরণপোষণ পিতার জিম্মায়।

কন্যার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তার সকল খরচ পিতাকে বহন করতে হবে।

'বিয়ের সূত্রে নারী স্বামী থেকে মোহরের হকদার।

* তখন তার সকল খরচ স্বামীর উপর। তার ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ও বাসস্থান যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা স্বামীর কর্তব্য।

* নারী বিধবা হলে তার দায়িত্ব, পিতা, পুত্র ও ভাইয়ের উপর।

নারী যখন মা, দাদী ও নানী তখন তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামী, পুত্র, পৌত্র ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নাতিদের উপর।
মোটকথা, নারী যে কোনো স্তরেরই হোক না কেন সর্বাবস্থায় তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কোনো না কোনো পুরুষের উপর অর্পিত হয়েছে। নারী সর্বাবস্থায় পুরুষের সহায়তা ও দায়িত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহলে পুরুষের দায়িত্ব, ঝুঁকি ও খরচের বোঝা অনেক বেশি। সুতরাং দায় অনুযায়ী তার প্রাপ্তিও বেশি হওয়াটাই সাম্যের দাবি। নারীর দায় নেই, তবুও অন্যান্য বিবেচনায় তাকে অর্ধেক দেওয়া হয়েছে। এটা তার স্বতন্ত্র মালিকানা। যা সে জমা রাখতে পারে। আর পুরুষ পাচ্ছে দ্বিগুণ। কিন্তু এতে রয়েছে নিজের সংসারের ও তার সংশ্লিষ্ট নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব। এ দিক থেকে বিচার করলে পুরুষের প্রাপ্তি বেশি নয়।

একটি উদাহরণঃ

এক ব্যক্তি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেছে। তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তিন লক্ষ টাকা। ইসলামী মীরাছ-ব্যবস্থা অনুযায়ী কন্যা পাবে এক লক্ষ, আর ছেলে পাবে দুই লক্ষ টাকা। ছেলে বিয়ে করল এবং স্ত্রীকে মোহর দিল দুই লক্ষ টাকা। মেয়ে বিয়ে করল এবং তার মোহরও দুই লক্ষ। তার মাথার উপর রয়েছে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব। পক্ষান্তরে মেয়ের নিকট জমা তিন লক্ষ টাকা। উপরন্তু তার খরচ তার স্বামীর উপর। যদি শুধু যুক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা হত তাহলে যুক্তিবাদীরা বলত নারীর উপর যেহেতু খরচের দায়িত্ব নেই তাই তার মীরাছ না পাওয়ারই কথা। কিন্তু ইসলাম না মানবরচিত ধর্ম না মানবীয় আবেগ দ্বারা প্রভাবিত; বরং এটি হল রাববুল আলামীনের প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়ত। তাই সাম্য ও ইনসাফের আইন একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। এ কথা যেমন মাখলুকের অন্য সকল হকের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি মীরাছের হকের ক্ষেত্রেও সত্য। আল্লাহ আমাদের সঠিক ইলম এবং সঠিক ঈমান নসীব করুন। আমীন।

মনে রাখুন, মুমিনের জন্য আসল বিষয় হল আল্লাহর হুকুম জানা। যখন কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম জানা হয়ে গেল তখন বিশ্বাস ও কর্মের জন্য অন্য কোনো কিছুর অপেক্ষা নেই। যদি বিধানটির রহস্য ও তাৎপর্য নিশ্চিত ও পূর্ণাঙ্গভাবে জানা না যায় কিংবা একেবারেই জানা না যায় তবুও তার বিশ্বাস ও কর্মে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না। সে তো আল্লাহর হুকুমের গোলাম, বুদ্ধি বা তাৎপর্যের গোলাম নয়।

দ্বীন ও শরীয়ত-বিদ্বেষীদের একটি শ্রেণী আছে, যারা তাদের বক্তব্য অকপটভাবে বলে থাকে এরা যদিও দ্বীনের কঠিন দুশমন, কিন্তু এদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা কম। ক্ষতির আশঙ্কা ঐ শ্রেণীর দ্বীন-বিদ্বেষীদের থেকেই বেশি, যারা নিফাক ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এদের আল্লাহর প্রতি আস্থা নেই এবং তাঁর বিধানের প্রতি বিশ্বাস নেই। কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় তা প্রকাশ করার সাহসও নেই। তাই কখনো কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বিধানকে আলেমদের ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ বলে অস্বীকার করে, কখনো নিজের পক্ষ থেকে কুরআনী বিধানের কোনো 'ব্যাখ্যা' উদ্ভাবন করে এবং বলে, যেহেতু পূর্বের অনুমিতি পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং কুরআনের বিধানও পরিবর্তিত হবে। যেন কুরআনও মানবরচিত আইনের মতো পরিবর্তন-পরিবর্ধনযোগ্য। তেমনি কখনো কুরআনের মোকাবেলায় তাদের যুক্তি ও বুদ্ধিকে পেশ করে থাকে। তারা যেন বলতে চায়, কুরআনের চেয়েও তাদের যুক্তি অগ্রগামী। তাদেরকে আমরা আল্লাহ তাআলার এই সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي أمنا يوم القيمة اعملوا ما

شئتم أنه بما تعملون بصير

যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে-যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর। তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন। (সূরা ফুসসিলাত (৪১): ৪০

একথটিও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মীরাছের কুরআনী হিস্যাসমূহকে আল্লাহ তাআলা

نصيبا مفروضا |فريضة من الله

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত হিস্যা বলেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, এগুলো আল্লাহর এঁকে দেওয়া সীমারেখা, যা লঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (সূরা নিসা (৪): ৭, ১১, ১৩ ও ১৪)

এই কথাগুলো স্মরণ করানোর পাশাপাশি আমরা তাদের হেদায়েতের জন্য দুআ করি। এছাড়া
আমাদের আর কী-ইবা করার আছে।

নারীর অধিকার আদায়ের আইন করুন

যে দেশের প্রায় ৮০% ভাগ মহিলা পৈত্রিক সম্পত্তিতে ইসলামের দেওয়া ন্যায্য হিস্যাটুকুও পায় না, সেখানে পুরুষের সমান দেওয়ার আইন করাটা আসলে বঞ্চিতদের সাথে প্রহসনমাত্র। অর্ধেক নিয়ে গেলেই বোনের জন্য ভাইয়ের বাড়ি, বোনের সন্তানদের জন্য মামার বাড়ি বেড়ানো বন্ধের হুমকি আসে। সেখানে যদি সমান অংশ নিয়ে যায় তাহলে বোন-ভাইয়ের মাঝে আত্মীয়তা সম্পর্কই আর থাকবে না। ইসলাম নারীর অর্ধেক ভাইয়ের কাছে রেখে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করেছে। খরচের দায়িত্ব ও বোনের দেখাশোনার দায়িত্বও রেখেছে ভাইয়ের উপর। সুতরাং পুরুষের সমান দেওয়ার মধ্যে সাম্য নেই। এতে বরং নারীর প্রতি রয়েছে জুলুম।
ঠিক যেমন সমাজতন্ত্রের মুখরোচক শ্লোগানে গরীব মানুষের মনে ক্ষণিকের জন্য আশা জাগলেও তারা অচিরেই বুঝতে পেরেছিল যে, কেউ খাবে কেউ খাবে না-এর অর্থ সবাই খাবে-এমন নয়; বরং এর অর্থ হল আগে তো জনগণের মধ্যে কেউ খেত, কেউ খেত না। এখন থেকে আর তাদের কেউ খাবে না।

আজ যাদের মধ্যে আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় নেই তারা তো নারীকে পৈত্রিক অংশ থেকে নানাভাবে বঞ্চিত করে থাকে। আর যাদের মধ্যে ভয় রয়েছে তাদের কেউ কেউ অংশ দিয়ে দেয়। কিন্তু বাড়ি-ভিটার অংশ তারাও প্রায় দেয় না। আর কিছু সংখ্যক লোক এখন মীরাছ রাখেই না। মৃত্যুর পূর্বে ছেলেমেয়ের মাঝে নিজের ইচ্ছামতো বণ্টন করে যায়। যেন মীরাছ বণ্টনে কন্যা অধিক নিয়ে না যায় বা বাড়ির ভিটা কন্যার দখলে না যায়। সুতরাং নারীর জন্য কুরআন যে অংশ রেখেছে তার প্রাপ্যতাকেই নিশ্চিত করা জরুরি। আল্লাহ তাআলা বুঝ দান করুন। আমীন।

মীরাছে নারীর হিস্যা শরীয়তের হুকুম ও সমাজের প্রচলন

অনেক মুসলমান সম্পদের মোহে পড়ে শরীয়তের হুকুম মোতাবেক মীরাছ বণ্টন করে না। তারা যদি অন্যায় ও গুনাহর কাজ মনে করেও তা করে তাহলে তা একটি ফাসেকি ও মারাত্মক গুনাহ। আর-আল্লাহ না করুন-যদি কুরআনী বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্বীকারের কারণে হয় তাহলে তো পরিষ্কার কুফরি। মীরাছের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করার একটি ঘৃণ্য দিক হচ্ছে নারীদেরকে তাদের হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা। অনেক জায়গায় অনেক ধরনের প্রথা ও কুসংস্কার আছে, যেগুলোর মাধ্যমে নারীদেরকে তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেমন:বিধবাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। কোনো কোনো জায়গায় এ রসম আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এজন্য ঐ অসহায় নারীরা দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত থাকে। আর জীবনভর বৈধব্যের চিতায় জ্বলতে থাকে এরপর স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তো আছেই।

কোনো কোনো অঞ্চলে এই প্রচলন আছে যে, স্ত্রী স্বামীর বংশের না হলে তাকে স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এটিও চরম মূর্খতা ও অবিচার। কুরআন মজীদে স্ত্রীর অংশ সুনির্ধারিত। বিধবা চাই স্বামীর বংশের হোক বা অন্য বংশের, দ্বিতীয় বিবাহ করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তার নির্ধারিত অংশ তাকে দিতেই হবে।বোনের হিস্যা না দেওয়া।

এই অপরাধ তো অনেক 'দ্বীনদার' ও 'শিক্ষিত' পরিবারেও পাওয়া যায়। তারা বোনদের কাছ থেকে মীরাছের হিস্যা মাফ করিয়ে নেয়। মনে রাখতে হবে, বোনদের কাছে মাফ চেয়ে দায়মুক্ত হওয়া যাবে না। কারণ জাহেলী প্রথা ও রেওয়াজের কারণে মেয়েরা নিজেরাও সম্পদ চাওয়াকে দোষের মনে করে, উপরন্তু ভায়েরা অসন্তুষ্ট হবে, সমাজের লোকে নিন্দা করবে এসবের ভয় করে। এই জাহেলী প্রথা শুধু তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতই করেনি, তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহর ওয়াস্তে এই অবলা নারীদের বুকচেরা 'হাহাকার' কে ভয় করুন। এর একটি স্ফুলিঙ্গ আপনার সাজানো বাগানকে ছারখার করে দিতে পারে। হাদীস শরীফে আছে,

মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করো। আল্লাহ তাআলা ও মাজলুমের ফরিয়াদের মাঝে কোনো আড়াল থাকে না (অতি দ্রুত তা কবুল হয়ে যায়।)

আর দুনিয়ার আযাব থেকে বেঁচে গেলেও আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে তো বাঁচার কোনোই উপায় নেই। যে আযাব সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

والعذاب الآخرة أكبر

আর নিঃসন্দেহে আখিরাতের আযাবই হল সবচেয়ে বড়।

মোটকথা, তারা যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাফ করে না তাই তারা মাফ করে দিলেও শরীয়তে তা গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু এই মাফ করা ও মাফ চাওয়া দু'টোই গুনাহর কাজ। কারণ এর দ্বারা হিন্দুদের একটি কুপ্রথা এবং শরীয়তবিরোধী ভ্রান্ত প্রচলনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়, যা একটি কবীরা গুনাহ।

বর্তমান সময়ে এটা অপরিহার্য যে, বোন দাবি না করলেও ভাই তাদেরকে তাদের অংশ বুঝিয়ে দিবে। এটা ফরয। এ বিষয়ে কোনোরূপ অবহেলা করা যাবে না। আর ভাই যদি অবহেলা করে তাহলে বোনের কর্তব্য, নিজের হক দাবি করা। এ বিষয়ে কারো নিন্দা-সমালোচনার পরোয়া করবে না এবং এই ভেবে নিজের হিস্যা দাবি করা থেকে বিরত থাকবে না যে, আমি তো স্বচ্ছল। এই হিস্যার আমার প্রয়োজন নেই; বরং প্রয়োজন না থাকলেও নিজের হক উসূল করবে। যেন এই কুরসম বিলুপ্ত হয় এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেউ কেউ বলে, বিভিন্ন উপলক্ষে ভাইরা বোনদেরকে যে উপহার ইত্যাদি দিয়ে থাকে তার বিপরীতে বোনেরা তাদের মীরাছের অংশ ভাইদের দেয়। এই ধারণাও ভুল। কারণ এই লেনদেনে কি বোনদের সম্মতি নেওয়া হয়েছে, না তা একতরফা ঘোষণা? দ্বিতীয়ত রেওয়াজের কারণে তাদের তো কিছু বলারও উপায় নেই। সুতরাং এই সম্মতি গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত 'বিভিন্ন সময় দেওয়া উপহার ইত্যাদি' কিছু অনির্দিষ্ট বস্তু, যার পরিমাণ, মূল্য সবই অনির্দিষ্ট ও অজানা। তাহলে এটি মীরাছের বিনিময় কীভাবে হতে পারে?

চতুর্থ কথা এই যে, এই উপহার আদান-প্রদান তো হয়ে থাকে আত্মীয়তা সম্পর্কের দাবিতে, যা বোনদের একটি আলাদা হক। মীরাছের সাথে এ কোনোই সম্পর্ক নেই। যারা বোনদেরকে উপরোক্ত অজুহাতে বঞ্চিত করে তারা প্রকৃতপক্ষে মীরাছের হক ও আত্মীয়তার হক কোনোটাই আদায় করে না। আর যেখানে এই প্রচলন আছে যে, বোন নিজের হিস্যা দাবি করলে এবং তাকে হিস্যা দেওয়া হলে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় এটা তো এত বড় মূর্খতা ও জাহালত, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে রাখতে হবে, যারা এমন কাজ করে তারা অভিশপ্ত, তাদের দুনিয়া ও আখিরাত দু'টোই বরবাদ।

মোটকথা, হারামকে হালাল করার জন্য এবং অবলা বোনদের মীরাছের হিস্যা আত্মসাৎ করার জন্য যত ফন্দি-ফিকিরই করা হোক না কেন শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সব প্রত্যাখ্যাত।

অনেক পরিবারে দেখা যায়, বোনেরা যদি মীরাছের অংশ দাবি করে তখন ভাইয়েরা বলে, তোমাদের বিয়ের সময় আববা যে আসবাবপত্র তোমাদেরকে দিয়েছিলেন ঐগুলোর দ্বারা তোমাদের মীরাছের হক উসুল হয়ে গেছে। মনে রাখবেন, এই বাহানা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ জীবদ্দশায় পিতা তার সন্তানদেরকে যা কিছু দিয়ে থাকেন তা হাদিয়া বা উপহার হিসেবে গণ্য। মীরাছের হিস্যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ হেফাযত করুন, বোন যদি মীরাছের হিস্যা চায় তখন কোনো কোনো ভাই বলে আচ্ছা। তুমি কি ভাই চাও না মীরাছ? যদি মীরাছ চাও তাহলে ভাইকে ত্যাগ করতে হবে। আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আর যদি ভাই চাও তাহলে মীরাছের দাবি ত্যাগ কর।' এভাবে কোনো হিস্যা 'হালাল' হবে না। সম্পূর্ণ হারাম থাকবে।

[আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড: ১ থেকে কিছু সংযোজনসহ গৃহীত।]

শরীয়তের মীরাসনীতি অনুসরণ না করার বহুমুখি কুফল

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ দ্বীন। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের রক্ষাকবচ এটি। বৈধ পন্থায় অর্জিত ব্যক্তি-মালিকানাকে স্বীকার করে ইসলাম। আবার মালিকানাধীন সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা। নিজ প্রয়োজনে খরচের পাশাপাশি পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্য আর কাকে কখন কী পরিমাণ সম্পদ দেওয়া দরকার তার নির্দেশনাও রয়েছে শরীয়তে। আর সম্পদ রেখে মারা গেলে কারা কী পরিমাণ হিস্সা পাবে তাও শরীয়ত বলে দিয়েছে। আবার কেউ তার সম্ভাব্য ওয়ারিসদেরকে নিজ হাতে কোনো সম্পদ দিতে চাইলে তার সহীহ নীতিমালাও শরীয়ত বাতলে দিয়েছে। এসব নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেই একটি পরিবার ও সমাজ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, বর্তমানে কিছু কিছু মুসলিম কর্তৃক ঐসব মূল্যবান নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণ না করার কারণে সেসব পরিবার ও সমাজ হয়ে উঠে বিশৃংখল ও অশান্তিপূর্ণ। শুধু তাই নয় বরং সম্পদের মালিক নিজ জীবদ্দশাতেই বিপাকে পড়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। সম্প্রতি এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা সামনে আসায় এ বিষয়ে কলম ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

ঘটনা এক: হাজ্বী আবুল কাসেম (ছদ্মনাম)। একজন বিত্তবান মানুষ। বেশ কয়েকটি বাড়ি-মার্কেট, ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকার মালিক। তার ছিল এক ছেলে, দুই মেয়ে। জীবনের শুরুতে তিনি তার সহায়-সম্পদ ছেলের নামে লিখে দেন। অর্থাৎ ছেলেকে দিয়ে দেন। তিনি মৃত্যুবরণ করার পর সম্পদের বণ্টন শরীয়তের দৃষ্টিতে কীভাবে হবে তার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই এ কাজটি করেন। স্ত্রী, মেয়েসহ অন্য কাউকে কিছু লিখে দেননি। কিছুদিন পর যুবক বয়সে অবিবাহিত ছেলের মৃত্যু হয়। তার পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায়। এরপর স্ত্রীসহ তার থাকে দুই মেয়ে। তিনি দুই মেয়ের নামে তার সমুদয় সম্পত্তি লিখে দেন। এখানেও তিনি তার মৃত্যুর পর সম্ভাব্য অন্যসব ওয়ারিসকে বঞ্চিত করে শুধু মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেন। হয়ত তার মনের মধ্যে আশংকা ছিল যে তিনি মারা গেলে মেয়েরা তার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পেলেও কিছু সম্পদের ওয়ারিস হয়ে যেতে পারে তার ভাইয়েরা। তিনি এটা রুখতে চেয়েছেন বলেই মেয়েদের নামে সব সম্পদ লিখে দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন ভাইদের বড়। এর কিছুদিন পর তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার চিকিৎসার জন্য টাকা-পয়সার টান পড়ে যায়। মেয়েদেরকে দেয়া সম্পদ তো এখন আর তার হাতে নেই।

তিনি নিজের চিকিৎসা চালাতে পারেন না। মেয়েরাও পিতার চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা পিতার দেয়া অর্থ থেকে কোনোরকম সহযোগিতা পিতাকে করতে সম্মত হয় না। এমনকি পিতার চরম অসুস্থতাকালে ন্যূনতম ভদ্রতা ও সৌজন্যমূলক খোঁজখবরও তারা রাখতে অস্বীকার করে। ফলে সেই বৃদ্ধ হাজ্বী সাহেবকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা করানোর দায়িত্ব নেন তার ছোট ভাইয়েরাই। যাদেরকে তিনি ওয়ারিস হিসেবে বঞ্চিত করার জন্য মেয়েদের নামে সমুদয় সম্পদ লিখে দিয়েছেন। ভাইয়েরাই তাকে বারবার দেশ-বিদেশের হাসপাতালে ভর্তি করছেন এবং খোঁজখবর নিচ্ছেন। এখনও তিনি জীবিত আছেন। চিকিৎসা চলছে। কিন্তু অর্থকড়ির টানাটানির মধ্যে তার দিন কাটছে।

ঘটনা দুই: বুশরা খাতুন (ছদ্মনাম)। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। কর্মজীবী নারী। মধ্যবিত্তের জীবন। আয়ের কিছু অংশ তাকে প্রায় প্রতিমাসেই বাবার কাছে পাঠাতে হয়। বাড়িতে বাবা-মা থাকেন ছেলের সঙ্গে। কিন্তু পিতা-মাতার দরকারি খরচ ছেলে তাদের দেন না। এদিকে বাবা তার স্থাবর সম্পত্তির প্রায় সবটুকুই কিছুদিন আগে ছেলেসন্তানের নামে লিখে দিয়েছেন। তার ইচ্ছা, মৃত্যুর পর ছেলেই যেন তার সমুদয় সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। কারণ, তার ধারণা ছিল, জীবনের শেষ পর্যায়ে ছেলের সেবা ও সাহায্যেই তার জীবন চলবে। তাই মেয়েসন্তানদের বঞ্চিত করেই তিনি সহায়-সম্পদের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন ছেলেকে। এখন সেই ছেলেই তার পেছনে অর্থ খরচ করতে রাজি নয়। ছোটখাটো প্রয়োজন, চিকিৎসা-পথ্য, কোনো দরকারি জিনিসপত্রের জোগান কিংবা নগদ টাকার জন্য পিতাকে এখন কন্যা সন্তানেরই দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। মীরাস থেকে বঞ্চিত মেয়েই নিজের সঞ্চয় ও উপার্জন থেকে প্রতি মাসে পিতাকে টাকা পাঠাচ্ছেন। গ্রামে বসে পিতা মাস শেষে সেই টাকা হাতে পেয়েই প্রয়োজন পুরা করছেন।

ঘটনা তিন: প্রৌঢ় গিয়াসুদ্দীন (ছদ্মনাম)। ঢাকায় থাকেন। ঢাকায় বাড়ির মালিক। পরিণত বয়সে স্ত্রীর নামে নিজের বাড়িটি লিখে দিয়েছেন। স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালোবাসার কারণে অন্য ওয়ারিসদের (সন্তানদের) না দিয়ে স্ত্রীকে বাড়িটি লিখে দিয়েছেন। তার মেয়ের

বিয়ে হয়েছে। ছেলে ডাক্তারি পড়াশোনা শেষ করেছে। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে গেছে উল্টো ঘটনা। স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী তালাক দিয়েছে বলে দাবি করে বিচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বামী বেচারা পেরেশান। সে তার যুবক ছেলেকে স্বাক্ষী হিসেবে এনে হাজির করে বলছে, তালাক হওয়ার মতো কিছুই তিনি বলেননি এবং করেনওনি। তার স্ত্রীর নাকি মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই লোকের ছেলেও একই রকম কথা বলছে। অর্থাৎ যে স্ত্রীর নামে তিনি বাড়ি লিখে দিয়েছেন, সেই স্ত্রীই এবার তার সংসার ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যোগ নিয়েছেন।ঘটনা চার: পশ্চিমা সমাজে বাস করেন এক বাংলাদেশী মুসলিম দম্পতি। সেখানে দম্পতির স্ত্রীর বিচরণ অত্যন্ত অবাধ। তার দিনরাত, চলাফেরা ও বন্ধু-বান্ধবের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনো জবাবদিহিতা ও কৈফিয়ত নেওয়ারও সুযোগ নেই। স্বামী বেচারা যে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন সেই উপায়ও নেই। কারণ ওই দেশের আইন হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে ডিভোর্স দিলে তার সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক আইন।

শোনা গেছে, কোনো কোনো পরিবারে এখন উল্টো ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। সেখানে কোনো ছুতো কিংবা ছিদ্র ধরেই স্ত্রীর উদ্যোগে ডিভোর্সের মামলা করা হচ্ছে। এবং এভাবেই সংসার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সংসার ভাঙ্গার ফল হিসেবে ডিভোর্সপ্রাপ্ত স্ত্রী একসঙ্গে স্বামীর অর্জিত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়ে যাচ্ছে। পরে সে স্বাধীন জীবন যাপন করছে। অথবা অন্য কোনো পছন্দের মানুষের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধছে।

। দুই।

এখানে চারটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। এগুলো সবই ইফরাত-তাফরীত কিংবা শরীয়তের মীরাসনীতি অনুসরণের পরিবর্তে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির পন্থা অনুসরণের উদাহরণ। আর এ কারণেই বিভিন্ন বিশৃংখলা ও বিপর্যয়ের পথ তৈরি হয়েছে। মীরাসের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক জোরালো ও দৃঢ়। অনেক বিশ্লেষিত ও সুষম। কুরআনে কারীমে কোনো বিধিষ বিধানের আলোচনা এলে সাধারণত দেখা যায়, সেখানে কিছু জরুরি মূলনীতির উল্লেখ থাকে। তাফসীল বা বিশ্লেষণ থাকে না। কিন্তু ফারায়েযের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি অন্যরকম। সেখানে শুধু ফারায়েযের মূলনীতি কিংবা ইজমালী মাসআলা উল্লেখ করে সমাপ্ত করা হয়নি, বরং খুঁটিনাটি প্রতিটি

প্রসঙ্গসহ অত্যন্ত বিশ্লেষণের সঙ্গে ফারায়েযের মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, এর পেছনে কী হেকমত রয়েছে? এর উত্তরে যে কথাটি বলা যায় তা হচ্ছে, একটি পরিবারে সাধারণত যেসকল বিষয়ে দ্বন্দ-কলহ সৃষ্টি হয় অনেক ক্ষেত্রেই তার মূলে থাকে ধন-সম্পদ; পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানদেরকে সম্পদ প্রদানে বৈষম্য অথবা উত্তরাধিকার বণ্টনে অনিয়ম। এগুলো ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই মীরাসের আলোচনায় বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকগুলো আয়াত বর্ণিত হয়েছে। অন্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এমনটি দেখা যায় না।

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় মীরাসের বিধি-বিধানের আয়াতগুলো বর্ণনার মাঝখানে একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اباوكم و أبناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهم اقرب لكم نفعًا فريضة من الله

তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের জন্য কে বেশি উপকারী তা তোমরা অবগত নও। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।-সূরা নিসা (৪): ১১

সম্পদ থাকলে মানুষ চিন্তা করে, কে তার উপকারে বেশি আসবে? কখনো ভাবে, ছেলে। কখনো ভাবে, মেয়ে। কখনো ভাবে, তার স্ত্রী তার বেশি উপকার করবে। কখনো অন্য কারো ব্যাপারে চিন্তা করে। পরবর্তীতে এই চিন্তার ভিত্তিতেই সে তার সম্পদ বণ্টন করার চেষ্টা করে। তার এসব চিন্তাই মূলত মীরাসনীতির বিপরীত। আল্লাহ তাআলা এসব চিন্তা রদ করেছেন এই আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কে উপকারে আসবে সেটা তুমি জানো না। তুমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নও। মীরাস ওই দৃষ্টিকোণ থেকে ধার্য হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁর হেকমত ও প্রজ্ঞা দিয়ে এক্ষেত্রে যেভাবে উপযোগী মনে করেছেন সেভাবে সম্পদ স্থানান্তরের বিধান দান করেছেন। কে কার কতটুকু উপকারে আসবে- এই চিন্তার উপরে মীরাসের ভিত্তি রাখা হয়নি। মূলত এই আয়াতের মর্মের প্রতি যদি সব মুসলমান মনোযোগ দিতেন তাহলে মীরাসের ক্ষেত্রে নিজেদের তৈরি করা প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি থেকে অনেকেই বেঁচে যেতেন।

মীরাসের ক্ষেত্রে যেসকল শরীয়ত বিরোধী প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ি করা হয় তার ইহকালীন ফলাফলও ভালো হয় না। এসব প্রান্তিকতা নানা ধরনের বিপর্যয় ও বিশৃংখলা নিয়ে আসে। উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকেও আমরা কিছু উপলব্ধি করেছি। বলে রাখা ভালো, উপরের ঘটনার সবক'টিই বাস্তব। প্রত্যক্ষভাবে এসব ঘটনা জানা ও শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখানে শুধু ঘটনার সম্পৃক্ত আসল নাম বদলে দিয়ে ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে তাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে। ঘটনাগুলো আবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

প্রথম ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে মীরাসের মূলনীতি রক্ষা করা হয়নি। বারবার সে নীতি ভঙ্গ করা হয়েছে। প্রথমে মেয়েদেরকে না দিয়ে একমাত্র ছেলেকে সম্পদ লিখে দেওয়া হয়েছিল। আকস্মিকভাবে ছেলে মারা যাওয়ার পর সব সম্পদ লিখে দেওয়া হয় দুই মেয়েকে। তার নিজের বাড়ি, ব্যবসা, কোটি কোটি টাকার আরো কয়েকটি বাড়ি, মার্কেট-দোকান সব মেয়েদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। যিনি এটি করেছেন তিনি করেছেন এই কারণে যে, মেয়েরা যেন তার মৃত্যুর পর তার সব সম্পদ পেয়ে যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে মেয়েদের পাওয়ার কথা ছিল তিনের দুই ভাগ। অপরদিকে তার সম্পদের কিছু অংশের মধ্যে তার ভাইদেরও হক সৃষ্টি হতো। কিন্তু তিনি হয়ত চাননি তার সম্পদ থেকে ভাইয়েরা সামান্য কিছুও পাক। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সব সম্পদ দুই মেয়েকে লিখে দিয়েছেন। অথচ কিসমতের ব্যাপারহলো, যাদেরকে তিনি কোনো সম্পদ দিতে চাননি সেই ভাইয়েরাই তার অসহায়ত্বের মুহূর্তে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে এখন তিনি অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে। তারপেছনে চিকিৎসাসহ বিভিন্ন খরচের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মেয়েদের কোনো খবর নেই। তারা কোনো খরচও দিচ্ছে না, দেখতেও যাচ্ছে না। ভাইয়েরাই তাকে উল্টো সহযোগিতা করছে এ দুঃসময়ে। তার বর্ণনামতে, একবার তিনি লন্ডনে এক মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলেন।

মেয়ে বা মেয়ে-জামাই তাকে রিসিভ করার জন্য বিমানবন্দরেও আসেনি। তিনি কিছুই চিনতেন না সেখানকার। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে মেয়ে এসে তাকে বাসায় নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে কয়দিন সেখানে ছিলেন খাবার-দাবারসহ নানারকম কষ্টে তার দিন পার হয়েছে।

একদা বিত্তবান এই বৃদ্ধ তার সব সম্পদ মেয়েদের নামে লিখে দিয়ে এখন পুরোপুরি অভাবী জীবন যাপন করছেন। এ লেখা যখন ছাপার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন খবর এসেছে, ভদ্রলোক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার মাগফিরাত করুন।

দ্বিতীয় ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাবা তার সহায়-সম্পদ ছেলের নামে লিখে দিয়েছেন। মেয়েকে কিছুই দেননি। অথচ এখন সেই বাবার নানা রকম আর্থিক প্রয়োজনে তিনি নির্ভর করছেন মেয়ের উপরে। মেয়েকে ফোন করছেন। মেয়ে টাকা পাঠাচ্ছে তাকে। যেই ছেলের নামে সহায়-সম্পদ লিখে দিয়েছেন সে তার কোনো প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসছে না। সমাজে এর উল্টোটাও কেউ কেউ করছেন। ছেলেকে না দিয়ে মেয়েকে লিখে দিচ্ছেন সবকিছু। উদ্দেশ্য একই। তার ধারণা, মেয়ে তার খোঁজ-খবর বেশি রাখবে। ছেলের উপর তিনি আস্থা রাখতে পারেননি। আসলে এর উভয়টিই প্রান্তিকতা।

তৃতীয় ঘটনার দিকে যদি আমরা নজর দিই তাহলে দেখব, চাকুরীজীবী স্বামী তার স্ত্রীর নামে একমাত্র বাড়িটি লিখে দিয়েছেন। অথচ তার সন্তান রয়েছে। আরো ওয়ারিস রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালোবাসা ও নির্ভরতার কারণে অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে প্ররোচিত করার কারণে কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর অধিক নিরাপত্তা চিন্তার কারণে তিনি স্ত্রীর নামে বাড়ি লিখে দিয়েছেন। মূলত এভাবেই তিনি মীরাসের নীতি লংঘন করেছেন। অথচ এখন সেই স্ত্রী-ই তাকে ছেড়ে যাওয়ার নানা বাহানা ও উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন স্বামী বেচারা অস্থির। শুধু তালাক ফেরানোই তো তার লক্ষ্য নয়। এখন তিনি দেখছেন স্ত্রীর দাবিকৃত তালাক কার্যকর হলে তিনি এবং তার সন্তানরা বাড়িহারা হয়ে যাবেন। এখন দুশ্চিন্তার বোঝা অনেক বড়। এ সবকিছুই তো শরীয়তের মীরাসনীতি লংঘন করার ফল।

চতুর্থ ঘটনা। পশ্চিমা আইনে ডিভোর্সের ফলে স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এ আইন নিঃসন্দেহে ইসলামের সম্পদ বণ্টন ও মালিকানা নীতির পরিপন্থী। কিন্তু তারা এই আইনটি এই লক্ষ্য নিয়েই করেছিল যে, তাদের এ আইনের ফলে দাম্পত্য জীবন মজবুত হবে। স্বামীরা স্ত্রীদের তালাক দেবে না। কিন্তু সময় তাদের এই

চিন্তাকে উল্টো করে দিয়েছে। এ আইন করে তালাকের হার সেখানে কমানো যায়নি। এ আইনের ফলে তালাকের হার বরং বেড়ে চলেছে। এখন তালাকের ঘটনা ঘটাচ্ছে নারীরা উদ্যোগী হয়ে। তারা পারিবারিক আদালতে মামলা ঠুকছে। এর বিষময় ফল সেখানকার মুসলিম পরিবারগুলোতেও পড়ছে। পর্দা না থাকা, খোলামেলা চলাফেরা ইত্যাদি নীতিবিচ্যুত আচরণে যখনই কোনো বাধা আসছে, নারীরা মনে চাইলেই পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে স্বামীকে ডিভোর্স দিচ্ছে। আর ডিভোর্স কার্যকর হলেই স্বামীর কষ্টার্জিত যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক ভাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। কখনো অন্য কোনো পুরুষের ঘরে গিয়ে উঠছে। কখনো স্বামী-সংসারহীন স্বাধীন জীবন-যাপনের পথ বেছে নিচ্ছে। তার তো এখন আর আর্থিক চিন্তা নেই। এক ডিভোর্সেই কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবে এক ভিন্ন রকম স্বেচ্ছাচারিতার জগৎ তৈরি হচ্ছে অনেক নারীর জীবনে। এখানেও ইসলামের সম্পদ বণ্টননীতির প্রতি উপেক্ষা বিপর্যয়ের পথ তৈরি করেছে।

গত বছরের ঘটনা। বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনীর স্ত্রীর বিচ্ছেদের মামলার খবর গণমাধ্যমে এসেছে। বিচ্ছেদের দাবিতে স্ত্রীর ঠুকে দেওয়া মামলা দীর্ঘদিন চলছিল। বিলিয়নার স্বামী বহু চেষ্টা করেছে বিচ্ছেদ ঠেকাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়ে বিচ্ছেদ হয়েছে। আর অনিবার্যভাবেই সেই বিলিয়নারের অর্ধেক সম্পদের মালিকানা পেয়ে গেছে ডিভোর্সী স্ত্রী। হাজার হাজার কোটি ডলারের মালিক হয়েও বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্বামীর তখন কিছুই করার ছিলো না। এ কয়েকটি উদাহরণ আমাদের সামনে। এ ধরনের আরো অসংখ্য ঘটনা বর্তমানে ঘটে চলেছে। এতে প্রমাণিত হলো, আল্লাহপ্রদত্ত বিধি-বিধানের পরিবর্তে অন্য কোনো নীতি অনুসরণ করলে সুফল আসে না। আরো প্রমাণিত হলো, আল্লাহর বিধান লংঘন করে মানুষের বিবেচনা সামনে নিয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করলেও তার ফল কল্যাণকর হয় না। সুতরাং সম্পদ বণ্টন ও উত্তরাধিকার নীতির ক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান মেনে চলাই মানবজাতির জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ বয়ে আনবে।

। তিন।

নিজের সম্পদে মনগড়া বণ্টন করে মানুষ নানা রকম ক্ষতির সম্মুখীন হয় এটা আমরা দেখলাম। মূলত এ ধরনের মনগড়া শরীয়তবিরোধী সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধানত কয়েক ধরনের মানসিকতা কাজ করে থাকে। কেউ কেউ সম্পদ আটকে রাখতে চায়। যাকাত দিতে চায় না। গরিবের হক দিতে চায় না। অন্য কেউ তার সম্পদের ভাগ পেয়ে যাক এটাও কামনা করে না। এটা চরম বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন-وفي أقوالهم حق السائل و المحروم

এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।-সূরা যারিয়াত (৫১): ১৯
সুতরাং কাউকে কোনো সম্পদ না দেওয়ার ইচ্ছা- এটা ইসলামসম্মত মানসিকতা নয়। এটা পরিত্যাজ্য।

নিজের সম্পদে মনগড়া বণ্টনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মানসিকতাটি হচ্ছে, এর উল্টো। পুরো সম্পদ সে কোনো আত্মীয়, স্ত্রী অথবা ছেলে অথবা মেয়ে এমন কাউকে দিয়ে দিতে চাওয়া। আর এভাবে অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে চায়। এটাও শরীয়তসম্মত মানসিকতা নয়। এর কয়েকটি উদাহরণই আমরা লেখার শুরুতে পেয়েছি। এ বিষয়ে এখানে আর দীর্ঘ আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়।

তৃতীয় আরেকটি মানসিকতা হলো, সব সম্পদ ওয়ারিসদের কাউকে না দিয়ে অন্য কোথাও দান করে দেওয়া। অনেকেই বৃদ্ধ বয়সে এসে যখন দেখেন মৃত্যু খুব কাছাকাছি তখন মনে করেন সন্তানের জন্য সম্পদ রেখে কী লাভ? ফলে পুরা সম্পদ দান করে দেন। এটাও শরীয়তের ভারসাম্যপূর্ণ উত্তরাধিকার ও বণ্টননীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। দেখুন, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কারুনকে মূসা আ. নসীহত করে বলেছেন-

ولا تلس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْك

এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।-(সূরা কাসাস (২৮): ৭৭)

অর্থাৎ তোমার দুনিয়ায় চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তুমি হাতে রাখ। বাকিটুকু দান কর। আবেগ নিয়ে পুরো সম্পদ দিয়ে দেওয়া, নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য কোনো সম্পদ না রাখা- এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن عامر بن سعد عن أبيه قال :جاء رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، زَمَنَ حجة الوداع، فقلت :بلغ بي ما ترى وأنا أو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال :لا قلت بالقطري قال :لا .قلت :الثلث؟ قال :الثلث كثير أن ندع ورثتك أغنياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْرَهُمْ عَالَةً

يتكلفون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجزت عليها، حتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي ابْرَاتِكَ

হযরত আমের ইবনে সাদ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিদায় হজ্বের সময় আমার এক কঠিন পীড়ায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বললাম, আমার মুমূর্ষ অবস্থা তো আপনি দেখছেন, এদিকে আমার অনেক সম্পদ আছে। আর আমার একমাত্র ওয়ারিস আমার মেয়েই। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ (গরীবদেরকে) সদকা করে দেবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? নবীজী বললেন, না। এক তৃতীয়াংশ? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশও অনেক। নিশ্চয়ই তুমি যদি তোমার ওয়ারিসদেরকে স্বচ্ছল রেখে যাও তাহলে সেটা উত্তম হবে তাদেরকে এমন দরিদ্র রেখে যাওয়ার চেয়ে যে, তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্যেশ্যে যা ব্যয় করবে তার উত্তম প্রতিদান পাবে। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া লোকমার বিনিময়েও।-সহীহ বুখারী, হাদীস ১২০

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, এক তৃতীয়াংশ দান করার বিষয়টিকেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ দান করলে এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম করা যেতে পারে। এখান থেকে ফকীহগণ বলেন, অসিয়ত সমুদয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশের কিছু কম হতে হবে। এ হাদীসের শেষাংশে একটি বাক্য

রয়েছে যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তুমি যদি তোমার ওয়ারিসদেরকে স্বচ্ছল রেখে যাও তাহলে সেটা উত্তম হবে তাদেরকে এমন দরিদ্র রেখে যাওয়ার চেয়ে যে, তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে।' এ বাক্যের মর্মার্থ হল, উত্তরাধিকারীদেরকে রিক্তহস্ত রেখে, পুরোপুরি বঞ্চিত রেখে সব সম্পদ দান করে দেওয়া উত্তম নয়, উচিত নয়। এ হাদীস থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে, ইসলামে বৈরাগ্য নেই। ধন-সম্পদ সব দান করে দিলাম- এটা ঠিক নয়। এই হাদীসের ব্যাখ্যা অন্য বহু হাদীসেও পাওয়া যায়। নিজের পরিবারের জন্য খরচ করাকেও হাদীস শরীফে সদাকা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এধরনের অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, حتى ال تجعلها في في اترانكى

এমনকি সেই খাবারের লোকমা যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিচ্ছ (সেটিও সদাকা)- সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬২৮

এই হাদীসে আরেকটি দিকে ইশারা রয়েছে। সব সহায়-সম্পদ যে কেবল পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে যেতে হবে এমনও নয়। বরং কিছু সম্পদ দ্বীনের পথে অথবা আর্তপীড়িত মানুষদের জন্য অসিয়্যত কিংবা ওয়াক্ত করে যাবে। ইনসাফপূর্ণ শোষণমুক্ত মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে একসময় ওয়াকফ ও অসিয়্যত বড় ভূমিকা রেখেছে। সঠিক দ্বীনী চিন্তা-চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এখন ব্যাপকভাবে ওয়াক্ত ও অসিয়্যতের ধারা সেভাবে রক্ষিত হয় না। অথচ শোষণমুক্ত ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার জন্য শুধু যাকাত নয়, ওয়াক্ত ও অসিয়াতের ভূমিকাও অনেক বড়।মানুষ নিজের সম্পদের বণ্টনে শরীয়তের বিপরীত চতুর্থ আরেকটি উল্টো নীতি গ্রহণ করে থাকে। সেটি হচ্ছে, কোনো সন্তানকে বেশি সম্পদ দান করে অন্য সন্তানকে সে পরিমাণ দান না করা। হাদীসের বর্ণনায় এটাকেও নিষেধ করা হয়েছে। হযরত নোমান ইবনে বাশীর রা.-এর এ বিষয়ক হাদীসটি বিখ্যাত।

،حدَّثَنِي النَّعْمَان بن بشير، أن أمة بالشرواحة سألت أباء بعض المؤمنة من مالهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَهُ ثُمَّ بَدَا له فقالت :لا أرضى على تشهد رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى ما وهبت بابُنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله إن أم عذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك عَلَى الَّذِي وَهَبْتُت :لانتهاء فقالى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا نَشِيرُ أَلَكَ وَلَدْ سَوَى هَذَا؟ قَالَ :نعم فقال أكلهُمْ وَعَبْتَ لَهُ مِثْل هذا ؟ قال :لا، قال :فلا تشهدني إذا، فَإِنّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

নোমান ইবনে বশীর রা. বর্ণনা করেন, তার মা নিজ সন্তানের জন্য তার বাবার কাছে কিছু সম্পদের আবেদন করলেন। এ নিয়ে এক বছর পর্যন্ত তার বাবা দ্বিধাদন্দে থাকেন। তারপর দেয়ার বিষয়ে সম্মত হলেন। তখন তার মা বললো, আমার সন্তানকে দেয়া সম্পদের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখতে চাই। তখন আমার বাবা আমার হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন, আমি তখন ছোট্ট বালক। বাবা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। এই ছেলের মা তাকে দেয়া সম্পদের জন্য আপনাকে সাক্ষী রাখতে চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ তখন বললেন, হে বশীর। এ ছাড়াও কি তোমার আরো সন্তান আছে? তিনি বললেন, হাঁ, নবীজী বললেন, তাদের সবাইকে কি তুমি এ পরিমাণ সম্পদ দান করেছো? তিনি বললেন, না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাকে সাক্ষী রেখো না। আমি এমন যুলুমের সাক্ষী হতে চাই না।-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২৪৩

এ হাদীস থেকে সূক্ষ্ম একটি বিষয় বুঝে আসে যে, সে যুগে নারীরাও ছিলেন ফকীহ। যে কারণে হযরত বশীরের স্ত্রী নোমান ইবনে বশীরের মা তার ছেলেকে সম্পদ দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী বানানোর শর্ত করেছিলেন। অর্থাৎ বিষয়টি উচিত কি অনুচিত- এ বিষয়ে রাসূলে কারীমের মতামত অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই হাদীস থেকেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, সন্তানদের মধ্যে দান করতে চাইলে সমতা বজায় রাখতে হবে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, দারুল ইফতাগুলোতে কিংবা আলেমদের কাছে এ বিষয়ক অসংখ্য প্রশ্ন আসে। পিতা-মাতা জীবদ্দশায় কোনো এক সন্তানকে বেশি সম্পদ দিয়ে গেছেন। এসব পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অন্য সন্তানরা প্রশ্ন নিয়ে আসে যে, পিতা-মাতা এটা (এক সন্তানকে বেশি দেওয়া) ঠিক করেছেন কি না? এখন তাদের গুনাহ হবে কি না? অন্য সন্তানদের মনের মধ্যে এক ধরনের অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে আমরা অসন্তুষ্ট কোনো কোনো সন্তানকে নসীহত করি, পরামর্শ দিয়ে থাকি- মরহুম পিতা-মাতার জন্য দুআ করুন। মনে কষ্ট রেখে কী ফায়েদা। অবশ্য কোনো কোনো সন্ধান মাসআলা জিজ্ঞাসা করার পর নিজ থেকেই বলে, 'মাফ করে দিলাম'। আবার এমনও হয়েছে, যে সন্তানকে বেশি দান করা হয়েছে, সে এসে জানতে চেয়েছে। অতিরিক্তটুকু অন্য ভাই-বোনদের মাঝে বণ্টন করে দিলে কোনো সমস্যা নেই তো।

আসলে বিনা ওযরে এভাবে কোনো সন্তানকে কম দেওয়া, কোনো সন্তানকে বেশি দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। অথচ আবেগ এবং অজ্ঞতার কারণে কোনো কোনো পিতা-মাতা এই ভুল কাজটি করে থাকেন।

মীরাসের ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে এখানে শুধু ঐসকল ভুল-ভ্রান্তিগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যেগুলো সম্পদের মালিক নিজ জীবদ্দশায় করে থাকে। কিন্তু সম্পদ-মালিকের মৃত্যুর পর তার মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে শরয়ী হুকুম লংঘন করার প্রবণতাও বর্তমান সমাজে ব্যাপক। মেয়ে, বোন, ফুফুদের অংশ তাদের হাতে বুঝিয়ে দিতে গড়িমসি করার ঘটনা তো অনেক শোনা যায়। এ সবকিছুই সংশোধনযোগ্য।

ইসলামের মীরাসের বিধি-বিধান এবং অসিয়াত ও ওয়াক্তের বিধি-বিধান সম্পর্কে সব পর্যায়ের মুসলমানদের জ্ঞান অর্জন করা উচিত। এবং এসব বিধান ও মাসায়েলের ব্যাপক চর্চা হওয়া উচিত। যারা ইসলামের খেদমত করেন, যারা খতীব, মুবাল্লিগ, মুআল্লিমের দায়িত্ব পালন করেন- তাদের দায়িত্ব এসব বিষয়ের মাসআলা মুসলিম জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। মুসলমানদের মনে রাখার বিষয়, মীরাস, ওয়াক্ত ও অসিয়াতের বিধি-বিধান তাদের একান্তই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলমানদের ইমতিয়ায এক্সক্লুসিভ সৌন্দর্য। সারা দুনিয়ায় উত্তরাধিকার ও 'উইল' নিয়ে বহু উল্টাপাল্টা ও ভারসাম্যহীন বিধি-বিধান চালু ছিল। ইসলাম এসে এ বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম বিধান দিয়েছে। সেই বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী চর্চা করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন

আধুনিক সভ্যতার আধুনিক চিন্তা

-হযরত মাওলানা মুফতি তকী উছমানী

শুধু প্রচারের জোরে এই আশ্চর্য দর্শন মানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, মহিলারা যদি নিজেদের ঘরে স্বামী-সন্তান, পিতা-মাতা ও ভাইবোনের জন্য গৃহস্থালী কাজকর্মে নিযুক্ত থাকেন তাহলে তা অবরোধ ও অবমাননা, কিন্তু যদি পর পুরুষের জন্য খাবার পাক করেন, ঘরদোর পরিষ্কার করেন, হোটেল ও উড়োজাহাজে তাদের আপ্যায়ন করেন, দোকানপাটে মিষ্টি হাসির দ্বারা গ্রাহকের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং অফিস-আদালতে বসদের মনোরঞ্জন করেন তবে তার নাম সম্মান ও স্বাধীনতা। ইন্নালিল্লাহি...

এর সঙ্গে এই মর্মান্তিক কৌতুকও যুক্ত হয়েছে যে, অর্থোপার্জনের জন্য বাইরে দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করার পরও আধুনিক নারী ঘরের কাজকর্ম থেকে মুক্তি পায়নি। আগের মতোই তাদেরকে ঘরের সকল কাজও করতে হয়। ইউরোপ-আমেরিকায় অধিকাংশ নারীকে দৈনিক আট ঘন্টা বাইরে কাজ করার পর ঘরে এসে রান্না-বান্না, হাড়ি পাতিল ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদিও করতে হয়।

মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করার জন্য আজকাল যে যুক্তি পেশ করা হয় তা এই যে, 'জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির যুগে আমরা আমাদের অর্ধেক জনশক্তিকে কর্মহীন করে রাখতে পারি না।' এই যুক্তি এমনভাবে আওড়ানো হয়, যেন দেশের সকল পুরুষের পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়ে গিয়েছে। এরপরও কর্মক্ষেত্রে এত পদ শূন্য রয়েছে যে, অতিরিক্ত জনশক্তির প্রয়োজন।

অথচ বাস্তবতা এই যে, এমন এক দেশে এইসব যুক্তি আওড়ানো হয়, যেখানে চাকুরির খোঁজে অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত বেকারের জুতার সুখতলা অনবরত ক্ষয়ে যাচ্ছে। কোথাও একটি ক্লিনার বা ড্রাইভারের পদ খালি হলে দশটি মাস্টার্স ডিগ্রিধারী বেকারের দরখাস্ত জমা হয়ে যায়। আমাদের কর্ণধারদের কর্তব্য হবে, প্রথমে সকল বেকার যুবকের কর্মের

ব্যবস্থা করা। এই অর্ধেক জনশক্তির পূর্ণ কর্মসংস্থান আগে করুন এরপর অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।

পরিবার-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে

আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে ঘরের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, গৃহের ব্যবস্থাপনা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। যাতে পারিবারিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা অটুট থাকে। কিন্তু তারা যখন ঘর ছেড়ে বাইরে বের হলে তখন ফলাফল এই হল যে, পিতাও বাইরে, মা-ও বাইরে, সন্তানরা স্কুলে। অতএব ঘরে তালা ঝুলছে।

নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব তো এই ছিল যে, তাঁর গৃহে অবস্থানের দ্বারা একদিকে যেমন গৃহস্থালী শৃঙ্খলা অটুট থাকবে অন্যদিকে সন্তানও তার কোল থেকে স্নেহ ও মমতা এবং তালীম ও তরবিয়ত লাভ করবে। মায়ের কোলই শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। এখান থেকেই সে উত্তম আচার-আচরণের শিক্ষা গ্রহণ করে, জীবন-যাপনের উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু আজ পাশ্চাত্যের জীবন-ব্যবস্থায় সন্তান পিতা-মাতার স্নেহ ও মমতা থেকে বঞ্চিত। পরিবার-ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। স্বামী এক জায়গায় কাজ করছে, স্ত্রী অন্য জায়গায়। উভয়ের মধ্যে দিনভর কোনো যোগাযোগ নেই, অন্যদিকে দু'জনের কর্মক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, পরকীয়া ও অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালাক-ডিভোর্স পর্যন্ত পরিস্থিতি গড়াচ্ছে।

গর্বাচেভের অভিজ্ঞতা

এই কথাগুলো যদি শুধু আমি বলতাম তাহলে কেউ বলতে পারত যে, এগুলো প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীদের কথা, কিন্তু কয়েক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বই গোটা বিশ্বে পঠিত। এতে Status of woman শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে মহিলাদের সম্পর্কে। সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় তিনি লিখেছেন-

'আমাদের পশ্চিমা সমাজে আমরা নারীদেরকে ঘর থেকে বাইরে এনেছি এবং এর মাধ্যমে কিছু বৈষয়িক সুফল অর্জন করেছি। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদনের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমাদের পরিবার-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এর ফলে আমরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি, তা ওই বর্ধিত উৎপাদন থেকে অনেক অনেক বেশি। এজন্য আমি একটি আন্দোলন শুরু করেছি, যার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এই যে, যে নারীরা ঘর থেকে বের হয়েছেন, তাদেরকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে আনা। কীভাবে একে সফল করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। অন্যথায় এ অবস্থা চলতে থাকলে পরিবার-ব্যবস্থার মতো আমাদের জাতিও ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে যাবে।'

এই কথাগুলো লিখেছেন মিখাইল গর্বাচেভ, তার উপরোক্ত বইয়ে।

নারীর নিরাপত্তা আল্লাহর বিধানেই

আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাঁদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। নারীর নিরাপত্তা বিধানে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, দিয়েছেন কিছু বিধান। এই বিধান ও নির্দেশনা নারী-পুরুষের স্রষ্টার পক্ষ থেকে, যিনি জানেন তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের চাহিদা ও প্রবৃত্তি এবং তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাগুলো। সুতরাং নারীর নিরাপত্তা আল্লাহর বিধানে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কিছু ভাই-বোন ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে এবং বিজাতীয় জ্ঞান-বিদ্যা ও কালচারে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রসিদ্ধ এক জাতীয় দৈনিকের একটি শিরোনামে চোখ পড়তেই পড়া শুরু করলাম- 'নীরব থাকার সংস্কৃতি ঝেড়ে ফেলতে হবে'। এখানে কিশোরী নির্যাতনের কাগজ-কলমের যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে তা রীতিমত আঁতকে ওঠার মতো। মাত্র ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের কিশোরীরা ...নির্যাতনের শিকার। এদের হার শতকরা ৩৪.২ শতাংশ।

এ যুলুম থেকে বাঁচার জন্য লেখিকা দুটি পথ বাতলেছেন। এক. নীরব থাকা চলবে না; সোচ্চার হতে হবে। দুই. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

কিশোরীদের যুলুমের হাত থেকে বাঁচাতে লেখিকার আন্তরিকতাকে ধন্যবাদ। কিন্তু একটি বিষয় আমার বুঝেই আসে না। তিনি এবং তাঁর মত যারা নারীকে যুলুমের হাত থেকে বাঁচাতে চান, কেন যেন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সচেতনভাবে এসব বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা এড়িয়ে যান। কেউ কেউ যদিও ছোট্ট করে বলেন, 'ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা জরুরি', কিন্তু জানা সত্ত্বেও, বুঝা সত্ত্বেও ইসলামের নির্দেশনা এড়িয়ে যাওয়াই যেন নিয়ম; পাছে আবার কে সাম্প্রদায়িক বলে বসে বা সেকেলে।

লেখিকা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা বলেছেন। অবশ্যই! ইসলামও তাই বলে- এ গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূক শাস্তিই হওয়া চাই। যত বড় অন্যায়, শাস্তিও তেমন কঠিন হওয়া চাই। নারী-বিষয়ক অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামের চেয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘোষণা আর কেউ দেয়নি। আর ইসলামের সেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রসঙ্গ আসলে এসব পরামর্শদাতা লেখক-লেখিকা তখন অতি মানবতাবাদী হয়ে উঠেন। অপরাধীর প্রতি তখন তাদের অতিমানবতাবোধ উথলে ওঠে; দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা ভুলিয়ে দেয়। এটিই আসলে আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলাফল- উদভ্রান্তের ন্যায় এদিক ওদিক ছুটে চলা। একবার এদিকে দরদ, আরেকবার ওদিকে মায়াকান্না।

কতজন কত পরামর্শ দেন কিন্তু সচেতনভাবেই যেন অপরাধের মূল শেকড়টি জিইয়ে রাখতে চান। কারণ, মূল শেকড় উপড়ে ফেলতে তাদের প্রবৃত্তি বাধা দেয়। তারা অন্যায় পথে প্রবৃত্তির চাহিদাও পুরা করতে চায় আবার যুলুম থেকেও নারীদের বাঁচাতে চায়। ফলে তাদের সকল চেষ্টা হয় তীহ প্রান্তরে অনর্থক ছুটে চলা।

তাদের কেউ বলে, কারাতে শেখাতে হবে নারীদের, অথবা অস্ত্র দেয়া যায় আত্মরক্ষার জন্য। কেউ বলে, নারীদের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে বিশেষ বাহিনী দরকার- আর মোবাইলে থাকবে বিশেষ এ্যাপস; নারী বিপদগ্রস্ত হওয়ার সাথে সাথে এ্যাপস স্থান চিহ্নিত করবে এবং বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী পৌঁছে যাবে সেখানে। এভাবে বাস্তবতা বিবর্জিত হাস্যকর কতশত পরামর্শ!

কিন্তু তারা বোঝে না- এ ব্যবস্থা তো জোরপূর্বক যুলুমের শিকার নারীর আক্রান্ত হওয়ার পরের ব্যর্থ কিছু চেষ্টা। যে নারী মনস্তাত্ত্বিক ও প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে যুলুমের শিকার- তাকে রক্ষা করবে কে?

যে নারী স্বেচ্ছায় এ যুলুমের শিকার হওয়াকেই নিজের মুক্তি ও স্বাধীনতা ঠাওরাচ্ছে তাকে রক্ষা করবে কে?

এজন্য ইসলাম আইনের শাসনের সাথে সাথে নারী-পুরুষের মাঝে আল্লাহ্র ভয় এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার বিষয়টিকে জাগ্রত করেছে। এ বিষয়টিই সবাইকে সব ধরনের যুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণে যে যুলুমের শিকার হচ্ছে নারীরা এ থেকে উত্তরণের জন্য এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। সাথে সাথে ইসলাম সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে রেখেছে। ব্যক্তির মাঝে আল্লাহর ভয় থাকা সত্ত্বেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অন্যায় পরিবেশ তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত করতে পারে। এ থেকে বাঁচতে সুন্দর সুন্দর শ্লোগান কখনোই কার্যকরি নয়। ফলে ইসলাম নারী-পুরুষের অন্যায় মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছে। উভয়ের জন্য দিয়েছে হিজাবের বিধান; দৃষ্টির হেফাযত, যবানের হেফাযত এবং সর্বোপরি অবস্থান ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পথনির্দেশ, যা মেনে চললে নারী রক্ষা পাবে যাবতীয় ...নির্যাতন ও হয়রানি থেকে।

খালাতো-চাচাতো-মামাতো ভাই-বোন, দেবর-ভাসুর, দুলাভাই ইত্যাদি যারা মাহরাম নয় তাদের সাথে পর্দার বিধান দিয়েছে ইসলাম। এ বিধান যারা উপেক্ষা করছে তারাই যুলুমের শিকার হচ্ছে বেশি। আলোচিত লেখাতেই সে পরিসংখ্যান তুলে আনা হয়েছে- বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন (বিপিএফ) এবং সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক যৌথভাবে একটি গবেষণা চালিয়ে দেখেছে, বাংলাদেশে শারীরিক ও মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জে থাকা অর্ধেকের বেশি শিশু যৌন হয়রানির শিকার। এবং সেটি তারা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের দ্বারাই।

এই স্বজনেরাই এখন শিশুদের জন্য ভয়ের কারণ। ...চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, বানের স্বামীরাও রয়েছে এই তালিকায়। পাশের বাড়ির বৃদ্ধ দাদু ও গৃহশিক্ষকও বাদ যান না।

...কিশোরী মেয়ে বান্ধবীর বাড়ি যাবে। একা যাবে কী করে। সঙ্গে পাঠানো হলো প্রাপ্তবয়স্ক মামাতো ভাইকে। পথে মামাতো ভাই...। (দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১০)

মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে যারা পশ্চিমা কালচারে অভ্যস্ত বা সে কালচারকেই নিজেদের উন্নতি-অগ্রগতি-মুক্তির পথ ভাবছেন, নিজেদের সন্তানদের সে কালচারে গড়ে তুলছেন- মুখে স্বীকার না করলেও তাদের ভেতরের অবস্থা উপরের পরিসংখ্যানের

মতই। সুতরাং এখানে 'নীরব থাকার সংস্কৃতি' দায়ী নয়। নীরব-সরবের প্রশ্ন তো আসে আক্রান্ত হওয়ার পর আর ইসলাম গোড়া থেকেই সে পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে। তারপরও কেউ যুলুমের শিকার হলে ইসলাম নীরব থাকতে বলে না। ইরশাদ হয়েছে-

. لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

মন্দ বিষয়ের প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে কারো উপর যুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। -সূরা নিসা (৪) : ১৪৮

যুলুমের শিকার নারী অবশ্যই মুখ খুলবে এবং তার যুলুমের প্রতিকার করবে। কিন্তু যারা নিজ পাপের কথা মানুষকে বলে বেড়াবে, এফএম রেডিওতে সারা দেশবাসীকে তার পাপের সাক্ষী বানাবে- সে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের থেকে আমরা কীভাবে নারীর মুক্তির নির্দেশনা নিতে পারি।

খোদ নারীকে যুলুমের হাত থেকে রক্ষা করার পরামর্শদাতাগণই তো এ যুলুম মেনে নেয়াকে নারীর সামনে মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা বলে উপস্থাপন করছে, তাহলে আমরা কীভাবে এ পরস্পর বিরোধী পরামর্শে নারীর মুক্তির পথ দেখব!

দুঃখজনক হলেও সত্য এ শ্রেণিই এখন বিভিন্ন মুসলিম জনপদে চালকের আসনে। তারাই আমাদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখান। তাঁরা আমাদের সামনে এগিয়ে নেয়ার শ্লোগান দেন, কিন্তু দিন দিন তারা আমাদের পেছনের দিকেই নিয়ে চলেছেন।

যারা নারীর অবাধ মেলা-মেশাকে রেওয়াজ দেয়ায় ব্যতিব্যস্ত। সহশিক্ষা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী-পুরুষের অবস্থান, নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেম-সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের উস্কানিদানে অগ্রবর্তী তারাই যখন নারী-নিগ্রহের খতিয়ান পেশ করেন তখন বড্ড হাসি পায়। নিজেদের ভুল পথের ফলাফলের খতিয়ান নিজেরাই পেশ করছেন। এখান থেকেই নারীকে বুঝতে হবে এ পথ নারীর নিগ্রহের পথ, মুক্তির নয়।

নারীর গৃহে অবস্থান : পরাধীনতা নয়, মৌলিক অধিকার

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের মাধ্যমে মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। (সূরা আ'রাফ (৭) : ১৮৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, (তরজমা) হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী । (সূরা নিসা (৪) : ১)

নিজ নিজ অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে দুনিয়ার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ও আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে উভয়েই সমান অংশীদার। আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ প্রায় সকল দ্বীনী বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন-তাওহীদ, আকীদা-বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলার প্রতি সমর্পণ, কৃতকর্মের প্রতিদান-পুরস্কার কিংবা শাস্তি, ছওয়াব ও ফাযাইল ইত্যাদি। তেমনিভাবে শরীয়তের সাধারণ দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) আমি সৃষ্টি করেছি জীন ও মানুষকে। এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (সূরা নিসা (৪) : ১২৪)

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল (১৬) : ৯৭)

যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তা লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তারই প্রাপ্য অংশ। (সূরা নিসা (৪) : ৩২)

তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি দিক থেকে আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষের মাঝে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে।

নারীর সকল দায়িত্ব পালন, তার নিরাপত্তা বিধান, ভরণ-পোষণ ও বংশের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হিফাজতে তারা হিফাজত করে। (সূরা নিসা (৪) : ৩৪)

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা (২) : ২২৮)

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। (সূরা তালাক (৬৫) : ৭)

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। (সূরা বাকারা : ২৩৩)

পুরুষের এই দায়িত্ব-কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে ...। (সুনানে নাসায়ী ৫/৩৭৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩০)

অন্য হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার আমানতে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। আর তাদের জন্য তোমাদের উপর রয়েছে তাদের সঙ্গত ভরণ-পোষণ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৭; জামে তিরমিযী, আবওয়াবুর রিযা' হাদীস : ১১৬৩)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীর সকল গুরুভার পুরুষের কাধে। পুরুষের দায়িত্ব হল নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। আর এসবের যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জীবিকা উপার্জনের। সুতরাং তাকে গ্রহণ করতে হবে চাকরি, ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো পেশা। আর ঘরের কোণে বসে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ঘরের বাইরে বের হওয়া। এমনকি প্রয়োজনে দূর দূরান্ত সফর করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, নামায সমাপ্ত হলে তোমরা

পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যেন তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমআ (৬২) : ১০)

অন্য আয়াতে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে। (সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩) : ২০)

সুতরাং বহিরাঙ্গনই হল পুরুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাইরে অবস্থান হল তার সাধারণ অবস্থা। ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য শোভনীয় নয়।

পক্ষান্তরে নারীকে আল্লাহ বানিয়েছেন দুনিয়ার জান্নাত। তিনি স্বামীর জন্য প্রশান্তি, সন্তানের জন্য আশ্রয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম (৩০) : ২১)

(তরজমা) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। (সূরা আরাফ : ১৮৯)

নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর এর সর্বোত্তম সম্পদ নেককার নারী।

একমাত্র ইসলামই নারীকে বানিয়েছে সর্বোচ্চ সংরক্ষিত। পরপুরুষ তার দিকে মুখ তুলেও তাকাতে পারবে না। নারীদেরকে আল্লাহ আদেশ করেছেন তারা যেন নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট।

তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর (২৪) : ৩১)

(হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর : ৩১)

বলাবাহুল্য যে, নারীর নিজের ও নিজের সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে আড়াল রাখার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হল গৃহে অবস্থান। কেননা গৃহের চার দেয়াল এবং পর পুরুষের সামনে না যাওয়া ও তাদের সঙ্গে উঠাবসা-চলাফেরা থেকে বিরত থাকাই নারীর জন্য বড় পর্দা। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা নারীকে আদেশ করেছেন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থানের। ইরশাদ করেছেন, আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (সূরা আহযাব : ৩৩)

সুতরাং গৃহে অবস্থানই হল নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং এটিই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। তবে প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু বাইরে অবস্থান শুধু প্রয়োজনবশত ও প্রয়োজন পরিমাণ হতে হবে। আর এ সময়ও নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্যকে রাখতে হবে পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে।

গৃহে অবস্থান নারীর ধর্মীয় অধিকার

কুরআন মজীদে নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৩)

এই আয়াতে গৃহকে নারীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এটি ছাড়া সমগ্র কুরআন মজীদে আর মাত্র দুটি আয়াত এমন আছে, যেখানে গৃহের সম্বন্ধ নারীর দিকে করা হয়েছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নারীর দিকে গৃহের এই সম্বন্ধ তার মালিকানা বোঝানোর জন্য নয়; বরং তা নারীর জন্য সর্বদা গৃহে অবস্থান আবশ্যক হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

অতএব বোঝা গেল, নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ও তার সকল কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের অভ্যন্তরে। ঘরোয়া ও সাংসারিক কাজকর্মই হবে তার প্রধান কাজ। আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের বাইরে।

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সমাজ হবে আলাদা। নারীর বিশেষ সমাজ শুধু নারীর সঙ্গে; গৃহের অভ্যন্তরে। আর পুরুষের বিশেষ সমাজ হবে শুধু পুরুষের সঙ্গে ও গৃহের বাইরে। তো ইসলামে যেহেতু নারীকে ঘরে অবস্থানের বিধান দেওয়া হয়েছে তাই সমাজের কর্তব্য, তাকে এই বিধান পালনের সুযোগ দেওয়া। চাপ প্রয়োগ করে বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে

নারীকে এই বিধান পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা নারীর ধর্মীয় অধিকার।

তাছাড়া সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য বিচারেও গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান নারীর অধিকার। কেননা আল্লাহ তাআলা নারীকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে। তাকে সৃষ্টি করেছেন আদমের পাজর থেকে। ফলে সে আদমের (পুরুষের) একটি অংশবিশেষ। নারীকে মুখোমুখি হতে হয় ঋতুচক্রের, ধারণ করতে হয় গর্ভ, সহ্য করতে হয় প্রসব বেদনা, স্তন্যদান ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব। সর্বোপরি তাকে পালন করতে হয় ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালনের গুরুভার। আর এ কথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যে নারী অফিস-আদালত, কল-কারখানায় কাজ করে তার পক্ষে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। কেননা সে তো সর্বদা ব্যস্ত থাকে তার কর্মক্ষেত্রের নানা কাজে। অফিসের বিভিন্ন দায়িত্বে তাকে সময় দিতে হয়। ফলে ঘরে তার সময় দেওয়া, সন্তানদের দেখাশোনা, খোঁজখবর নেওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং সৃষ্টি-উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিচারেও ঘরে অবস্থানের সুযোগ নারীর প্রাপ্য। এটা তার মানবিক অধিকার। বিশেষত যখন বর্তমান সমাজে নারীর নিরাপত্তা সর্বোচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই যখন নারী অনিরাপদ। তার ইজ্জত-সতিত্ব, জীবন-প্রাণ যখন প্রতি মুহূর্তে চরম হুমকির সম্মুখীন তখন নারীর জন্য ঘরের নিরাপত্তা বলয় ছেড়ে নিজেকে নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি করা, নিজের সতীত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে পদে পদে উত্যক্ততা, ধর্ষণের শিকার হওয়ার কোনো যুক্তি হতে পারে না।

অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হল, প্রগতির দাবিদার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও নারীবাদী একটি গোষ্ঠি মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভন দিয়ে নারীকে আজ ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের হীন স্বার্থে তারা নারীকে ও নারীর রূপ-সৌন্দর্যকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করছে। তারা নারীকে বোঝাচ্ছে যে, ঘরের কোণে পড়ে থাকায় কোনো স্বাধীনতা নেই। স্বামীর অনুগত থাকায় কোনো সম্মান নেই। প্রকৃত সম্মান কেবল বাইরের জীবনে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও উপার্জন করতে হবে। কমপক্ষে নিজের প্রয়োজন পূরণের মতো উপার্জন-উৎস তার থাকতে হবে। তবেই সে হবে প্রকৃত সুখী, প্রকৃত স্বাধীন। তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে আনে পশ্চিমা সভ্যতাকে। যেখানে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-শপিংমলসহ সর্বত্র নারীরা কাজ করে চলেছে।

আর অবলা নারীও প্রলুব্ধ হয়ে নির্বোধের মতোই পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছে। প্রগতিশীল হওয়ার তাগিদে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে অফিস-আদালতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকাকে পরাধীনতা মনে করতে শুরু করেছে। স্বামীর অনুগত হওয়াকে অসম্মান মনে করছে।

তাঁরা আমাদের পূর্বসুরী

কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়, শুধু দ্বীন ও ঈমানের খাতিরে যাদেরকে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ সইতে হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেন সাহাবায়ে কেরাম। ইসলামের প্রথম দিকে কাফেরদের হাতে তাঁরা কঠিনভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া রা.-এর নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুমাইয়্যা রা. ছিলেন আম্মার রা.-এর পুণ্যবতী জননী। এ পরিবারটি একদম ইসলামের প্রথম দিকেই মুসলমান হয়েছিলেন এবং যথারীতি গোটা পরিবারকেই কাফেরদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু ঈমান তাদের হৃদয়ে এত গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছিল যে, শত অত্যাচারেও তাতে কোনোরূপ দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি।

একদিন হযরত সুমাইয়্যা রা.কে কাফেররা মরুভূমি তপ্ত বালুতে শায়িত করে রেখেছিল। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার এই দুরবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় বিগলিত হল এবং তাকে লক্ষ করে বললেন, 'ধৈয্যধারণ কর, তোমার নিবাস হবে জান্নাতে।'

আবু জাহল এই সাহাবিয়াকে লক্ষ করে বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ।

শুধু দুর্বল নারীগণই নন, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে অভিজাত ঘরানার নারীরাও বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর বোন ফাতিমা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উমর রা. যখন ভগ্নি ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনলেন, তখন তাদের উভয়কে প্রচন্ড প্রহার করলেন। এসময় বোন ফাতিমা অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ভাই! তোমার যা ইচ্ছা করতে

পার, আমরা ঈমান এনেছি- এই হল শেষ কথা।' বোনের এই অনমনীয়তা উমরের দৃঢ়তার ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে ইসলামের সম্মান দান করলেন।

শাহাদাতের তামান্না

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে শাহাদাত ছিল অমরত্বের সূচনা। সেই পবিত্র ও লয়হীন জীবনের জন্য তাঁরা লালায়িত ছিলেন।

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল একজন সাহাবিয়া। বদর যুদ্ধের সময় তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জিহাদে শামিল হওয়ার অনুমতি দিন, আমি আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করব, হয়ত আল্লাহ তাআলা আমাকেও শাহাদাতের সৌভাগ্য নসীব করবেন।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান কর, আল্লাহ তোমাকে সেখানেই শাহাদাত দান করবেন।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। উম্মে ওয়ারাকা একজন দাস ও একজন দাসীকে 'মুদাববার' বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ তারা তাঁর মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উম্মে ওয়ারাকা এদের হাতেই শাহাদাত বরণ করেন।

প্রিয়জনদের জন্যও তারা শাহাদাতের তামান্না অন্তরে পোষণ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ছাবিত রা. মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। সে সময় তাঁর শেষ মুহূর্ত সন্নিকটে এসে গিয়েছিল। পরিবারের লোকজন কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁর কন্যা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আমার আশা ছিল যে, আপনি জিহাদের ময়দানে শাহাদাত লাভ করবেন, আপনি তো জিহাদের সকল প্রস্তুতিই সম্পন্ন করেছিলেন। তার একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে তার নিয়তের ছওয়াব পেয়ে গেছে।' -সুনানে আবু দাউদ

ঈমানের দৃঢ়তা

ইসলামী আকীদা সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তা তাদের সত্ত্বার অংশে পরিণত হয়েছিল। চরম নির্যাতনের মাধ্যমেও তাঁদেরকে তাঁদের

বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। কাফেরদের কঠিন নির্যাতনের মুখে হযরত বিলাল রা.-এর 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণকে সাহাবায়ে কেরামের আকীদাগত দৃঢ়তার প্রতীক মনে করা যেতে পারে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতেও রয়েছে।

উম্মে শরীক রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার আত্মীয়-স্বজন তাকে মরুভূমিতে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখল এবং তার শরীরকে আরও উত্তপ্ত করার জন্য মধু মিশ্রিত রুটি খেতে দিল। পিপাসায় অস্থির হয়ে গেলেও তাকে একফোঁটা পানি দেওয়া হল না। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি যখন মৃতপ্রায় হয়ে পড়লেন তখন তারা তাকে বলতে লাগল, তুমি যে ধর্ম গ্রহণ করেছ তা পরিত্যাগ কর। কিন্তু তিনি তখন এতই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাদের কথা বুঝতেই পারছিলেন না। তারা তখন আসমানের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাওহীদ অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে। তিনি তখন বললেন, খোদার কসম, আমি এই আকীদার উপরই বিদ্যমান রয়েছি। -তবাকাতে ইবনে সা'দ

আবু তালহা রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হলেন বিশিষ্ট সাহাবিয়া উম্মে সুলাইম রা.। উম্মে সুলাইম আবু ত্বালহা রা.-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও তাদের মধ্যে বিয়ে হয়নি। আবু ত্বালহা যখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন উম্মে সুলাইম বললেন, হে আবু ত্বালহা! বলুন তো আপনি যে জিনিসের পূজা করেন তা কি ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়নি? আবু ত্বালহা বললেন, হাঁ আমরা বৃক্ষ পূজা করি। আর তা তো ভূমি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে? উম্মে সুলাইম বললেন, এমন জিনিস যা ভূমি থেকে উৎপন্ন হল তার সামনে শির নত করতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয় না? উম্মে সুলাইমের কথায় আবু ত্বালহার মনে বৃক্ষপূজার অসারতা যেন উন্মোচিত হয়ে গেল। পরিশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত উম্মে সুলাইম তার বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। -ইসাবা

কুসংস্কার-মুক্ততা

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। তারা মূর্তিপূজারী ছিল এবং হাতে গড়া মূর্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণ-অকল্যাণের অলীক ধারণা পোষণ করত। ইসলামের

তাওহীদের বিশ্বাসের বদৌলতে সাহাবায়ে কেরাম এসব কুসংস্কার থেকে পূর্ণরূপে পবিত্র ছিলেন।

হযরত যিন্নীরা রা. একজন সাহাবিয়া ছিলেন। যেসব নারী একদম প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনিও তাদের অন্যতম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাকেও কাফেরদের বহু অত্যাচার সইতে হয়েছিল। পরিশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাকে খরীদ করে আযাদ করেন।

জীবনের এক পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়েছিল। কাফেররা তখন বলতে লাগল, 'লাত ও ওজ্জা তাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে।' হযরত যিন্নীরা রা. বললেন, 'খোদার ঘরের কসম, ওরা মিথ্যা বলেছে। লাত-ওজ্জার তো কল্যাণ-অকল্যাণের কোনোই ক্ষমতা নেই। তাঁর এই বক্তব্যের পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে এসেছিল।' -আলইসাবাহ ৭/৬৬৪-৬৬৫

লজ্জাশীলতার কথা

সূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ আর লজ্জাশীল লোকেরা জান্নাতে স্থান লাভ করবে। নির্লজ্জতা হলো পাপ আর এ ধরনের লোকদের স্থান হবে জাহান্নাম।' -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১০১৩৪

হাদীস শরীফের মর্ম হল, ইসলাম লজ্জাশীলতা, শূচিতা, পবিত্রতা, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্ভ্রমবোধের ধর্ম।

ইসলাম মানবসভ্যতাকে উত্তম শূচিতার এমন মানদন্ড উপহার দিয়েছে যার কোনো নযীর নেই। ইসলাম এটা মোটেই বরদাশত করে না যে, মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা ওলট-পালট হয়ে যাবে এবং উভয়ে এক সমান্তরালে নেমে আসবে। এ কারণে ফিতরাত মুসলমানকে লজ্জাশীল বানিয়েছে, নির্লজ্জ হওয়ার সুযোগ দেয়নি। বিপরীত লিঙ্গের ক্ষেত্রে- যেখানে পরস্পর আকর্ষণ রয়েছে সেখানে- উভয়ের চালচলনে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মনের চাহিদা এবং অন্তরের কামনার প্রতি লক্ষ রেখে লজ্জাশীলতার প্রচলন ঘটানো হয়েছে এবং এটাকে ঈমানের অংশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। লজ্জা মূলত ঐ স্বভাবগত অবস্থার নাম, যা মানুষকে অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। লজ্জা তো ঐ শক্তির নাম, যা পাপকাজ ও পাপের স্থানে মানুষের মাথা ঝুকিয়ে দেয়। তার যবানকে রাখে সংযত অশ্লীল ও নিষিদ্ধ বাক্য বিনিময় থেকে। হাতকে রাখে বিরত অবৈধ কাজ ও অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে। এই

লজ্জাই সুন্দরী নারীকে পর্দার আবরণে আচ্ছাদিত করে রাখে। দৃষ্টিকে করে সংযত। অন্তরের অন্তস্থলকে 'নূরে তাজাল্লী' দ্বারা আলোকিত করে এবং নির্লজ্জতার সম্ভাব্য সকল উপকরণকে 'খাওফে খোদা' বা আল্লাহ ভীতি দ্বারা দূরীভূত করে।

কিন্তু অনেক মানুষ যারা জাগতিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ হলেও ধর্মীয় শিক্ষাশূন্য হওয়ায়- পশ্চিমা বিশ্ব, ইহুদী-নাসারা, হিন্দু, বদদ্বীন এবং ধর্মবিদ্বেষীদের দেখাদেখি বরং তাদের প্ররোচণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকেও নির্লজ্জতার সাগরে নিমজ্জিত করতে চায়। এসব লোকের সামনে পর্দা ও লজ্জাশীলতার কথা বলা হলে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা বেপরোয়া কণ্ঠে বলে দেয় এগুলো মোল্লা, মৌলবীদের বানানো কথা। নারীদেরকে বেপর্দা অবস্থায় বাজারে ঘুরানো, ক্লাব- হোটেলে নাচানোকে তারা উন্নতি ও প্রগতি হিসেবে আখ্যায়িত করে।
নারী হচ্ছে নাযুক ও কোমল শ্রেণী। সুতরাং এদের সামনে যখন লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া হয় এবং পর্দাকে মোল্লাদের আবিষ্কার, প্রগতির পথে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তখন ইউরোপীয় এই দর্শনের সামনে মাথা নত করে নির্লজ্জতার চাদর পরিধান করে ঘরের 'চেরাগ' নারীরা বাইরে বেরিয়ে আসে। তাদেরকে শত শত কামুক পুরুষের প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত করা হয়।

উল্লিখিত হাদীসে লজ্জাশীলতার মর্যাদা, এর শুভ পরিণাম এবং প্রতিদান হিসেবে জান্নাত লাভের কথা বলা হয়েছে, যাতে সত্যিকার অর্থেই মুমিন নারীর জন্য সম্মান নিহীত রয়েছে। কিন্তু কী অবস্থা হবে ঐসব নারীর যাদেরকে শুধুমাত্র প্রগতির দোহাই দিয়ে ইসলামের দুশমনেরা পাপিষ্ঠা বানিয়ে ছেড়েছে। ভাগ্য বঞ্চিত এসব নারীর উন্নতি ও প্রগতির প্রকৃত অর্থই জানা নেই। উম্মতজননী হযরত আয়িশার রাযি.-এর উত্তরসূরীরা বেপর্দা ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে বাজারে-পার্কে, দফতর ও অফিস-আদালতে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে তাহলে এতে তাদের কিসের উন্নতি, কিসের অগ্রগতি? এর মাধ্যমে কি মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটে? আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের বিকাশ ঘটে? নারীর মর্যাদা- সম্মান বেড়ে যায়? কখনও নয়, বরং এসবই সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা এবং এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- এদের ঠিকানা জাহান্নাম। এসব নারীদের হাশর-মাঠে

আম্মাজান হযরত আয়িশার রাযি. সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকবে না। নবীয়ে রহমাত কি দয়ার হাত বুলাবেন তাদের মাথায়? তাদের ব্যাপারে শুধু এতটুকুই বলা যায়- 'জাহান্নামের আগুন সহ্য করার ব্যাপারে তারা কত দুঃসাহসী।'

[উর্দু খাওয়াতীন কা ইসলাম অবলম্বনে
আবু বকর সিরাজী]

মহীয়সী নারীদের বীরত্বগাথা

ইউরোপের কালজয়ী ইতিহাসে উজ্জ্বলতম কীর্তি বিবেচিত হয় এক বীরাঙ্গনার গল্প- নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে যিনি সিপাহির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পর্তুগালে সফল অভিযানের পর সেখানে আপন ভাই জোসেফকে স্থলাভিষিক্ত করে স্পেনের দিকে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষ অ্যারাগন (Aragon) রাজ্যের রাজধানী সারাগোসায় (Saragossa) মুখোমুখি হয়। নেপোলিয়নের আগ্রাসন মোকাবেলায় স্প্যানিশরা সামরিক শক্তির পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও ব্যবহার করে। স্বজাতিপ্রেম ও মাতৃভূমি রক্ষার উন্মাদনায় জেগে ওঠে গোটা স্পেন। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় প্রত্যেক নাগরিক। মানবজাতির দুর্বল ও কোমল শ্রেণিও এই কঠিন মুহূর্তে মাতৃভূমির জন্য জীবনবাজি রাখতে পিছপা হয়নি।

অবলা নারী ও দুর্বল শিশুদের আত্মত্যাগ আর কী হতে পারে? আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদিই ছিল তাদের কাজ। কাউন্টেস বিউরেটা (The Countess of Bureta)' নারী ও শিশুদের নিয়ে একটি দল গঠন করে তাদের দায়িত্ব দিলেন যেন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহিদের নিকট খাবার পৌঁছে দেয়, আহত সৈনিকদের উদ্ধার করে, তাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগায় এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধেরই এক গৌরবময় ঘটনা-

সেই দলের এক সদস্য অগাস্টিনা সারাগোসা (Agustina Saragossa) একদিন সিপাহিদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ভয়ংকর দৃশ্য তার চোখে পড়ে। যুদ্ধরত এক গোলন্দাজ সৈনিকের গায়ে গুলি লাগলে সে পড়ে যায়। অন্য

সৈনিকেরা শত্রুপক্ষের অগ্রযাত্রা রুখার জন্য সাহস করে নিহত সৈনিকের স্থানে দাঁড়াতে চাচ্ছিল। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে এত তীব্র গুলি বর্ষিত হচ্ছিল যে, তারা বারবার অগ্রসর হয়েও পিছু হটছিল। দুঃসাহসী অগাস্টিনা এক দৌড়ে চলে যান নিহত সৈনিক পর্যন্ত; সে মৃত্যুর আগে শত্রুর দিকে যে কামান তাক করে রেখেছিল, তাতে দেশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মনোবল না হারিয়ে নিরলস লড়াই চালিয়ে যান। তার সাহসী ভূমিকার কারণেই সেদিন সৈনিকরা উজ্জীবিত হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

যুদ্ধ শেষে অগাস্টিনা বুঝতে পারেন, তিনি এ অবদান রেখেছেন তার স্বামীর পক্ষ থেকে, যার মৃতদেহ কামানের ওপাশে পড়ে ছিল। দেশ ও জাতি অগাস্টিনার এই অবদান বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। আজীবন তিনি রাজদরবার থেকে ভাতা পেতেন। ইউরোপের বিশিষ্ট লেখকগণ তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলির মাঝে একে স্থান দেন।

'জোয়ান অফ আর্ক' (Joan of Arc) ইউরোপের এক বীর মহিলা। ১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুরুষের বেশ ধারণ করে সেনাপতি হয়ে অর্লিন্স অবরোধ করেন। পাতের যুদ্ধে (The Battle of Patay) ইংরেজদের পরাজিত করে তিনিই ক্ষমতায় আসীন করেন চার্লস সপ্তমকে। ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে জাদুর জোরে তিনি এই অতিমানবীয় শক্তি লাভ করেছেন-এ অপবাদ দিয়ে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। 'জোয়ান অফ আর্ক'-এর কীর্তি এতই প্রসিদ্ধি পায় যে, স্কুলের শিশুদের কাছেও তিনি পরিচিত। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাকে সাধু বা সেইন্ট স্বীকৃতি প্রদান করে!

***

অপরদিকে, মুসলমানদের ইতিহাসে এজাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা অসংখ্য। দুঃখের বিষয় হল, এসব অমূল্য কীর্তিগাথার উপযুক্ত কদর আমাদের কাছে নেই।

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবেও এই নিয়ম ছিল যে, নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণ করত। মহিলা ও শিশুরা যুদ্ধের সারির পেছনে থাকত। তাদের কাজ হত-

আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করা, ঘোড়ার পরিচর্যা করা, তাদের বীর স্বামীদেরকে স্বস্তি দেওয়া, পূর্বসূরিগণের ইতিহাসখ্যাত বীরত্বগাথা আবৃত্তি করে তাদেরকে উদ্দীপ্ত করা, নিহত সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে নেওয়া, পলায়নপর শত্রুদের গ্রেফতার করা, লাশ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

আরবের বিখ্যাত কবি আমর বিন কুলসুম গর্ব করে বলেছেন:

'আমাদের পেছনে আছে শ্বেতাঙ্গী সুন্দরীরা, আমরা সদা সতর্ক থাকি যেন তাদের অসম্মান না হয়, শত্রু যেন তাদের নাগাল না পায়। স্বামীরা যখন শত্রুবহরের মুখোমুখি হয়, স্ত্রীরা তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়-সওয়ারী, হাতিয়ার ও লোহার শিকল পরিয়ে বন্দী লুটে নেবার। এরা জুশাম বিন বকর গোত্রের নারী-শুধু সৌন্দর্য নয়, ধর্মবিশ্বাস ও বংশ-মর্যাদায়ও তারা অতুলনীয়। তারা আমাদের ঘোড়ার পরিচর্যা করে এবং বলে-শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে না পারলে আপনারা স্বামী হওয়ার যোগ্য নন।''

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রাচীন রীতি ইসলামি যুগেও বহাল ছিল। স্বামীদের সঙ্গে স্ত্রীরাও যুদ্ধে যেত। সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুসারে, উহুদ যুদ্ধে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. নিজ হাতে মশক পূর্ণ করে আহত সৈনিকদেরকে পানি পান করিয়েছিলেন। উম্মে সুলাইম ও উম্মে সালিত নামক দুজন সাহাবিয়াও তাঁর সঙ্গে এই সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু নুআইম রহ. থেকে বর্ণিত আছে, খাইবার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছয় জন মহিলাও মদিনা থেকে রওনা হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেন না। তিনি জানতে পেরে রাগান্বিত হয়ে বলেন-'তোমরা কার সঙ্গে বেরিয়েছ? কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে?' মহিলারা আরজ করল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের সঙ্গে ঔষধপত্র আছে। আমরা আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগাব। তাদের শরীর থেকে তীর বের করব। সৈনিকদের খাবারের ব্যবস্থা করব।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা থাকো।' যখন খাইবার বিজিত হয়-অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে তাদেরকেও তিনি গনিমতের অংশ প্রদান করেন।

এসব সেবামূলক কাজের জন্য উম্মে সুলাইম রা. ও কিছু আনসারী সাহাবিয়া অধিকাংশ যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন।'

হজরত রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িয রা. সহ কিছু মহিলা উহুদ যুদ্ধে শহিদ ও আহতদেরকে ময়দান থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রুফাইদা রা.-এর একটি তাঁবু ছিল, সেখানে তিনি আহতদের ব্যান্ডেজ করতেন।

উম্মে যিয়াদ আশজায়িয়া রা. সহ আরো পাঁচজন নারী খাইবার যুদ্ধে চরকা কেটে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তারা ময়দান থেকে তীর তুলে আনতেন এবং মুজাহিদদের ছাতু পান করাতেন।

হজরত উম্মে আতিয়া রা. সাতটি যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য খাবার রান্না করেছিলেন।

ইবনে জারির তাবারি রহ. লিখেন, মুসলমানগণ নিহতদের একত্র করে কাতারের পেছনে রাখতেন। যারা শহিদদের কাফন-দাফনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা আহতদেরকে মহিলাদের নিকট সোপর্দ করে শহিদগণকে দাফন করতেন। কাদিসিয়া বিজয়কালে সংঘটিত 'আরমাস' ও 'আগওয়াস' যুদ্ধে মহিলা ও শিশুরা কবর খনন করেছিলেন।

কাদিসিয়া যুদ্ধে উপস্থিত এক মহিলা যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'যুদ্ধ শেষ হলে আমরা কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রের দিকে চললাম। আমাদের হাতে ছিল লাঠি। কোনো আহত মুসলিম সৈনিক দেখলেই আমরা তাকে পানি পান করাতাম এবং উঠিয়ে নিতাম। কোনো কাফিরকে দেখলেই হত্যা করতাম। শিশুরাও একাজে আমাদের সাথে অংশ নিত।"
উপরোল্লিখিত ঘটনাবলি থেকে নারীদের ধর্মীয় উদ্দীপনা, প্রখর মর্যাদাবোধ, চরম সাহসিকতা ও জাতির প্রতি সহমর্মিতাবোধ ছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের নিম্নলিখিত সেবাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়-

১. আহতদের পানি পান করানো;

২. সৈনিকদের খাবার সরবরাহ করা;

৩. কবর খনন করা;

৪. আহত সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে আনা;

৫. আঘাতপ্রাপ্তদের শুশ্রূষা করা এবং

৬. প্রয়োজনের সময় সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

প্রথম যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধের চিত্র যদি এক এক করে সামনে আনা হয়, প্রায় প্রতিটিতে দেখা যাবে তারা কাতারের পেছনে নির্ধারিত দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

শেষোক্ত অবদান সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

যাতে মুসলিম নারীগণ তাদের গঠনগত দুর্বলতাকে ছাপিয়ে এসব কঠিন ও দুঃসহ খেদমত কত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন তা কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।

হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম হজরত আনাস বিন মালিক রা.-এর মা হজরত উম্মে সুলাইম রা. সাধারণত সব যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন।
হজরত তুলাইব বিন উমাইর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর মা আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রা.-কে জানানো হলে তিনি তাকে বলেন, 'তুমি সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সাহায্য করছ। যদি আমারও পুরুষদের মত সামর্থ্য থাকত আমি তাঁর প্রহরী হতাম এবং তাঁর পক্ষ হয়ে লড়তাম।"

খন্দক যুদ্ধের এক পর্যায়ে ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত পুরনো চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। তারাও একযোগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বনু কুরাইজা মুসলিম নারী ও শিশুদের সংরক্ষিত অবস্থানস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বনু কুরাইজা ও মুসলিম নারী-শিশুদের মধ্যবর্তী এমন কোনো মুসলিম সৈন্যদল ছিল না যারা মহিলাদের নিরাপত্তা দিবে। এমন সময়ে এক ইহুদি মহিলাদের কেল্লার নিকটে চলে আসে। আশংকা ছিল, যদি সে মহিলাদের কথা বনু কুরাইজাকে গিয়ে বলে আসে তারা ময়দান ফাঁকা পেয়ে মহিলাদের ওপর হামলা করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু ও যুবাইর রা.-এর মা হজরত সাফিয়্যা রা. হজরত হাসসান রা.-কে সেই ইহুদিকে হত্যা করতে বলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে সাফিয়্যা রা. নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে নেমে আসেন এবং তা নিক্ষেপ করে ইহুদিকে হত্যা করেন। ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির জাযারি রহ. লিখেছেন, কোনো মুসলিম নারী কর্তৃক কোনো কাফিরকে হত্যা করার এটিই প্রথম ঘটনা।

***

উম্মে উমারা রা. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবিয়া। মদিনার একদল মুসলমান হিজরতের পূর্বে কুরাইশের কাফিরদের থেকে লুকিয়ে আকাবায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তাঁর সাহায্যের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল মদিনা থেকে আগত মুসলমানদের সর্বপ্রথম দল। এই ছোট্ট দলটিতে উম্মে উমারা রা.ও ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'বাইয়াতে আকাবা' নামে প্রসিদ্ধ।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ পালনের উদ্দেশে মক্কা অভিমুখে রওনা করেন। তিনি মক্কার নিকটে এসে কুরাইশের কাছে প্রবেশের অনুমতি চান। উসমান রা. মুসলমানদের দূত হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন কুরাইশ উসমান রা.-কে শহিদ করে দিয়েছে মর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবি থেকে শাহাদাত ও কাফিরদের সাথে লড়াইয়ের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। হজরত উম্মে উমারা রা. এই বাইয়াতেও শরিক ছিলেন।

এছাড়াও তিনি স্বামী যাইদ বিন আসিম রা.-এর সঙ্গে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি উহুদের ময়দানে যখন মুসলমানগণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন-কাফিররা এগিয়ে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলা করছিল আর জানবাজ সাহাবিগণ জীবনবাজি রেখে লড়ে যাচ্ছিলেন-সেই নাজুক মুহূর্তেও এই বীর মহিলা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে হামলাকারীদের আঘাত করে করে পেছনে হটিয়ে দিচ্ছিলেন। সেদিন তিনি হাতে ও বাহুতে কয়েকটি আঘাত পান। অন্যান্য যুদ্ধেও তাঁর এমন অনুপম বীরত্বের কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে।'

হজরত আবু বকর রা.-এর যুগে মুসাইলামা কাজ্জাব নবুওয়ত দাবী করে। অতঃপর ইয়ামামায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। ইয়ামামার যুদ্ধ নামে খ্যাত সেই লড়াইয়ে উম্মে উমারা রা.ও অংশগ্রহণ করেন। হাতে আঘাত পাওয়া পর্যন্ত তিনি দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। সেদিন উম্মে উমারা রা. দেহের বারোটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন।'

হজরত উমর ফারুক রা.-এর যুগে আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে তৎকালীন প্রাচ্যের দুই অজেয় পরাশক্তি-রোম ও পারস্যের মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল রোমকদের সাথে সংঘটিত সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এটি ছিল তাদের জন্য চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ। অপরদিকে কাদিসিয়ার যুদ্ধ ছিল কিয়ানি' সাম্রাজ্যের টিকে থাকার অন্তিম সংগ্রাম, পারসিকদের পক্ষে যার চেয়ে বেশি শক্তি ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। এই দুটি যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, পৃথিবীজুড়ে যা ইসলামের প্রসারের পথ নিষ্কণ্টক করেছিল।

এই দুই যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয়ের পেছনে পর্দানশীন মুসলিম নারীদের কর্মতৎপরতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৪ হিজরীর মুহাররম মাসে কাদিসিয়া নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে ইরানিদের মোকাবেলা হয়। ইরানি ফৌজে সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখেরও বেশি, মুসলিম ফৌজে ছিল ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি সৈনিক। এই যুদ্ধে কয়েক হাজার মুসলমান শহিদ হন। মহিলা ও শিশুরা

শহিদদের কবর খনন করেন। রণক্ষেত্র থেকে আহতদের উঠিয়ে নেন ও সেবা-শুশ্রূষা করেন।

কাদিসিয়ার যুদ্ধে মহিলাদের কী পরিমাণ উদ্দীপনা ছিল তা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। নাখা' গোত্রের জনৈক বৃদ্ধা নিজ সন্তানদেরকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন-
'প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে তার ওপর অটল থেকেছ। হিজরত করে আর স্বদেশে ফিরে যাওনি। তবুও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়নি; তোমাদের গ্রাস করেনি দুর্ভিক্ষও। এবার তোমরা বৃদ্ধা মাকে সঙ্গে এনে তাকেও পারস্যবাসীর মুখোমুখি করে দিয়েছ। আল্লাহর শপথ, তোমরা একই মা-বাবার সন্তান। আমি তোমাদের বাবার সাথে খেয়ানত করিনি, অপমানিত করিনি তোমাদের মামাকে। যাও, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে লড়াই করো।"

তারা একযোগে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বীরবিক্রমে লড়াই করে। যখন তারা দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়, বৃদ্ধা মা হাত তুলে দুআ করেন, হে আল্লাহ, আমার সন্তানদেরকে হিফাজত করুন। যুদ্ধ শেষ হলে বীর সন্তানেরা সুস্থ ও নিরাপদে মায়ের কাছে ফিরে আসে এবং গনিমতের মাল মায়ের সামনে এনে রাখে।

কাদিসিয়ার যুদ্ধে আরবের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি খানসা রা.ও অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিল তাঁর চার পুত্র। রাতের প্রথমভাগে যখন সব সৈনিক সকালের ভয়াবহ দৃশ্য কল্পনা করছিল—তখন এই বিপ্লবী কবি নিজ সন্তানদেরকে এভাবেই উদ্দীপ্ত করেন-
'প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছ এবং হিজরত করেছ। মহান আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই-তোমরা যেমন এক মায়ের সন্তান তেমনি এক পিতার সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে খেয়ানত করিনি। মামাদের অপমানিত হতে দিইনি। কলঙ্কিত করিনি তোমাদের বংশমর্যাদা। বিকৃত করিনি তোমাদের বংশপরিক্রমা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলা কী বিপুল সাওয়াব রেখেছেন তোমরা তা জানোই। জেনে রেখো, চিরস্থায়ী আখিরাত এই নশ্বর পৃথিবীর চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল সকালে যখন তোমরা সুস্থ ও নিরাপদে রণাঙ্গণে যাবে—অবশ্যই চোখ-কান খোলা রেখে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়বে। আর যখন দেখবে পুরোদমে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সংঘর্ষের আগুন, ময়দান পরিণত হয়েছে অগ্নিগর্ভে, বিভীষিকার চাদরে আচ্ছাদিত পুরো পরিবেশ-তখন ধাবিত হও অগ্নিকুণ্ডের দিকে, জ্বলন্ত শত্রুশিবিরের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ো সেনাপতির ওপর। আল্লাহ তাআলার কৃপায় দুনিয়াতে গনিমত ও আখিরাতে মর্যাদা লাভ করবে।

পরদিন সকালে খানসা রা.-এর চার সন্তান একযোগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বীরত্বের সাথে লড়াই করে চারজনই শহিদ হয়ে যান। খানসার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন-'আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি আমাকে শহিদদের মা হওয়ার সম্মান দান করেছেন!' হজরত উমর রা. তাকে চার সন্তানের ভাতা বাবদ আটশ দিনার দিতেন।

পারসিকদের বিপক্ষে জিসরের যুদ্ধে মুসলমানগণ মর্মান্তিক পরাজয় বরণ করেন। তারপর সংঘটিত হয় বুয়াইবের যুদ্ধ নামে আরেকটি ভয়ানক যুদ্ধ। বুয়াইবের যুদ্ধকে কাদিসিয়া যুদ্ধের ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা যায়। সেই যুদ্ধে ইরানিদের বিপুল পরিমাণ রসদপত্র মুসলমানদের হাতে এসেছিল। মুসলিম নারীদের রেখে আসা হয়েছিল রণক্ষেত্রের যথেষ্ট পেছনে। খাবারের ব্যবস্থাপনা যেহেতু মহিলাদের দায়িত্বে ছিল-তাই সেনাপতি মুসান্না একটি দলকে সমস্ত রসদপত্র দিয়ে মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সৈনিক-দলটি ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে মহিলাদের তাঁবুর দিকে যেতে লাগলেন। মহিলারা মনে করলেন, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার জন্য আসছে। মহিলারা তাঁবুতে অস্ত্র কোথায় পাবে? তাই তারা শিশুদেরকে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর নিজেরা পাথর ও তাঁবুর খুঁটি নিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। দলটির সেনাপতি উমর বিন আব্দুল মাসিহ দূর থেকে ডাক দিয়ে বললেন, মুসলিম বাহিনীর মহিলাদের এমনই বীর হওয়া উচিত। এই বলে তিনি মহিলাদেরকে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে রসদপত্র সোপর্দ করলেন।'

মাইসানের যুদ্ধে নারীগণ বীরত্বের আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। দজলা নদীর তীরে মাইসানবাসী ও মুসলিমগণ মুখোমুখি হন। তৎকালীন সেনাপতি মুগিরা রা. নারীদেরকে রণাঙ্গণ থেকে যথেষ্ট পেছনে রেখে আসেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই হচ্ছিল। আরব-চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ কালাদা'র' পৌত্রী আযদাহ বিনতে হারিস মহিলাদের বলেন-'এ সময়ে আমরা মুসলমানদের সহযোগিতা করলে খুবই উপযুক্ত হত।' এই বলে তিনি তাঁর ওড়না দিয়ে একটি বড় পতাকা তৈরি করেন। অন্যান্য মহিলারাও তাদের ওড়না দিয়ে একটি করে পতাকা তৈরি করেন। ওদিকে উভয় পক্ষ ছিল ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত। মহিলারা তখন ঝাণ্ডা উড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর নিকট পৌঁছে যান। অনেকগুলো পতাকা উড়িয়ে মহিলারা মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন। শত্রুপক্ষ মনে করে, মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য তাজাদম বর্তমান সৈন্যদল এসে গেছে। তাদের মনোবল ভেঙে যায়। মাহসানের আকাশ থেকে মুহূর্তেই কেটে যায় কালো মেঘ।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর শাসনামলে ১৩ হিজরীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ দামেস্ক আক্রমণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দামেস্কবাসী কেল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মুসলমানরা কেল্লা ঘেরাও করে রেখেছিলেন। পরে জানা যায়, নব্বই হাজার রোমক সৈন্য বিপুল সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আজনাদাইনে একত্র হচ্ছে। বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনী পুরো শামে' ছড়িয়ে ছিল। ইরাক পদানত করে হজরত আবু উবাইদা ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. দামেস্কে এসে মুসলিম ফৌজের সঙ্গে মিলিত হন। সকলে স্থির করেন, আগামীকাল পুরো মুসলিম বাহিনীর এক স্থানে একত্র হওয়া উচিত। তাদের মোট সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। সকল সেনাপতি যে যেখানে ছিলেন নিজেদের বাহিনী নিয়ে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হন।

আবু উবাইদা ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. অবরোধ তুলে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হন। হজরত খালিদ রা. বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন। আর হজরত আবু উবাইদা রা. কিছু সৈন্যসমেত নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে তাঁবু ও রসদপত্র বহন করে পেছনে পেছনে আসছিলেন। দামেস্কবাসী দেখতে পেল মুসলমানরা তাঁবু, মালপত্র ইত্যাদি নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাদের মনে হল প্রতিশোধ নেওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

কেল্লার ফটক খুলে তারা পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। রোমসম্রাট দামেস্কের জন্য কিছুসংখ্যক সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে তারাও তখন এসে পৌছে এবং মুসলমানদের পথরোধ করে। স্পষ্টত তখন মুসলমানদের হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তারা সংহত ও অটল থেকে উভয় দিকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকেন। কিন্তু তাদের মনোযোগ তুলনামূলকভাবে সামনের বাহিনীর দিকে বেশি ছিল। এই সামান্য সুযোগও দামেস্কবাসী হাতছাড়া করেনি। তারা মুসলিম নারীদেরকে জিম্মি করে তাদেরকে নিয়ে কেল্লার দিকে রওনা হয়।নারীরা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকেন। খাওলা বিনতে আযওয়ার বলেন, 'বোনেরা! তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ কীভাবে এটা মেনে নেয় যে, তোমরা দামেস্কের মুশরিকদের কব্জায় চলে যাবে? তোমরা কি আরবের বীরত্ব ও গৌরবে কলঙ্ক লেপন করতে চাও? এই অপমানের চেয়ে আমার নিকট মৃত্যু শ্রেয়তর।' এই কয়েকটি বাক্য মহিলাদের মনে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। তাঁবুর খুঁটি নিয়ে তারা সার বেঁধে অগ্রসর হতে থাকেন। সবার সামনে বিশিষ্ট সাহাবি যিরার বিন আযওয়ারের বোন খাওলা, তাঁর পেছনে ছিলেন উফাইরা বিনতে গিফার, উম্মে আবান বিনতে উতবা, সালমা বিনতে নোমান বিন মুকাররিন প্রমুখ। কিছুক্ষণের জন্য হতবাক দামেস্কবাসীরা নিশ্চল চেয়ে থাকে। ততক্ষণে মহিলাগণ ত্রিশটি লাশ ফেলে দেন। পরে তারা আবার আক্রমণ করেন। দামেস্কবাসীরা সমূলে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়। এদিকে মুসলিম ফৌজ রোমকদের পরাস্ত করে ফিরে আসে। দামেস্ক ফৌজে প্রাণের যে স্পন্দন ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে যায় সেই আক্রমণে। বাকিরা পলায়নপর হয়ে দামেস্কের কেল্লায় আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী পুনরায় যাত্রা শুরু করে আজনাদাইনের দিকে।

এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) [১৭৩৭-৯৪ খ্রি.) তার ইতিহাসগ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা করে মুসলিম মহিলাদের সতীত্ব, পবিত্রতা, সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন, 'এসব মহিলা তরবারি চালনা ও তীর-বর্শা নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাই তারা সংকটপূর্ণ সময়ে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হন'।

***

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম 'নিয়মতান্ত্রিক' যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার। তবে তারা সকলে ছিলেন আরবের বাছাইকৃত লোক। রোমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল দুই লাখের বেশি। এই মানব-ঝড়টি তীব্র উদ্যম ও প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এক আঘাতেই মুসলিম বাহিনীকে সমূলে উপড়ে ফেলবে। ইয়ারমুকে উভয় ফৌজ মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী ও খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য ছিল চারগুণ। তদুপরি তাদের উন্মাদনা এমনই ছিল যে, ত্রিশ হাজার রোমান পায়ে বেড়ি পরিধান করেছিল, যাতে চাইলেও তারা পিছু হটতে না পারে।

দুই লক্ষ ফড়িঙের ঝাঁক প্রচণ্ড তীব্রতার সাথে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে মুসলিম বাহিনীর ডানপার্শ্ব পিছু হটতে হটতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত চলে যায়। লাখম ও জুযাম গোত্রদ্বয় দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই খ্রিস্টানদের অধীনে ছিল। ইতিপূর্বে তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর বামপার্শ্বে অধিকাংশ তারাই ছিল। রোমান বাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হলে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। রোমান বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে। মহিলাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁবু থেকে বের হয়ে পড়েন এবং এমন তীব্রভাবে রোমান বাহিনীকে আক্রমণ করেন যে, তাদের প্রবল স্রোত মুহূর্তেই থেমে গিয়ে পেছনে সরতে থাকে। তখন মহিলারা পলায়নপর মুসলমানদেরকে থামিয়ে পুনরায় সামনে পাঠিয়ে দেন এবং ফৌজের পেছনে এসে আত্মমর্যাদাবোধ উস্কে দিয়ে তাদের হৃদয়ে উদ্যমের সঞ্চার করেন।মহিলাদের এই প্রচেষ্টায় মুসলিমদের মাঝে হারানো মনোবল ফিরে আসে। কুরাইশ বংশের নারীরা তরবারি টেনে টেনে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আক্রমণ করতে করতে পুরুষদের অতিক্রম করে এগিয়ে যান।'

হজরত মুআবিয়া রা.-এর বোন হজরত জুয়াইরিয়া রা. মেয়েদের একটি দল নিয়ে অগ্রসর হন এবং প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে জখম হন। হজরত মুআবিয়া রা.-এর মা হজরত হিন্দ বিনতে উতবা রা.

পুরুষদেরকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করছিলেন-

عضدوا الغلفان بسيوفكم

খতনাবিহীন কাফিরদের তরবারি দ্বারা টুকরো করতে থাকো।

رميت بالسهم والمنيات

লক্ষ্যে পরিণত হও!'

ইতিহাসবিদ তাবারি রহ. এই যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে উম্মে হাকিম বিনতে হারিছের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আসির জাযারি রহ. লিখেছেন, হজরত মুআয বিন জাবাল রা.-এর ফুফাতো বোন আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. একাই নয়জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন।'

ঐতিহাসিক ওয়াকিদি রহ. ইয়ারমুকের ভয়াল রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন হজরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা., উবাদাহ বিন সাবিত রা.-এর স্ত্রী খাওলাহ বিনতে সা'লাবা, কা'উব বিনতে মালিক, সালমা বিনতে হাশিম, না'আম বিনতে ফাইয়ায প্রমুখ।

ইয়ারমুক যুদ্ধের পর ফের মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একদিন তারা দামেস্কের নিকটে 'মারজুস সাফফার' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। খালিদ বিন সাঈদ সেখানেই উম্মে হাকিম রা.-কে বিয়ে করেন এবং মুসলমানদেরকে ওয়ালিমার দাওয়াত খাওয়ান। সেখানকার একটি সেতুর কাছেই উম্মে হাকিমের তাঁবু খাটানো হয়। এখনও সেই সেতু উম্মে হাকিম সেতু নামে খ্যাত। মুসলমানগণ ওয়ালিমার খাবার শেষ করার আগেই রোমান বাহিনী পৌঁছে যায়। মুসলিম বাহিনীও দ্রুত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এত তীব্র আক্রমণ করে যে, রোমকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। উম্মে হাকিম রা.ও চরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর হাতেই সাত রোমান সৈনিকের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়!

উষ্ট্রের যুদ্ধে (৩৬ হি.) হজরত আয়েশা রা. কর্তৃক ফৌজ নিয়ে হজরত আলি রা.-এর মোকাবেলায় বের হওয়াকে 'ইজতিহাদি ভুল' গণ্য করা হলেও এর দ্বারা মহিলাদের স্বনির্ভরতা, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততা প্রমাণিত হয় বটে।
ওয়াকিদি রহ. রচিত 'ফুতুহুশ শাম' গ্রন্থের ঐতিহাসিক সূত্রাবলি স্বীকার করে নিলে এই কথা মানতেই হয় যে, শামের বিজয়সমূহে মহিলাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত উম্মে হাকিম, হিন্দ, উম্মে কাসির, আসমা, উম্মে আবান, উম্মে উমারা, খাওলা, লুবনা, 'আফরা রা. প্রমুখ মহিয়সী নারীগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন বীরত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন যা পুরুষদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

উতবা বিন গাযওয়ান হজরত ওমর রা.-এর সেনাপতি ছিলেন। আরব-চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ কালাদা'র পৌত্রী আযদাহ বিনতে হারিস ছিলেন উতবার স্ত্রী। উতবা যখন ফুরাত নগরের বাসিন্দাদের সাথে তীব্র লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন তার স্ত্রী আযদাহ বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন; প্রেরণা সঞ্চার করতেন।

দামেস্ক আক্রমণকালে আবান বিন সাঈদ রা. দামেস্কের শাসক 'তুমা'র হাতে শাহাদাতবরণ করলে তার স্ত্রী উম্মে আবান বিনতে উতবা রা. নিহত স্বামীর সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বের হন এবং দীর্ঘক্ষণ শত্রুর সাথে লড়াই করেন। দামেস্কবাসীরা যদিও অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা সমানতালে নগরপ্রাচীরের চূড়াসমূহ থেকে মুসলমানদের আক্রমণের জবাব দিচ্ছিল। তাদের এক সাধু সম্মুখভাগে স্বর্ণখচিত ক্রুশ হাতে নিয়ে তাদের তিন খোদার নিকট বিজয় প্রার্থনা করছিল। উম্মে আবান ছিলেন তীর নিক্ষেপে সুদক্ষ। তিনি তার দিকে তাক করে এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করেন যে, ক্রুশ তার হাত থেকে কেল্লার নিচে সহ্য হচ্ছিল না তাদের মহান ক্রুশের এই অবমাননা। স্বয়ং তুমা' ক্রুদ্ধ পড়ে যায়। মুসলমানগণ ছুটে গিয়ে ক্রুশ কবজা করেন। খ্রিস্টানদের মুসলমানরা ঘাবড়ে যান। রোমানরা ক্রুশ ফেরত নিতে শত চেষ্টা করে। হয়ে শহরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। এলাকাজুড়ে হৈচে পড়ে যায়। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। যেই মুসলমানদের দিকে আসার চেষ্টা করত উম্মে আবানের তীর তাকে ফিরিয়ে দিত। 'তুমা' যখন কিছুতেই ফিরে যাচ্ছিল না-উম্মে আবান তার চোখ লক্ষ্য করে নিপুণভাবে তীর নিক্ষেপ করেন; সে চিৎকার করে পালাতে বাধ্য হয়। তখন উম্মে আবান

রা. এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন-

صولي عليهم صولة المتدارك

أم أبان فاطلبي بثأرك

قد ضج جمع القوم من نبالك

'উম্মে আবান, তুমি নিজ প্রতিশোধ নিয়ে নাও-তাদের ওপর একের পর এক আক্রমণ করো। রোমকরা তোমার তীরের আঘাতে আর্তনাদ করছে।'

ইয়ারমুকের সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ ছিল প্রথম দিন, যা ইয়াওমুত তা'ওয়ির বা অন্ধত্বের দিন নামে খ্যাত। মুসলিম মহিলাদের বীরত্বের এক অভিনব ও আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত এ দিন প্রকাশ পেয়েছিল। নারীগণ সেদিন তরবারি উন্মুক্ত করে রোমানদের ফিরিয়ে না দিলে মুসলমানরা পরাজিত হতেন। হিন্দ, খাওলা, উম্মে হাকিম রা.-সহ আরো অনেক কুরাইশি নারী বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ করেন। আসমা বিনতে আবু বকর রা. ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বামী হজরত যুবাইর রা.-এর সাথে সাথে ছিলেন। হজরত যুবাইর রা.-এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানতালে লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

সিফফিনের যুদ্ধে (৩৭ হি.) অনেক মহিলা হজরত আলি রা.-এর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা লড়াই করতেন এবং আবেগঘন বক্তৃতা দিয়ে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। যারকা, ইকরাশা ও উম্মে খাইর রা. যুদ্ধক্ষেত্রে এমন বক্তব্য রাখেন যাতে সৈনিকদের অন্তরে আগুন জ্বলে ওঠে।'

***

নব্বই হিজরীতে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতকালে মুসলমানগণ বুখারা আক্রমণ করেন। কুতাইবাকে সেই বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠানো হয়। আরবে আব্দ গোত্রের বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল প্রবাদতুল্য। ইসলামের বিজয়সমূহে তাদের কীর্তি ও অবদান অত্যন্ত উজ্জ্বল। বুখারায় বাসকারী তুর্কিরাও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের

মোকাবেলায় বের হয়েছিল। আব্দ গোত্রের লোকেরা বলেন, প্রথমে শুধু আমাদেরকে শক্তি পরীক্ষা করতে দিন। কুতাইবা তাদেরকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেন। আদিরা অগ্রসর হয়ে খুব বীরত্বের সাথে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাদের এই মোকাবেলা কোনো মামুলি শক্তির সাথে ছিল না। তুর্কিরা এমন দৃঢ়তার সাথে হামলা প্রতিরোধ করে যে, আযদিরা পিছু হটতে হটতে তাদের তাঁবু পর্যন্ত এসে যান। তুর্কিরা অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের ওপর আরো তীব্র হামলা করে। মহিলারা দেখতে পান মুসলমানগণ পরাজিত হতে যাচ্ছেন। তারা উঠে দাঁড়ান এবং চাবুক মেরে মেরে ঘোড়াগুলোর মুখ পুনরায় ময়দানের দিকে ফিরিয়ে দেন। তারা চতুর্দিকে হৈচৈ ফেলে দেন। মুসলমানরা আবার সাহসের সাথে সামলে উঠে সবেগে পাল্টা আক্রমণ করেন। ফলে তুর্কিরা আর টিকে থাকতে পারেনি। এখানে যদিও মহিলারা তরবারি উত্তোলন করেননি; কিন্তু তাদের প্রচেষ্টাতেই এ বিজয় বর্তমান

সহজসাধ্য হয়েছিল। যদি মহিলারা দৃঢ়তা প্রদর্শন না করতেন তাহলে হয়ত মুসলমানগণ ময়দান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতেন।'

ইসলামে খারেজি সম্প্রদায় তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে খুবই প্রসিদ্ধ। কিছু ইসলামি ফেরকার ন্যায় তারা শুধু চক্রান্তের জাল বুনেই তরবারিও উত্তোলন করেছে। যদিও সাম্য, বাকস্বাধীনতা ও মুক্তির ক্ষান্ত হয়নি; বারবার সরকার ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আকাঙ্ক্ষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের সবসময়ই ক্ষমতাসীনদের তরবারির কাছে পরাজিত হতে হয়েছে, তবু বারত্ব ও দৃঢ়চেতা মনোভাব তাদের মতবাদ দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে রাখে, এখনও যা বিদ্যমান। রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের ধারণাসমূহ এযুগের নিহিলিস্ট (Nihilist) তথা নাস্তিবাদে বিশ্বাসীদের মতই ছিল।

৭৭ হিজরীতে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ছিলেন শামের খলিফা। আর হাজ্জাজ সাকাফি ইরাকের গভর্নর। তখন শাবিব খারেজি সিরিয়ার মসুলে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধসমূহে তার স্ত্রী গাযালা ও মা জাহিযাও অংশগ্রহণ করত। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শাবিবকে দমন করার জন্য একের পর এক পাঁচজন সেনাপতি পাঠায়। কিন্তু একজনও ময়দান থেকে ফিরে আসতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আব্দুল মালিক শাম থেকে বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদের নিয়ে হাজ্জাজ নিজেই বের হয়। মসুল

থেকে শাবিব কুফা অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু হাজ্জাজ তার পূর্বেই কুফা পৌঁছে সেখানকার রাজপ্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করে। গাযালা মান্নত করেছিল কুফার জামে মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়বে।

দিনের কিছু সময় অতিবাহিত হলে গাযালা মাত্র সত্তর জন মানুষ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে জামে মসজিদে আসে, অথচ পুরো শহর তার শত্রুতে ভরপুর। কুফা শহরে খোদ শামের বাহিনী গিজগিজ করছে। শাবিব উন্মুক্ত তরবারি হাতে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যায় এবং গাযালা মসজিদের ভিতর গিয়ে নিশ্চিন্তে দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়। তাও মামুলি নামায নয়, প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা ও দ্বিতীয় রাকাতে সে সূরা আলে-ইমরান পড়ে, যে দুটির চেয়ে বড় সূরা পবিত্র কুরআনে নেই। দুই-আড়াই পারায় একেকটি সূরা সমাপ্ত হয়েছে। গাযালা নামাজ শেষ করে শত্রুদলের চোখের সামনেই নিজেদের শিবিরে ফিরে যায়।

যুদ্ধ শুরু হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুফা, বসরা ও শামের বাহিনী নিয়ে বের হয়। শাবিবের দল তাদের চেয়ে নেহাত কম হলেও তারা চরম বীরত্বের সাথে লড়াই করে। হাজ্জাজ নিজেই সৈন্যবাহিনীর পেছনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিল। অগ্রসর হতে হতে তারা খারেজিদের মসজিদ কব্জা করে। গাযালা ও জাহিযাও লড়াইরত ছিল। হাজ্জাজ চুপিসারে পেছনের দিক থেকে মানুষ পাঠায় যারা আড়াল থেকে আক্রমণ করে গাজালাকে হত্যা করে। শাবিব নিহতদের ফেলে আহওয়াজের দিকে চলে যায়।

ইবনে খাল্লিকানের মতে, শাবিবের মা জাহিযাও এই যুদ্ধে নিহত হয়। কিন্তু ইবনুল আসির ও তাবারি রহ. বলেন, এর কিছু দিন পর যখন শাবিবের ঘোড়া হোঁচট খেয়ে সেতু থেকে দজলা নদীতে পড়ে যায় এবং শাবিব তার বর্ম ও হাতিয়ারের ভারে ডুবে মারা যায় তখন কেউ তার মাকে গিয়ে বলে, শাবিব মারা গেছে। তার মা বলে, 'শাবিব মারা যাবে? এ হতে পারে না।' পরে দ্বিতীয় দিন যখন বলা হয়, না, সে পানিতে ডুবে মারা গেছে-তখন তার মা বলে, 'এটা হতে পারে'। এ ঘটনা থেকে শাবিবের মায়ের বীরত্বের যেমন অনুমান করা যায়, তেমনি জানা যায় যে, তার মা তখনও জীবিত ছিল। কিন্তু হাজ্জাজ তার মোকাবেলায় টিকতে না পেরে পলায়ন করে। কোনো কোনো লড়াইয়ে হাজ্জাজ ও গাযালা মুখোমুখি হয়েছিল, অথচ এই হাজ্জাজের ভয়েই কাঁপত

সারা ইরাক ও হেজায়। একজন কবি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাজ্জাজকে ব্যঙ্গ করে নিম্নোক্ত কবিতা

রচনা করেন-

فَتَخَاءُ تَنْفُرُ مِن صَغيرِ الصافر

اسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُروبِ نَعَامَةٌ

بل كان قلبك في جناحي طائر

هلا بَرَزْتَ إِلى غزالة في الوَغَى

'হাজ্জাজ, নিরস্ত্র আমার ব্যাপারে তুমি হিংস্র সিংহ হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি উটপাখির মতন ভীরু। বাঁশি বেজে উঠতেই তুমি ভয়ে পাংশুমুখে পালিয়ে যাও। গাযালার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুমি কেন বের হতে পারোনি? আরে, তুমি তো ভয়েই ছটফট করছিলে!”

১৩৯ হিজরীতে খলিফা মনসুরের রাজত্বকালে রোম সম্রাট মালাতিয়া নগরী আক্রমণ করে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। খলিফা মনসুরও কায়সারকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান। সালেহ বিন আলি ও আব্বাস বিন মুহাম্মদ ছিলেন এই বাহিনীর সেনাপতি। তারা পৌঁছে প্রথমেই মালাতিয়া নগরী পুনর্গঠন করেন। এরপর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন কনস্টান্টিনোপলের দিকে। পদানত করেন সম্রাট কায়সারের অনেক শহর। সেই বাহিনীতে ছিলেন সেনাপতি সালেহের বোন ও খলিফা মনসুরের ফুফু উম্মে ঈসা বিনতে আলি ও লুবাবা বিনতে আলি। তারা মান্নত করেছিলেন বনু উমাইয়ার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা জিহাদ করব। তাই মান্নত পূরণ করার জন্য তারাও এই জিহাদে শরিক হয়েছিলেন।

১৭৮ হিজরীতে খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে বিদ্রোহী খারেজি ওয়ালিদ বিন তারিফ খাবুর ও নাসিবিন নগরদ্বয়ে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। দরবারের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ইয়াজিদ শাইবানিকে সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠানো হয়। কয়েকবার

লড়াইয়ের পর খারেজিরা পরাজিত হয় এবং ওয়ালিদ মারা যান। ওয়ালিদের বোন ফারি'আ যখন তার ভাইয়ের অবস্থা জানতে পারেন-তৎক্ষণাৎ শিরস্ত্রাণ পরিধান করে হাতিয়ার তুলে নেন। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শাহী ফৌজের ওপর তিনি হামলা করেন। ইয়াজিদ অন্যদেরকে সরিয়ে নিজেই তার মুখোমুখি হন এবং ফারি'আর ঘোড়াকে একটি তীর দ্বারা আঘাত করে বলেন, 'আপনি কেন নিজের বংশের দুর্নাম করছেন? ফিরে যান।' ফারি'আ ময়দান থেকে ফিরে গেলেন, তার চোখ ছিল অশ্রুসজল, তিনি স্বরচিত মর্মান্তিক কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন-

'হে খাবুর নগরীর বৃক্ষরাজি! ওয়ালিদ বিন তারিফের মৃত্যুর পরও তুমি সবুজ পত্রশোভিত রয়ে গেলে, তোমার মাঝে কোনো অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না যে? সে তো ছিল এমন যুবক, যার পাথেয় কেবলই তাকওয়া-পরহেজগারী, সম্পদ বলতে সে পছন্দ করত শুধুই তীর ও তরবারি। হে ওয়ালিদ! আমরা তোমাকে যৌবনের মতই চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি। হায়! আমরা যদি হাজারো যুবক তোমার জন্য উৎসর্গ করতাম! ওয়ালিদের ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। মৃত্যু তো প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে একদিন আসবেই।'
সাহিত্যবিশারদ একে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপমা হিসেবে গণ্য করেন। এই শোকগাথা এতই উচ্চাঙ্গের ও আবেগপূর্ণ যে, আধকাংশ আবু আলি কালি রহ. তার 'আমালি' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এই কবিতার প্রথম পঙক্তি এত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে, তাকে আরবি অজ্ঞতার ভান করা'র (Aphtosis) উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ ভাষাশৈলীর একটি বিশেষ রূপ-'জ্ঞাতসারে সমপর্যায়ের। তিনি বলেন, ওয়ালিদের এই বোনের নাম ফাতেমা বা ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, এই শোকগাথা খানসার কবিতার ফারি'আ।' ইবনুল আসির রহ. বলেছেন—তার নাম 'লাইলা'। ইবনে খালদুন রহ. এই ঘটনা উল্লেখ করলেও কোনো নাম উল্লেখ করেননি। নাম যাই হোক, আমাদের প্রয়োজন তার কর্ম।

***

মধ্যযুগে ক্রুসেড-উন্মাদনা শুধু পুরুষদের স্পর্শ করেনি, খ্রিস্টান মহিলারাও আবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। ইমাদ আল-কাতিবের হিসাব অনুযায়ী অসংখ্য খ্রিস্টান মহিলাও

ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ক্রুসেড মোকাবেলার যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল মহিলারাও তার প্রভাবমুক্ত ছিল না। উসামা নামে একজন মুসলিম আমির ক্রুসেডবিরোধী যুদ্ধে শরিক হলে তার মা-বোনও তার সঙ্গ দেন। দুজনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং খ্রিস্টানদের ওপর হামলা করতে তাকে সাহায্য করতেন।

মুসলিম মায়েদের এ ধর্মীয় চেতনার ফলে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় শিশু কিশোররাও। খ্রিস্টানরা দীর্ঘ সময় আক্কা অবরোধ করে রেখে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে দীর্ঘদিনের সহাবস্থানের ফলে মুসলমানদের সাথে তাদের একপ্রকার সম্পর্কও গড়ে ওঠে। তারা প্রস্তাব রাখে, মুসলিম শিশু ও খ্রিস্টান শিশুর মধ্যে মল্লযুদ্ধ হওয়া উচিত। একদিক থেকে দুজন মুসলিম শিশু ও অপরদিক থেকে দুজন খ্রিস্টান শিশু বের হয়। দীর্ঘক্ষণ মোকাবেলা চলতে থাকে। শেষমেশ এক মুসলিম শিশু তার কোমল হাতে এক খ্রিস্টান শিশুকে ধরাশায়ী করে ভেড়াশাবকের মতো বেঁধে ফেলে।'

***

ইসলামের সমৃদ্ধ ইতিহাসে হিন্দুস্তানের নাম তেমন উচ্চারিত না হলেও মুসলিম নারীর বীরত্বগাথার আলোচনায় হিন্দুস্তানের নাম আসবে অসংখ্যবার। হিন্দুস্তানের ইসলামি ইতিহাসে এমন অনেক মহিলার নাম ভাস্বর হয়ে আছে, যাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবল পুরুষদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল।

শাহ ইলতুৎমিশের মেয়ে রাজিয়া সুলতানার রাজত্বকাল অন্যদের তুলনায় কম হলেও সর্বাগ্রে তিনিই উল্লেখযোগ্য। ইবনে বতুতা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনকালে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। তিনি লিখেন, রাজিয়া পুরুষোচিত পোশাক পরিধান করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে বাইরে বের হতেন। ভারতের সম্রাটগণের রীতি ছিল, তারা শিকারে বের হলে সকল বেগম ও দাসীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদা ইলতুৎমিশ সিংহ শিকারে যান। বেগমরা ছিলেন তার পেছনে। একটি সিংহ বের হয়ে বাদশাহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি রাজিয়া ঘটনাস্থলে না পৌঁছতেন বাদশাহ

ভীষণ আহত হয়ে যেতেন। সিংহহৃদয় রাজিয়া তৎক্ষণাৎ তরবারি নিয়ে সিংহের ওপর এমন হামলা করেন যে, সেটি আধমরা হয়ে পড়ে যায়।

পিতা ইলতুৎমিশের পর শাসনভার গ্রহণ করে রাজিয়া এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে, রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তার ভয়ে কাঁপতেন। কিছু আমির-উমারা নিজ কর্তৃত্ব আর চলছে না দেখে তার বিরোধিতা করতে শুরু করেন। সাম্রাজ্যের উজির নিজামুল মুলুক, মালিক ইজ্জুদ্দীন, মালিক সাইফুদ্দীন, মালিক আলাউদ্দীনসহ যারা সাম্রাজ্যের ডান হাত ছিল তারা সকলেই তার বিরোধী হয়ে যায়। নিছক মৌখিক বিরোধিতা নয়, তারা সৈন্য নিয়ে দিল্লী থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাজিয়ার সাহায্যের জন্য যারা বাহির থেকে আসত তাদেরকে তারা ছত্রভঙ্গ করে দিত। কিন্তু রাজিয়া একাই নিজের কৌশল ও শৌর্য-বীর্যে তাদেরকে এমন দিশেহারা করে রাখতেন যে, তারা এদিক সেদিক মার খেত, কিন্তু কোথাও আশ্রয় পেত না। ৬৩৭ হিজরীতে লাহোরের শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি নিজেই ফৌজ নিয়ে বের হন। এরপর বাথিন্দার গভর্নর অবাধ্যতা করলেও তিনিই ফৌজ নিয়ে বের হন। কিন্তু নিজ কর্মচারীদের চক্রান্তের কারণে তিনি পথিমধ্যে গ্রেফতার হন। তারপর দিল্লির জনগণ তার স্থানে তার ভাই মুয়িজুদ্দিনকে বাদশাহ পদে বসায়। রাজিয়া মুক্ত হয়ে নতুন করে আবার সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং কয়েকবার দিল্লির বিরুদ্ধে লড়াই করেন, কিন্তু যেহেতু রাজিয়ার বাহিনী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং সৈনিকগণও নতুন ভর্তিকৃত-তাই তারা পরাজিত হয়।'

***

এরই ধারাবাহিকতায় একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল আলাউদ্দীন খিলজির যুগে। হিন্দুস্তানে ইসলামের ইতিহাসকে যা নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। দিল্লির সুলতানদের মাঝে আলাউদ্দিন খিলজি এক উজ্জ্বল নাম। তার চেহারায় ফুটে থাকত অবিচলতা, চিন্তার উৎকর্ষ ও জৌলুসপূর্ণ অভিব্যক্তি। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তাতারীদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছিলেন যাদের বাগদাদ-খাওয়ারিজমের মজবুত

কেল্লাও রুখতে পারেনি, চীনের সুউচ্চ প্রাচীর বাধা দিতে পারেনি, দমন করতে পারেনি রুশ বা ইরানি পরাশক্তি। তখন আলাউদ্দীন খিলজি কল্পনা করতেন সুলতান ইস্কান্দরের

মত দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যের। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেন, এখন হিন্দুস্তানে এমন কোন রাজ্য নেই-যা আমার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে পারে। 'জালুর' কেল্লার রাজা 'কানিরদেব' রাজদরবারে উপস্থিত ছিল। সে অত্যন্ত হঠকারিতার সঙ্গে অহংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, 'জালুর' কেল্লা কখনো অনুগত হতে পারে না।

সুলতান নাখোশ হলেও উপস্থিত একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি, দু'তিন দিন পর রাজাকে দিল্লি থেকে বিদায় দেন এবং সময় দিয়ে বলেন, জালুরকে যতটুকু পারো নিরাপদ করো। কয়েক মাস পর সুলতান তার এক বাঁদী 'গুলে বেহেশত'কে সেনাপতি বানিয়ে জালুর অভিমুখে প্রেরণ করেন। গুলে বেহেশত তার বাহিনী নিয়ে ঝড়ের গতিতে জালুর পৌঁছয়। রাজা তার মোকাবেলা করতে না পেরে কেল্লার ফটক বন্ধ করে দেয়। গুলে বেহেশত রাজাকে অবরুদ্ধ করে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে কেল্লা আক্রমণ শুরু করে যা ছিল রাজার কল্পনাতীত। অল্পক্ষণের মধ্যে কেল্লা বিজয় হওয়ার কথা; কিন্তু হঠাৎ গুলে বেহেশত অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতা এত প্রচণ্ড ছিল যে, তার আর বিছানা ছেড়ে উঠা হয়নি। গুলে বেহেশত সব করতে পেরেছিল, কিন্তু মৃত্যুর আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি। তার মৃত্যুতে রাজা যেন সিংহে পরিণত হয়। কেল্লার ফটক খুলে সে শাহী ফৌজকে অনেক পেছনে হটিয়ে দেয়। গুলে বেহেশতের পুত্র শাহিন রাজার হাতে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত দিল্লি থেকে নতুন সেনাপতি কামালউদ্দিন এসে জালুর জয় করে।'

***

সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর শুরুভাগে পৃথিবাতে এক অভিনব সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে একটি ঘূর্ণিবায়ু ধেয়ে আসে। দুলে ওঠে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কেমন ছিলেন আমির তৈমুর লং? তুর্কিস্তানের তুর্কিদের মজবুত সালতানাত। কেঁপে ওঠে দামেস্ক ও আরবভূমি। তুঘলক বংশের জাদুর চেরাগও নিভে যায় এই ঝড়ে। আর সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে ওঠে পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্য-ভারতবর্ষের ইতিহাসে যা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য। এই বিজয়ের ফল যদিও তৈমুরের বংশধরগণ সোয়াশ বছর পর আহরণ করে, তবু এই সময়ের সৈয়দ ও লোদীদের রাজত্বও সেই তৈমুর-বংশের ইতিহাসেরই ভূমিকা ছিল। যার শিরোভাগে উজ্জ্বল হয়ে আছে লোদীদের বিরুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি জহিরুদ্দীন শাহ বাবরের জয়লাভ।

এই জয়যাত্রায় নারীদের কি কোনো ভূমিকা ছিল না? তৈমুরের বিপ্লবী সৈন্যদের মধ্যে অনেক নারী ছিল, যারা ময়দানে লড়াই করত, রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীরপুরুষদের মোকাবেলা করত, তরবারি চালাত এবং বল্লম-তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করত। মোটকথা, কোনো ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের চেয়ে কম ছিল না। তৈমুর-বংশের সোনালি ইতিহাসে সেই নারীদের কীর্তি কি চির ভাস্বর নয়?'

তৈমুর বংশের শাহজাদারা প্রত্যেকে মহাবীর ছিল, একই বংশের শাহজাদিদেরকে তাদের চেয়ে ভিন্ন দাবী করা অন্যায় নয় কি? বাবরনামা, হুমায়ুননামা ও তুজুকে-জাহাঙ্গীরী সর্বত্র দেখা যায়-তৈমুর-নারীরা অস্ত্র চালনা করতেন ও ঘোড়ায় সওয়ার হতেন, শিকার করতেন ও বাঘ মারতেন, হকি খেলতেন ও তীরন্দাজী করতেন। মোটকথা, সমরশাস্ত্রে তারা খুব সচেতন ছিলেন। তুজুকে-বাবরী পাঠ করলে বোঝা যায়, বাবরের কাবুল, সমরকন্দ, ফারগানা ইত্যাদি বিজয়ে নারীদের অবদান ছিল।

নুরজাহান তৈমুর বা বাবর বংশের ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই বংশে নবাগত বধূ। নুরজাহান প্রায়ই হাতির ওপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ ও শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে যেতেন। তিনি একটিমাত্র গুলি করে সিংহ বধ করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তুজুকে জাহাঙ্গীরীতে লিখেন, 'একদিন আমি শিকারে বের হই। একটি হাতির ওপর ছিলাম আমি ও রুস্তম খাঁ, আরেক হাতির ওপর ছিল নুরজাহান। সামনে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটি সিংহ। সিংহের ঘ্রাণ পেয়ে হাতি কাঁপতে থাকে। এই তীব্র চাঞ্চল্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নির্ভুল নিশানা করা; তাও হাওদায় বসে-নেহায়েত কঠিন। শিকারের নিশানার ক্ষেত্রে আমার পর রুস্তম খাঁ অদ্বিতীয়। কিন্তু প্রায়ই হাতির ওপর বসে তার নিশানা তিন-চারবার ভুল হয়ে যায়, অথচ নুরজাহান হাওদায় বসে বসে প্রথম ঝড়েই সিংহকে কুপোকাত করে ফেলে।"

নুরজাহান একবার বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সাথে শিকারে বের হন। হঠাৎ সামনে চারটি সিংহ বের হয়ে আসে। কিন্তু নুরজাহানের কপালে সামান্য ভাঁজও পড়েনি। তিনি খুব ধীরস্থিরচিত্তে বন্দুক চালান। দুইটি সিংহকে এক একটি গুলি আর অপর দুটিকে দুই দুইটি গুলি করে শেষ করে দেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর অত্যন্ত খুশী হয়ে নুরজাহানকে

অনেক মূল্যবান অলঙ্কার পুরস্কার প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ একজন কবি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

نور جہاں گرچہ بصورت زن است در وصف مردان زن شیر افگن است

'নূর জাহান আকৃতিতে যদিও নারী, কিন্তু পুরুষের গুণধন্য, আফগান সিংহের স্ত্রী।'

নুরজাহান যেহেতু প্রথমজীবনে শেরে আফগান আলি কুলি খানের স্ত্রী ছিলেন তাই زن ظن)আফগান সিংহের স্ত্রী) কথাটি কবিতাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
জাহাঙ্গীরের ক্ষমতার শেষভাগে নুরজাহানের ভাই আসফ খানের সঙ্গে সেনাপতি মহাবত খানের দ্বন্দ্বের কারণে' নুরজাহান ও বাদশাহ জাহাঙ্গীর উভয়ে মহাবত খানের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না। আসফ খান মহাবত খানকে অপমানিত করতে চেষ্টারত ছিলেন। কাশ্মীর সফরে জাহাঙ্গীর ঝিলাম নদীর তীরে মহিলাদের তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আসফ খান একদিন আগেই নদীর ওপারে চলে গেলে বিদ্রোহী মহাবত খান এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার করেন। নুরজাহান সুযোগ বুঝে নদীর ওপারে গিয়ে সৈন্যদের সাথে মিলিত হন। সেখানে তিনি মন্ত্রীবর্গকে তলব করে ভর্ৎসনা করেন; তাদের বলেন, 'শুধু তোমাদের অসর্তকতার কারণেই বাদশাহ বন্দী হলেন।' তারা একবাক্যে বললেন, 'আগামী কাল আপনার নেতৃত্বে পুরো রাজকীয় বাহিনী নদী পার হয়ে যেভাবে হোক বাদশাহের পদচুম্বন করবে-এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সমীচীন হবে।'

সকালবেলা সকল সৈনিক তৈরী হয়। মহাবত খান প্রথমেই সেতু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সৈনিকরা হাতি ও ঘোড়াসমেত নদীতে নেমে পড়ে। নুরজাহানও সওয়ার হন একটি হাতির ওপর। নুরজাহানের সাথে শাহজাদা শাহরিয়ারের বোন ও শাহনেওয়াজ খানের কন্যাও ছিলেন। সৈন্যদল নদীতে থাকতেই মহাবত খান আক্রমণ করে বসে। সৈনিকেরা তো নদীতে এমনিতেই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, এতে তারা একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রচণ্ড বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।নুরজাহান খাজা আবুল হাসান ও মুতামিদ খানকে বলে পাঠান-'তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখছ কেন? পাল্টা আক্রমণ করো।' ততক্ষণে মহাবত খানের সৈনিকেরা নুরজাহানের হাতি ঘিরে ফেলে। নুরজাহানের হাওদা তীরের লক্ষ্যে

পরিণত হয়ে যায়। একটি তীর হাওদার ভেতর চলে আসে। নুরজাহানের বাহু আহত হয়ে পুরো কাপড় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। শাহজাদি নিজ হাতে তীর বের করে ফেলে দেন। নুরজাহানের সাথে খাজা সাহেবও ছিলেন, তিনিও সাহায্য করেন। নুরজাহানের হাতি ভীষণভাবে আহত হয়ে পলায়ন করে। শেষে অনেক কষ্ট করে তিনি নিজ তাঁবুতে ফিরে যান। যদি হাতি নিয়ন্ত্রণে থাকত তাহলে নুরজাহান লড়াই চালিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হতেন না।'

নারী-শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

নারীদের শিক্ষার্জন ও তাদের শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। অর্থাৎ, শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদানের পাশাপাশি এর প্রক্রিয়ায়ও পার্থক্য রাখা দরকার। প্রথমটি অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণ নিঃন্দেহে জায়েজ। শুধু জায়েজ নয়, নারীর জন্য যেটুকু ওয়াজিব সে পরিমাণ ইলম অর্জন ওয়াজিব, যেটুকু মুসতাহাব, ওই পরিমাণ ইলম অর্জন মুসতাহাব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল মুসলিমের জন্য ইলম অর্জন ফরজ। এখানে মুসলিম শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় নারী-পুরুষ উভয় জাতিই উদ্দেশ্য। যেভাবে 'সত্যিকার মসলিম সেই, যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে'-হাদিসে মুসলিম দ্বারা নারী-পুরুষ উভয় জাতি উদ্দেশ্য, এখানেও তাই।'(সহিহ বুখারী)

নবীজির যুগেও নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল। নবীজি নিজে তাদের দীনি বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, একবার নারীরা নবীজির কাছে এসে বলেন, আপনার কাছে তো পুরুষরা প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন, তাই আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। নবীজি তাদের একটি বিশেষ দিনের অঙ্গীকার করলেন। সেদিন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের কিছু নসিহত করেন এবং নির্দেশ দেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল- তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান পূর্বেই পাঠাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন জনৈক নারী বলেন, আর দুটি পাঠালে? তিনি বলেন, দুটি পাঠালেও।(সহিহ বুখারী:১০১)

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এখানে 'আপনার কাছে তো পুরুষরা প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন' কথাটির অর্থ হচ্ছে পুরুষরা তো প্রতিদিন আপনার কাছে আসেন, তারা আপনার থেকে দীন ও শরিয়তের প্রয়োজনীয় ইলম জেনে নেন। আমরা দুর্বল নারীসমাজ, আমরা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি না। তাই আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, ওই দিন আমরা আপনার থেকে দীন শিখব। এখানে নারীদের প্রশ্ন এসেছে দীন সম্পর্কে। এটি প্রমাণ করে প্রয়োজনে নারীরা পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে।(উমদাতুল কারি:২/১৩৪)

কেনই-বা নারীদের জন্য দীন শিক্ষা জায়েজ হবে না, অথচ তারা জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞান মোতাবেক আমল করতে নির্দেশিত। এর মাধ্যমেই তাদের মানব সত্তা ও মর্যাদা পূর্ণতা পায়। আল্লাহ তায়ালা সূরা জুমার ৯ নং আয়াতে বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولوا الألباب 'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।'
অন্যত্র বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আর আল্লাহ শেখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম।'(সূরা বাকারা:৩১)

এখানে আল্লাহ আদম আ.-এর মর্যাদা ও ইলমের মাধ্যমে তার খেলাফতের অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। এখানে তাশদিদ যোগে 'আল্লামা' শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিত করে-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদান এবং জানানো। আবু সাইদ বলেন, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদান হচ্ছে ওই কাজ মাধ্যম ছাড়াই যার ওপর ইলম নির্ভর করে থাকে। যা কেবল শিক্ষাদাতার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং এর জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে গ্রহণ ও আত্মস্থ করার যোগ্যতা থাকতে হয়। তবে এ পদ্ধতি শোনানো এবং জানানোর মধ্যে নিহিত থাকে। জানানো ও শোনানো এমন দুটি বিষয় যার মধ্যে মানবজাতি ও ফেরেশতাকুল সবাই অন্তর্ভুক্ত। একারণেই আদম আ. ফেরেশতাদের চেয়ে খেলাফতের ক্ষেত্রে

অগ্রাধিকার পেয়েছেন। কারণ, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টির বিস্তারিত ইলমের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। অথচ আদমকে তার প্রয়োজন মতো বস্তুর নাম ও কাজসহ বিস্তারিত ইলম দান করেছেন। বস্তুর অবস্থা, বৈশিষ্ট্য ও উপযুক্ততা শিখিয়েছেন।

নারীদের লেখালেখি

নারীদের লেখালেখির ব্যাপারে অধিকাংশ ফকিহ বৈধতার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আয়েশা রা.-এর হাদিস হচ্ছে, তাদেরকে কামরায় আটকে রাখবে না, লেখালেখি শেখাবেন না; বরং তাদের চরকায় সুতা কাটা এবং সুরা আন নূর শেখাবেন।"(মুসতাদরাক,হাকিম:৩৪৯৪)
কিন্তু আলেমগণ একে দুর্বল বলেছেন। কেননা, তাবারানির রেওয়ায়েতের সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়, তিনি হাদিস জাল করতেন। হাকিমের সনদে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে জাহহাক সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, আবদুল ওয়াহহাব ইবনে জাহহাক ইবনে আবান উরজি আবুল হারিস হিমসি সালামিয়ার অধিবাসী রাবি হিসেবে পরিত্যাজ্য। আবু হাতিম তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছেন।'(তাকরিবুত তাহজিব:৩৬৮)

ইবনু জাওজি রহ. তার মাওজুআত গ্রন্থে লেখেন, হাদিসটি সহিহ নয়। তবে আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরি একে তার সহিহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ এর দুর্বলতার দিকটি কীভাবে তার কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আবু হাতিম ইবনে হিব্বান বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম শামি হাদিস গড়ে নিতেন। তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ ঠিক নয়।

ইবনু কায়সারানি তার তাজকিরাতুল হুফফাজ গ্রন্থে লেখেন, এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম শামি শুআইব ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আয়েশা রা. থেকে। এই মুহাম্মাদ ইরাকি ছিলেন, লোকজন তাকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছিলেন। তিনি শামবাসীদের কাছে হাদিস গড়াপেটা করতেন।

তবে সহিহ হাদিসে আবু বাকার ইবনে আবু হাসমা শিফা-উমর রা.-এর চাচাতো বোন থেকে বর্ণনা করেন, আমি হাফসার কাছে ছিলাম। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, তুমি ওকে যেভাবে লেখা শিখিয়েছ সেভাবে পিঁপড়ার ঝাড়ফুঁক শেখাও না কেন? আইনি রহ. বলেন, হাদিসটি নারীদের জন্য লেখালেখি মাকরুহ না হওয়ার দলিল।"

নারীদের শিক্ষার্জন ও শিক্ষকতার ধরন

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে নারীরা কীভাবে শিক্ষার্জন করবে এবং শিক্ষা দেবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয়। এর জন্য আগে একটি ভূমিকা উপস্থাপন দরকার। সেটি হচ্ছে, শরিয়তের বিধানদাতা নারীদের শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে জাহিলি-যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।'(সূরা আহজাব:৩৩)

রুহুল বায়ান-এর লেখক লেখেন, এর অর্থ-হে নারীসমাজ, তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঘরে অবস্থান করো। নিজেদের অবস্থান আঁকড়ে ধরো। এখানে যদিও নবীর স্ত্রীগণকেউ আছে, উম্মাহাতুল মুমিনিনদের মধ্যে সাওদা বিনত জামাআ ভুলেও নামাজ, কিংবা হজ সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এই নির্দেশের মধ্যে পুরো নারীসমাজ অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত অথবা উমরার জন্য দরজার বাইরে যাননি, এ অবস্থায়ই উমর রা.-এর শাসনামলে ঘর উমরা করেন না। জবাবে বলেছিলেন, আমাদেরকে তো বলা হয়েছে وقرن فى بيوتكن থেকে তার জানাজা বের হয়। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেন হজ ও তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে।

কুরতুবি রহ. লেখেন, ইসলামি শরিয়াহ নারীদের ঘরে অবস্থানের দলিল দ্বারা পরিপূর্ণ নারীদের শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্মান জানাতেই আল্লাহ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, বোঝা যাচ্ছে নারীদের জন্য ঘরে অবস্থানই হচ্ছে তাদের সম্মানের নিদর্শন। কুরতুবি রহ. লিখেছেন, আয়াতে প্রথম জাহিলিয়াত দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এ নিয়ে মুফাসসিরগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারে ইবনে আতিয়্যার উক্তিই সঠিক মনে হয়। তিনি বলেন, এর দ্বারা তারা যে জাহিলিযুগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেটিই উদ্দেশ্য। ফলে তাদেরকে ওই কালের আদত তথা জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হয়। সেটি ছিল শরিয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী কুফুরিকালের জীবনধারা। তখন তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল না। তখনকার নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথার বালাই ছিল না। এখানে প্রথম বলা হয়েছে মূলত বর্তমান অবস্থার মোকাবিলায়। এই প্রথম দ্বিতীয়ের মোকাবিলায় নয়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় কোনো জাহিলিয়াতের কাল ছিল না।

তবে ইমাম জাসসাস রহ. বলেছেন, দ্বিতীয় জাহিলিয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পরও কুফুরিকালের মতো আচরণ করছে। আমার মতে বর্তমান সময়কালকে দ্বিতীয় জাহিলিয়াতকাল বলা যেতে পারে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নারী হচ্ছে গোপনীয় বস্তু, সে যখন ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তার দিকে উঁকি দিয়ে তাকায়। নারীর জন্য আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হচ্ছে সে তার ঘরে অবস্থান করবে।(সহিহ ইবনু হিব্বান:৫৫৯৮)

অতএব, বলা যায় নারীর সংশোধন ও কল্যাণ ঘরের মধ্যেই নিহিত। এমনকি নবীজি তাদের জন্য ঘরের ভেতর নামাজ আদায়কে মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় থেকে উত্তম বলেছেন।আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা থেকে বর্ণিত,নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীর জন্য ঘরের অভ্যন্তরে নামাজ আদায় বৈঠকখানায় নামাজ আদায় থেকে উত্তম এবং প্রকোষ্ঠে নামাজ আদায় সাধারণ থাকার ঘরে নামাজ

থেকে উত্তম বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আদায় থেকে উত্তম।(সুনানে আবু দাউদ:৫৭০)

আল্লামা আইনি বলেন, ইবনুল আসির বলেছেন, হাদিসে উল্লিখিত 'মাখদা'র অর্থ হচ্ছে ছোট্ট প্রকোষ্ঠ। এটি হচ্ছে বড় ঘরের ভেতর থাকা ছোট্ট কামরা। বড় ঘর অপেক্ষা প্রকোষ্ঠে নামাজ পড়া, অনুরূপ বৈঠকখানা অপেক্ষা সাধারণ গৃহে নামাজ পড়া এজন্য উত্তম যে, এটা পর্দা রক্ষার জন্য অধিকতর উপযোগী। মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম উপায়। কারণ, তাদের অবস্থান হচ্ছে পর্দার অন্তরাল।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহর রাসুল জানতেন যে, নারীরা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনি ইসরাইলের নারীদের যেমন বারণ করা হয়েছিল, তেমনই এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন।

হাফিজ আইনি বলেন, আয়েশা রা.-এর উক্তি 'তারা কী শুরু করেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য প্রদর্শন, সুগন্ধি ব্যবহার, আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান ইত্যাদি। আমি বলি আয়েশা রা. যদি বর্তমান যুগের নারীদের বিশেষ করে শহুরে নারীদের বিভিন্ন প্রকার বিদআত ও নিষিদ্ধকাজে লিপ্ত হওয়ার অবস্থা দেখতেন, তাহলে আরও কঠিনভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। তাদের মধ্যে যে পরিমাণ বিদআত ও নোংরামি দেখা দিয়েছে তা বলা দুঃসাধ্য। এত নিষিদ্ধ কাজ প্রকাশ পেয়েছে যেন তা নিষিদ্ধ নয়। অতএব, আবার সিদ্দিকা রা.-এর উক্তি- 'নারীরা যা শুরু করেছে তা যদি আল্লাহর রাসুল দেখতে পেতেন' প্রতি লক্ষ করুন, উক্তিটি কিন্তু তিনি নবীজির ইন্তেকালের অল্পদিন পরে করেছিলেন। নিশ্চয় সেই সোনালি যুগে নারীরা যে অবস্থা সৃষ্টি করেছিল তা ছিল বর্তমান যুগের নারীদের অবস্থার হাজার ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম।

আমি বলব, ৮৫০ হিজরিতে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী আল্লামা আইনির যুগের নারীদের অবস্থা যদি অনুরূপ হয়, তাহলে বর্তমানযুগের নারীদের অবস্থা যে লক্ষ গুণ বেশি ফাসাদযুক্ত হবে একথা বলাই বাহুল্য। একারণেই পরবর্তী যুগের আলেমগণ ফাতাওয়া দিয়েছেন, সর্বাবস্থায় নারীদের জন্য জামাতে অংশগ্রহণ করা মাকরুহ। হাসকাফি রহ. বলেন, যে অভিমতের ওপর ফাতাওয়া, সেটি হচ্ছে নারী বৃদ্ধা হলেও তার জন্য জুমা ও ঈদ কিংবা ওয়াজের জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ। কারণ, পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লামা ইবনে আবেদিন বলেন, 'নারী বৃদ্ধা হোক কিংবা যুবতি, রাতে পরবর্তী আলেমদের গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়া। তারা বলেছেন, যুবতি নারীদের বের হওয়া বের হোক বা দিনে,' এটিই সাধারণ হুকুম, এটিই পরবর্তী আলেমদের

অভিমত। বাহরুর বায়িকে বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা ও সাহিবাইনের মতের বিপরীত হলেও এটিই সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। বৃদ্ধার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার উক্তি হচ্ছে, সে জুহর, আসর এবং জুমার জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সাহিবাইন বলেন, বৃদ্ধারা সকল নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বৃদ্ধাদের নিষিদ্ধের ফাতাওয়া যেহেতু পুরো বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করে এজন্য আবু হানিফা রহ.-এর অভিমতই প্রাধান্য পাবে। তবে আন-নাহার কিতাবে বলা হয়েছে, অভিমতটি বিতর্কযোগ্য। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত। নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হলো, নারীর মধ্যে পাপে লিপ্ত হওয়ার উত্তেজক কারণসমূহের উপস্থিতি। যেহেতু মাগরিবের সময় লোকজন থাকে পানাহারে আর ইশা ও ফজরে ঘুমন্ত থাকে, তাই সময়টি কিছুটা নিরাপদ। যখন উত্তেজক অবস্থাকেই নিষিদ্ধের কারণ ধরা হয়েছে তাই আমাদের এই নষ্ট সময়ে সর্বক্ষণই যে, নিষিদ্ধ হওয়া দরকার এটি সহজেই অনুমেয়।

ইবনু নুজাইম বলেন, লেখক কাফি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-বর্তমানে পাপাচার ব্যাপক হয়ে পড়ায় নিষিদ্ধতার হুকুমটি সর্বক্ষণের জন্য প্রযোজ্য। অতএব, যেহেতু নামাজে অংশগ্রহণ মাকরুহ, তাই ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ যে মাকরুহ হবে তা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে লেবাসধারী মূর্খ আলেমদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ফখরুল ইসলাম রহ. তাই বলেছেন।

উল্লিখিত ভূমিকা থেকে প্রতীয়মান হয়, নারীদের জন্য নিজেদের ঘরে মাহরাম আত্মীয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ উত্তম। তাদেরকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব মূলত তাদের অভিভাবকদের। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ

'মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ-হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।'(সূরা তাহরিম:৬)

তাফসীরে খাজিনিতে قُوا أَنفُسَكُمْ 'তোমরা নিজেদের রক্ষা করো'-এর তাফসিরে বলা চরছে, ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'বিরত থাকবে যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন এবং আমল করবে তার আনুগত্যের ক্ষেত্রে।' আর أَهْلِيكُمْ 'পরিবার-পরিজন' দ্বারা প্রদেশ্য হচ্ছে তাদেরকে কল্যাণের নির্দেশ দাও। মন্দকাজ থেকে বিরত রাখো। শিক্ষা মাও। শিষ্টাচার শেখাও। সেই আগুন থেকে বাঁচাও যার খড়ি হবে মানুষ এবং পাথর। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 'তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সবাইকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অধীনস্থদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞস করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের দায়িত্বশীল। তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কত্রী তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সেবক মালিকের সম্পদের রক্ষক, তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।'(সহিহ বুখারী:৮৯৩)

ইবনুল হাজ বলেন, নারী মূর্খ হলে এবং তার স্বামী থাকলে স্বামীর জন্য তাকে শিক্ষাদান ওয়াজিব। এই মাধ্যমে শিক্ষার্জন সম্ভব না হলে নারী শিক্ষার্জনের জন্য বের হবে। এক্ষেত্রে স্বামী অনুমতি না দিলেও বের হতে পারবে।' খতিব বাগদাদি রহ. বলেন, ইমাম নারীদের স্বামী ও সমাজের শিক্ষিতা শীর্ষশ্রেণির নারীদের শিক্ষাদানে বাধ্য করতে পারবেন।'

নারী শিক্ষার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হতে বাধ্য হলে উত্তম হচ্ছে তার শিক্ষিকা হবেন একজন নারী। ইবনুল হুমাম বলেন, 'একজন নারীর জন্য নারী থেকে শিক্ষাগ্রহণ বা অন্ধ পুরুষ থেকে শিক্ষাগ্রহণ অপেক্ষা উত্তম।'(ফাতহুল কাদির:১/৩৪৩)

নারী শিক্ষার্জনের জন্য পরপুরুষের কাছে যেতে বাধ্য হলে তার ও পুরুষের মধ্যে আড়াল থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ

'তোমরা তার পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।'(সূরা আহজাব:৫৩)

আল্লামা কুরতুবি বলেন, আয়াতটি নারীদের জন্য পর্দার আড়াল থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করার অনুমতির দলিল। এই বিধানের আওতায় সর্বশ্রেণির নারীরাই সমান।

নির্দেশটি নবীর স্ত্রীদের বেলায় এলেও এটি কেয়ামতকাল পর্যন্ত অনাগত সকল নারীদের উক্ত আয়াতটি নারীর পবিত্রতা, সম্ভ্রম, সম্মান, মর্যাদা ও আভিজাত্য রক্ষার জিম্মাদার। ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা এজন্য যে, আল্লাহ এখানে হেকমতের সাথে এর কারণ ও ফলাফল এভাবে উল্লেখ করেছেন ذلكم أطهَرُ لِقلوبكم وقلوبهن 'এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।' অর্থাৎ, পর্দার অন্তরাল থেকে প্রশ্ন করার হেকমত হচ্ছে, উভয়শ্রেণির অন্তরের পবিত্রতা। কারণ এখানে আল্লাহ 'ইসমে তাফজিলের সিগা' ব্যবহার করেছেন। এই পবিত্রতা রক্ষাই হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত আগত নারী-পুরুষের সম্ভ্রম রক্ষার উপায়।

নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার শিষ্টাচার

নারী শিক্ষার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হলে তার জন্য পোশাক-আশাকে, চাল-চলনে শরিয়ত-নির্দেশিত শিষ্টাচার রক্ষা করা জরুরি। নারীর পোশাক ও তার চাল-চলন তথা চরিত্র কেমন হবে, তা ফিকহের কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা নারী ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তার পোশাক কেমন হবে তা নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করব।

স্মর্তব্য যে, নারী যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন পোশাকের ক্ষেত্রে সে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পালন করবে।লক্ষণীয়, যেসব শর্ত আলোচিত হবে সেগুলো শুধু নারীর ঘর থকে বের হওয়ার সময়ের সঙ্গে প্রযোজ্য নয়; বরং কিছু শর্ত ঘরে থাকার অবস্থার সঙ্গেও সম্পর্কিত। আবার কিছু শর্তে নারীর পাশাপাশি পুরুষও অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম শর্ত: বিধানের বাইরে থাকা অঙ্গ ছাড়া পুরো শররি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ، وَ تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন নিজ মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারও কাছে নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'(সূরা নূর:৩১)

অন্যত্র বলেন,

بايُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِينَ ذلك أدنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'(সূরা আহজাব:৫৯)

প্রথম আয়াতে হুকুম থেকে ব্যতিক্রম অঙ্গগুলো ছাড়া প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে হুকুম থেকে ব্যতিক্রম অঙ্গগুলো কী কী তা নিয়ে

আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাবারি রহ. বলেন, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ দাঁর 'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে' আয়াতের অংশে যে সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে, তা দুপ্রকার। এক. যা গোপনীয় যেমন : পায়ের তোড়া, হাতের চুড়ি, কানের দুল, গলার হাড় ইত্যাদি। দুই, যা গোপনীয় নয়, তবে সেগুলো কী কী তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন সেটি হচ্ছে বাহ্যিক পোশাকের সৌন্দর্য। যেমন ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, সৌন্দর্য দুপ্রকার। যা গোপন থাকে, যেমন পায়ের মল, কানের দুল, হাতের চুড়ি, একই বর্ণনা পাওয়া যায় ইবরাহিম এবং হাসান প্রমুখ থেকেও। অন্যরা বলেন, বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যে যেগুলোর প্রদর্শন মুবাহ তা হচ্ছে, সুরমা, আংটি, হাতের বালা ও চেহারা। সাইদ ইবনে জুবাইর এবং আতা থেকে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

অন্যরা বলেন, এর দ্বারা চেহারা এবং পোশাকই উদ্দেশ্য। তবে সর্বোত্তম ও বাস্তবতার নিকটবর্তী অভিমত হচ্ছে-এর দ্বারা চেহারা এবং উভয় হাতুলি উদ্দেশ্য। এ ছাড়া এর মধ্যে সুরমা, আংটি, কাঁকন ও খিজাব অন্তর্ভুক্ত। আমরা একে সর্বোত্তম উক্তি বলার কারণ হচ্ছে, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, নামাজে সব মুসল্লি পর্দা করা ফরজ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখবেন।তবে নারী নামাজে তার চেহারা ও হাতুলি খোলা রাখতে পারবে।নারীর জন্য এইটুকু ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখা জরুরি। এ থেকে বোঝা যায়, তার ওই অঙ্গ ঢেকে রাখবেন। তবে নারী নামাজে তার চেহারা ও হাতলি খোলা রাখতে পারবে। নারীর দুটো পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্তর্ভুক্ত হলে ঢেকে রাখতে হতো। যেভাবে পুরুষের পর্দার অঙ্গগুলোও নামাজের সময় ঢেকে রাখতে হয়। যে অঙ্গ পর্দার হুকুমের মধ্যে নেই, তা খোলা রাখা হারাম নয়। খোলা রাখা থেকেই বোঝা যাবে অঙ্গ দুটোকে আল্লাহ তার বাণী ما ظهر منها **১৯**। 'সাধারণত প্রকাশমান'-এর মাধ্যমে পর্দার হুকুমমুক্ত রেখেছেন।

মাতুরিদি রহ. বলেন, আল্লাহর কালাম, وَلا يُبْدِينَ زَنَنَتَهُنَّ الَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে' সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রা. বলেন, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'সাধারণত প্রকাশমান' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের চাদর ও কাপড়। ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'সাধারণত প্রকাশমান' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরমা ও আংটি। অন্য বর্ণনায় আছে, হাতুলি ও চেহারা। আয়েশা

রা.-এর মতে إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'সাধারণত প্রকাশমান' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তর ও হাতের আংটি।

এখানে ইবনে মাসউদ রা.-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হবে পরনারীর চেহারার দিকে তাকানো জায়েজ নয়। ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে বলতে হবে, কামভাব ছাড়া তাকানো যাবে। আম্মিজান আয়েশা রা.-এর অভিমত গ্রহণ করলে মানতে হবে-নারীর হাতের তালু এবং পায়ের প্রতি তাকানো ঠিক আছে। তার মতে অঙ্গ দুটি বাইরে থাকার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, অঙ্গ দুটি ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে বহিরাঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। অনুরূপ হলে নারীর জন্য পায়ের পাতা খোলা রেখে নামাজ আদায় বৈধ হবে।

অতএব, বোঝা যাচ্ছে নারীর হাত পা ও চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। পুরুষ ওসবের প্রতি তাকাতে পারবে। আবু বকর জাসসাস রহ.-ও তাই বলেছেন।

পা পর্দার অন্তর্গত নয়, এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। হিদায়া কিতাবে তাই বলা হয়েছে। ইনায়ায় এর কারণ বলা হয়েছে-নারীরা জুতা বা খোলাপায়ে হাঁটাচলার সময় পায়ের পাতা খোলা রাখতে বাধ্য থাকে। সবসময় মোজা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সাধারণত পায়ের পাতার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানো হয় না। যে চেহারা কামনার উৎস, সেটিই যখন পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন পায়ের পাতা যে পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না, তা বলাই বাহুল্য।"(আল-ইনায়া,শারহুল হিদায়া:১/২৫৯)
কানজুদ দাকাইক গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বাধীন নারীর চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মারাকিল ফালাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে হাতের পৃষ্ঠদেশ পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত কি না, তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে হাতের তালুর ভেতর বাইর কোনোটাই পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। একই হুকুম পায়ের পাতার ক্ষেত্রেও। কারণ, সাধারণত এগুলো বের করে রাখার মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান।'

দ্বিতীয় শর্ত : খোদ পোশাকই সৌন্দর্যের মাধ্যম হবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে জাহিলি-যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।'(সূরা আহজাব:৩৩)

এখানে لَا تَبَرَّجْنَ এর অর্থ হচ্ছে পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ কোরো না। আর تحالْجَاهِلِيَّةِ الْأُولى এর অর্থ হচ্ছে জাহিলি যুগের নারীরা যেভাবে সৌন্দর্য ফেরি করে বেড়াত। যেভাবে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে পুরুষদের নিজেদের দিকে টানত।

ফুজালা ইবনে উবাইদ থেকে বর্ণিত, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি বিষয়ে কারও সুপারিশ কোরো না। যে ব্যক্তি জামাত ছেড়ে চলে যায়, যে ইমামের অবাধ্য হয়ে অবাধ্য হিসেবেই মারা যায়। যে দাস বা দাসী মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ওই অবস্থায় মারা যায়। যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত; কিন্তু সে তাকে খরচ চলার মতো অর্থ দিয়ে গেছে এরপরও সে স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।' এদের কারও ব্যাপারে সুপারিশ কোরো না।'(মুসনাদে আহমাদ:২৩৯৪৩)

সাধারণত বাহারি পোশাকের মধ্যে যে সৌন্দর্য থাকে, অন্য কোনো কিছুতে এত সৌন্দর্য থাকে না। অতএব, নারীর জন্য আকর্ষণীয় জামা পরে বের হওয়া অবশ্যই ফিতনার কারণ। বিশেষ করে হালের এই নষ্ট সময়ে।

তৃতীয় শর্ত: নারীর জামা হবে পুরু এবং তা স্বচ্ছ হবে না। কারণ, এমন জামা ছাড়া পর্দার বিধান পালিত হয় না। পাতলা কাপড়ের জামায় নারী অধিক ফিতনায় পড়তে পারে। এ ব্যাপারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের শেষ দিকে এমনসব নারীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকবে। তাদের মাথার চুল হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ হানবে। কেননা, এরা অভিশপ্ত। তোমাদের পরে কোনো জাতি এলে এদেরকে সেবিকা বানাবে, যেভাবে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির নারীদের সেবিকা বানিয়েছ।"(আল-আওসাত,তাবারানি:৯৩৩১)
'জাহান্নামবাসী দুপ্রকার, আমি যাদের (এ পর্যন্ত) দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। তা দ্বারা তারা লোকজনকে মারবে। একদল নারী তাদের মাথার চুল হবে উটের হেলে পড়া কুজের মতো। তারা জান্নাতে যেতে পারবে না, হবে কাপড় পরিহিত অথচ উলঙ্গ। যারা হবে অন্যদের আকর্ষণকারী ও আবেদনময়ী। এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না, অথচ এত দূর থেকে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।'(সহিহ মুসলিম:২১২৮)

'তারা হবে কাপড় পরিহত উলঙ্গ' উক্তিটি নিয়ে মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কেউ বলেছেন, তারা এত পাতলা কাপড় পরবে যে, তা তাদের শরীরে লেপ্টে থাকবে। তাই কাপড় পরা থাকলেও বাস্তবে থাকবে উলঙ্গপ্রায়। মোল্লা আলি কারি রহ. মিরকাতে অনুরূপই বলেছেন।

আলকামা ইবনে আলকামা তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন, 'হাফসা বিনতু আবদুর রহমান আয়েশা রা.-এর কাছে যান। তার গায়ে ছিল পাতলা ওড়না। আয়েশা তা দেখে ওড়নাটি ছিঁড়ে ফেলে তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দেন।'(রাওয়াহুল বাইহাকি ফিল কুবরা:৩২৬৫)

চতুর্থ শর্ত : কাপড় হবে প্রশস্ত। এত সংকীর্ণ হবে না যে, শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকবে। কাপড় পরার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা। প্রশস্ত কাপড় ছাড়া এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। সংকীর্ণ পোশাক-যদিও তা শরীরের রঙ লুকিয়ে রাখে, কিন্তু শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকে। এটা ফিতনার দিকে আহ্বান হয়ে থাকে।

আবু ইয়াজিদ মুজানি থেকে বর্ণিত, উমর রা. নারীদের কাবাতি পরতে নিষেধ করলে তারা বলেন, এটা তো স্বচ্ছ নয়, তিনি বলেন, স্বচ্ছ না হলেও সংকীর্ণ।

পঞ্চম শর্ত: পোশাক যেন উজ্জ্বল ও সুগন্ধিযুক্ত না হয়। কারণ, অনেক হাদিসে নারীদের সুগন্ধি মেখে ঘরের বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে আমরা কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি।

১. আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে এ উদ্দেশ্যে লোকসমাজে বের হয় যে, তারা সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে তো ব্যাভিচারিণী।(সুনান আন-নাসায়ি:৫১২৬)

২. ইবনু আব্বাসের স্ত্রী জায়নাব সাকিফিয়া থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ইশার সময় ঘর থেকে বের হলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।'(মুসনাদে আহমাদ:২৭০৪৭)

৩.আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এক নারীকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে এটি বলেন, এজন্যই সুগন্ধি মেখেছ? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে চলে রেতে দেখে বলেন, হে পরাক্রমশালীর বাদি, তুমি মসজিদে যাচ্ছ? সে বলে, হ্যাঁ। দিয়ে গোসল করে এসো। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে যায় তার নামাজ কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে (তা) ধুয়ে ফেলে।'(রাওয়াহুল বাইহাকি ফিল কুবরা:৫৯৭৩)

৪.'তোমরা আল্লাহর বান্দিদের মসজিদে যেতে বারণ কোরো না। তবে তারা যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে না আসে।'(মুসনাদে আহমাদ:৯৬৪৫)

৫. অয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে মুজায়না গোত্রের এক নারী মোহনীয় সাজে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন নবীজি বলেন, হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জৌলুসপূর্ণ ও চোখ ধাঁধানো পোশাক পরিহিত অবস্থায় মসজিদে আসতে ময়ের করো। কেননা, বনি ইসরাইলের নারীরা জৌলুসপূর্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে মসজিদে না আসা পর্যন্ত তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়নি।

যেভাবে আকর্ষণীয় পোশাক, মোহনীয় অলঙ্কার, অহংকার সৃষ্টিকারী সৌন্দর্য ও অবাধ মেলামেশা কামনার দিকে আকৃষ্ট করে, তেমনি সুগন্ধি ব্যবহারও এদিকে মানুষকে যারা করে।" আমি বলব যখন এমন অবস্থায় মসজিদে গমন হারাম হয়ে থাকে, তখন বজার-রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গমন যে হারাম হবে, তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে? হায়তামি বলেছেন, নারীর জন্য ঘর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করে সেজেগুঁজে বের হওয়া কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। যদিও এর পেছনে স্বামীর অনুমতি থাকে।

ষষ্ট শর্ত: তার পোশাক পুরুষের পোশাকের মতো হবে না। কেননা, সহিহ হাদিসে বর্ণিত মাত্র আল্লাহর রাসুল পুরুষের পোশাকের সদৃশ ধারণকারী নারীদের ওপর অভিশাপ করেছেন।

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ওইসব পুরুষকে যারা নারীর মতো পোশাক পরে এবং ওইসব নারীকে যারা পুরুষের মতো পোশাক পরে।'(সুনানে আবু দাউদ:৪০৯৮)
২. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশধারী নারী এবং নারীর বেশধারী পুরুষদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন।

৩. ইবনু আবু মুলাইকাহ রহ. সূত্রে বার্ণত, তিনি বলেন, একবার আয়েশাহ রা.-কে বলা হলো, এক নারী (পুরুষদের জুতার মতো) জুতা ব্যবহার করে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষবেশী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

৪. জনৈক হুজাইলি থেকে বর্ণিত, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে এমন অবস্থায় দেখতে পাই যে, তার অবস্থান ছিল হারাম এলাকায় এবং নামাজের জায়গা ছিল মসজিদে হারামে। তখন হঠাৎ উম্মু সাইদ বিনতু আবু জাহলকে দেখতে পাই-তার কাঁধে ঝুলন্ত রয়েছে একটি ধনুক এবং তিনি পুরুষালি ভঙ্গিতে হেঁটে চলছেন। আবদুল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, ইনি কে? হুজাইলি বলেন, আমি বলি, ইনি উম্মু সাইদ বিনতু আবু জাহল। আবদুল্লাহ বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নারীদের মধ্যে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে তারা আমাদের দল থেকে নয়। অনুরূপ যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তারাও।"(মুসনাদে আহমাদ:৬৮৭৫)

৫. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষবেশী নারী এবং নারীবেশী পুরুষের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। বলেছেন, 'ওদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।' রাবি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুককে বের করে দিয়েছিলেন, উমর রা.-ও অমুককে বের করে দিয়েছিলেন।(মুসনাদে আহমাদ:২০০৬)

জাহাবি রহ, নারীর পুরুষের বেশ ধারণ এবং পুরুষের নারীর বেশ ধারণকে কবিরা গুনাহ বলেছেন এবং উল্লিখিত হাদিসগুলো দ্বারা দলিল দিয়ে বলেছেন, নারী পুরুষালি ঢং, খোলা ও সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট জামা পরলে সে যেন পোশাকে পুরুষের বেশ ধারণ করল। ওই অবস্থায় থাকলে তার ওপর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের অভিশাপ। অনুরূপ অভিশাপ তার স্বামীর ওপরও যদি কর্তৃত্ব থাকার পরও সে তাকে এ থেকে বারণ না করে। কেননা, সে তাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে আসতে এবং পাপকাজ থেকে বিরত রাখতে নির্দেশপ্রাপ্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"
(সূরা আত-তাহরিম:৬)

মানে তাদেরকে শিষ্টাচার শেখাও, ইলম শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দাও। নিষেধ করো পাপ কাজ থেকে যেভাবে তোমাদের নিজেদের জন্যই পাপ থেকে বেঁচে থাকা দরকার। এ কারণেও যে, নবীজি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই বীত্বশীল এবং সবাইকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। অনুরূপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখো পুরুষরা তখন ধ্বংস হয়ে যাবে, যখন তারা নারীদের আনুগত্য করতে থাকবে। হাসান বলেন, আল্লাহর কসম, যে পুরুষ নারীর চাহিদার আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।' হায়তামিও একে কবিরা গুনাহর মধ্যে গণ্য করেছেন।

সপ্তম শর্ত: মুসলিম নারী কাফের নারীদের পোশাক পরবে না। কারণ, শরিয়ত দ্বারা প্রমাণিত, মুসলিম-চাহে সে পুরুষ হোক কিংবা নারী; তাদের জন্য বেশভূষায়, চাল-চলনে, রীতি-নীতিতে এবং পানাহারসহ সব বিষয়ে কাফেরদের অনুকরণ বৈধ নয়। এটি ইসলামি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। অথচ কতই-না আফসোসের বিষয়, আজ যারা মুসলমান বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে, এমনকি যারা নিজেদের দীনদার বলে দাবি করছে, তারা জেনে হোক কিংবা অজ্ঞাতে, সর্বক্ষেত্রে ইউরোপীয় কাফেরদের

অনুসরণ করে চলছে। অথচ এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা কোনো জাতির অনুকরণ করবে, তারা তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।' অনুরূপ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ আমার রিজিক রেখেছেন বর্শার ছায়ায়, লাঞ্ছনা ও নীচতা রেখেছেন আমার বিরোধিতার মধ্যে। যারা কোনো জাতির অনুকরণ করবে, তারা তাদের মধ্য থেকে গণ্য হবে।(মুসনাদে বাজজার:৮৬০৬)

অষ্টম শর্ত: পোশাক এমন হবে না, যা কামনা উদ্দীপ্ত করে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি যশখ্যাতির পোশাক পরবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ:৩৬০৭)

এ ছাড়া আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি যশখ্যাতির পোশাক পরে, আল্লাহ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাকে যেখানে ইচ্ছা ফেলে রাখবেন।(সুনানে ইবনে মাজাহ:৩৬০৮)

এভাবে নারীদের শিক্ষা দান করতে হবে এবং তাতে পোশাক পরিচ্ছদসহ শরিয়তের বিভিন্ন নির্দেশ বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে। এটা তার সম্মান ও সম্ভ্রমের হেফাজতের জন্য প্রয়োজনীয়। লক্ষ রাখতে হবে তারা যেন পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা না করে। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে যেন হৃদয়ছোঁয়া কণ্ঠস্বরে কথা না বলে।

এতক্ষণের আলোচনা ছিল নারীদের দীনি শিক্ষা অর্জন-সংক্রান্ত। তবে নারী তার জন্য উপযোগী দুনিয়াবি কারিগরি বিদ্যাও অর্জন করতে পারবে। যেমন, সে সেলাই কর্ম শিখতে পারবে, পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিদ্যা অর্জন করতে। তবে রসায়ন ও প্রকৌশল জ্ঞানের মতো আরও কিছু শাস্ত্র তাদের জন্য উপযোগী নয়। এগুলো শেখার উদ্দেশ্য তাদের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এগুলোর শিক্ষালাভহচ্ছে ফরজে কিফায়া পর্যায়ের। ইলমের ক্ষেত্রে ফরজে কিফায়া হচ্ছে ওইসব শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন যেগুলোর ওপর দীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ নির্ভরশীল। আল্লামা ইবনে আবিদিন রহ. রদ্দুল মুহতার-এর ভূমিকায় বলেন, ইলমের ক্ষেত্রে ফরজে কিফায়া হচ্ছে ওইসব শাস্ত্রের

জ্ঞানার্জন যেগুলো ছাড়া দুনিয়াবি কর্তৃত্ব সম্ভব নয়, যেমন : চিকিৎসা, গণিত, নাহু, অভিধান, কালাম, কিরাত, হাদিসের সনদ, ওসিয়ত ও মিরাস বণ্টন, হস্তলিপি, অলঙ্কারশাস্ত্র, ইলমুল উসুল, নাসিখ-মানসুখ, খাস-আম এবং নাস-জাহির। এসব শাস্ত্র কুরআনের তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য মাধ্যমস্বরূপ। অনুরূপ, ইলমুল আসার, রিজালশাস্ত্র তথা রাবিদের নাম, সাহাবিদের নাম ও পরিচিতি, রেওয়ায়তের ক্ষেত্রে ইলমুল আদালত, নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল রাবিদের মধ্যে ব্যবধান করার ইলম, স্থাপত্যজ্ঞান, শিল্পকলা, কৃষি, সুঁতো-বুনন, রাজনীতি হিজামা ইত্যাদি। তবে পুরুষজাতি এসব ইলম অর্জন করলে নারীদের ওপর যে আরোপিত ফরজ ছিল তা আদায় হয়ে যায়। অতএব, শরয়িভাবে এসব ইলমের জন্য তাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকবে কেন?

***

নারী ক্ষমতায়ন

১.

"নারী ক্ষমতায়ন হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীরা লিঙ্গ-ভিত্তিক অসম ক্ষমতার সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতন হয় এবং বাড়ি, কর্মস্থল ও সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর অর্জন করে।"(UN মতে)

"Women's empowerment is the process by which women become aware of gender-based unequal power relationships and acquire a greater voice in which to speak out against the inequality found in the home, workplace, and community."

"নারীর ক্ষমতায়ন' বলতে বোঝায় নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের সমপর্যায়ের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব প্রদান, যেখানে উভয় লিঙ্গের ভূমিকা, দায়িত্ববণ্টন ও নেতৃত্বের কাঠামোকে সমান করে দেখার আদর্শিক লক্ষ্য অনুসরণ করা হয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ:

কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণাটি যৌক্তিক নয়, কারণ ইসলাম পুরুষ-নারীর জৈবিক ও স্বভাবগত ভিন্নতাকে স্বীকার করে উভয়ের দায়িত্বকে সমান মূল্যবান হলেও অবশ্যই 'সমান প্রকৃতির নয়' বলে বিবেচনা করে। ফলে দায়িত্ববণ্টনকে "সমান" নয় বরং "ন্যায়সঙ্গত" ভিত্তিতে স্থাপন করাই ইসলামের লক্ষ্য। এ কারণে ক্ষমতায়নের দাবি ধর্মীয় ভূমিকা, পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক স্থিতি-শৃঙ্খলার সাথে সাংঘর্ষিক।

সূরা নিসা, ৩৪-এ মহান আল্লাহ বলছেন,

الرجال الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم

"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এক-কে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে।"

সূরা বাকারা, ২২৮-এ,

و الرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم

**আর পুরুষদের রয়েছে তাদের (নারীদের) উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

ইসলাম নারীকে পরিবার, সামাজিক নৈতিকতা ও প্রজন্ম গঠনের কেন্দ্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যে কাঠামো পশ্চিমা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতায়নের ধারণার বিপরীত।ইসলাম নারী ও পুরুষকে আত্মিক মর্যাদা, ঈমান আমল, ইবাদতের মূল কাঠামো, পরকালে প্রতিদান, সম্পত্তির মালিকানা, ফরজ জ্ঞানার্জনে ইত্যাদিতে সমান অবস্থানে রাখা হয়েছে। তবে কিছু বিষয় যেমন নেতৃত্ব, উত্তরাধিকার বন্টন, সাক্ষ্য, নাফাকা তথা আর্থিক দায়িত্ব, হিজাব ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান গণ্য করে না।

অর্থাৎ ইসলামে নারী এবং পুরুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের বিবেচিত হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে তারা সমান নয় এবং তাদের দায়িত্ব, ক্ষেত্র ভিন্ন। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান এবং ক্ষেত্র একই সেসব বিষয় দিয়ে তো আর ভিন্ন ক্ষেত্রের সমতা বিধান করা যায় না। এটা করা হলে সেটা একটা অনৈতিক কাজ হবে।

নারীর ক্ষমতায়নের কনসেপ্টটি পুরুষের সাথে সমান অধিকার, নেতৃত্ব ও পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার ধারণা ছাড়া সম্ভব নয়, যেই ধারণাটি শরীয়াহর মূলনীতি قوامة ولاية

এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন অধিক যৌক্তিক বলা আর নারী অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং সামাজিক বাস্তবতার কথা বলে নারী-পুরুষে সমান উত্তরাধিকার বন্টন করার আইনে সমর্থন করা একইরকম বিষয় হবে।

জাহেলি যুগে যখন নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা প্রশ্ন উঠতো তখন ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কর্ম ও দায়িত্ববোধের ভারসাম্য তৈরি করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজকের পৃথিবীতে নারীর ক্ষমতায়ন নামে একটি ধোঁয়াটে স্লোগানের আড়ালে নারীকে আবারও বানানো হয়েছে ভোগের পণ্য।তাকে স্বাধীনতার নামে বাড়ির স্নিগ্ধ নিরাপত্তা থেকে টেনে নামানো হয়েছে শোরুমে, নাটকে, বিজ্ঞাপনে এমনকি রাজপথে। একসময় যে নারী ছিলো সন্তান দাত্রী, সভ্যতার ধারক, আজ তাকে বানানো হয়েছে রাজনৈতিক মুদ্রা। একটি পক্ষ নারীর নামে আন্দোলন করে ক্ষমতা চায়, অন্য পক্ষ নারীর শরীর ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি করে। সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, হয়রানি বেড়ে চলেছে কিন্তু তার মূলে দায়ী কে?

তারা কি সেইসব নারী যারা নিজেদের হিজাব ভুলে গেছে?নাকি সেইসব পুরুষ যারা নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ?

যে সমাজে দায়িত্ব পালন নয় বরং অধিকার চাওয়ার নামে চিৎকার হয়, সেখানে নারী কেবল স্লোগানে রয়ে যায়, বাস্তব জীবনে নিপীড়নের শিকার হয়। ইসলাম বলে, "অধিকারের আগে দায়িত্ব পালন করো।"

ইসলাম মানুষের চিন্তা ও কর্মের ব্যবস্থায় অধিকার অর্জনের পরিবর্তে ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য কার্য সম্পাদনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে অধিকারের প্রসঙ্গটি কর্তব্য পালনের তুলনায় মর্যাদার মাপকাঠিতে দ্বিতীয় স্তরের।

জাতির অর্ধেক জনসংখ্যা নারী যদি তাদের জৈবিক ও বন্টিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো তাহলে জাতি আজ কোন পর্যায়ে যেতে পারতো! নারীর ক্ষমতায়নই যৌক্তিক একথা বলার পূর্বে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করতে হবে যে তার ফলাফল কেমন হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা সেসব দেশে যাতে মুসলিম নারীরা পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে দেখতে পাই তা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

ইসলাম নারীকে আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার দিয়েছে। তবে সে অধিকারে কখনো আত্মঘাতি প্রক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই যেমনটি রয়েছে মানুষের হাতে গড়া নারী নীতির মধ্যে। ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে এবং তার মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যদিও

কোন কোন 'মুসলিম' সমাজ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নারীর ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা দিচ্ছে না। তাই সমাধানকল্পে অধিকার আদায়ের জন্য কার্যক্ষম আইনপ্রণয়ন হতে হবে, ছদ্মবেশী স্লোগান নারী ক্ষমতায়নের পরিবর্তে।

মুসলিম নারীর অবস্থান, ভূমিকা, অধিকার, পর্দা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ইসলামকে আক্রমণ করার পশ্চিমের অভ্যাস বহু পুরাতন। এমন অবস্থায় নিজেদের অবস্থান নিয়ে লজ্জিত মুসলিমদের মধ্যে যত ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে অধিকাংশ বাঙালিদের অবস্থান হলো তারা বাঙালি কালচার, সমাজের ধারা কিংবা অন্যকিছুর অজুহাত দিয়ে নারী প্রশ্নে ইসলামের রীতিনীতি থেকে পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। সে ইসলামও মানে আবার পুরোপুরি মুক্তমনাও না।

দীর্ঘকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট রিভিশনিস্ট, রিফর্মিস্ট এবং মুসলিম নারীবাদ চায় পশ্চিমের সাথে খাপ খাওয়াতে। নারীর ব্যাপারে ইসলামের যে অবস্থানটা পশ্চিমের সাথে সাংঘর্ষিক সেটাকে তারা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায়। এই ব্যাখ্যার তোড়ে নারীর ঘরের বাইরে অবস্থান সংক্রান্ত পুরো ফিকহ হয়ে যাচ্ছে ইজতিহাদি এবং ইখতিলাফি। আর পশ্চিমা ধাঁচের নারীর ক্ষমতায়ন আর নারী মুক্তির উদাহরণ খোঁজা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সীরাতে।পশ্চিমের সৃষ্ট ধোঁয়াটে সাফল্য ক্ষমতায়নকেই তারা ইসলামি পোশাকে উপস্থাপন করতে চায় সাফল্য এবং ইসলামের কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে।

২.

নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে ফিকহী সিদ্ধান্ত

ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে দুইভাগে ভাগ করা যায় বিষয়টা- ১. রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে ক্ষমতায়ন, ২. বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো, যেমন কোনো নারী কোনো মেয়েদের স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হলো বা নার্সিংয়ে প্রধান হিসেবে কাজ করল ইত্যাদি। এই প্রকারকে উলামায়ে কেরাম জায়েজ বলেছেন বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে জায়েজ বলেছেন যেমন তাতে হারাম কোনো কাজ থাকবে না, পুরুষের সাথে ফ্রি মিক্সিং হবে না ইত্যাদি। এর বৈধতার বিষয়ে দ্বিমত নেই তেমন।তবে আমাদের আলোচনা প্রথম প্রকার নিয়ে কারণ যেহেতু ক্ষমতায়ন শব্দটা আমরা রাজনৈতিক দিক থেকেই বেশি ব্যবহার করি এবং প্রায়োগিক দিক থেকেও এটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতৃত্বকেই বুঝায়। তাই ফিকহি সিদ্ধান্তে এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

*দালিলিক বিশ্লেষণ: এ বিষয়ে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে কুরআন সুন্নাহ কী বয়ান এসেছে এবং তার ব্যাখ্যায় উসুলবিদগণ কী বলছেন। আমরা প্রথমে কুরআন সুন্নাহর উদ্ধৃতি দিব এরপর তার উপর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত রেখে বিবেচনা করব।

কুরআন থেকে-

"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে,পুরুষেরা স্বীয় ধন সম্পদ হতে ব্যয় করে।"-(সুরা নিসা,৩৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন- "এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ঐ সব লোেক কখনও মুক্তি পেতে পারেন না যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকত্রী বানিয়ে নেয়। (সহীহ বুখারী) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য।"

তাফসিরে আহসানুল বয়ানে উল্লেখ রয়েছে: এই আয়াতে পুরুষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার দু'টি কারণ বলা হয়েছে। প্রথমটি হল, আল্লাহ প্রদত্তঃ যেমন, পুরুষোচিত শক্তি ও সাহস এবং মেধাগত যোগ্যতায় পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই নারীর তুলনায় অনেক বেশী। দ্বিতীয়টি হল সব-উপার্জিতঃ এই দায়িত্ব শরীয়ত পুরুষের উপর চাপিয়েছে। মহিলাদেরকে তাদের প্রাকৃতিক দুর্বলতার কারণে এবং তাদের সতীত্ব, শ্লীলতা এবং পবিত্রতার হিফাযতের জন্য ইসলাম বিশেষ করে তাদের জন্য অতীব জরুরী যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে সেই কারণেও উপার্জনের ঝামেলা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নেতৃত্ব দানের বিরুদ্ধে কুরআন কারীমের এটা এক অকাট্য দলীল। এর সমর্থন সহীহ বুখারীর সেই হাদীস দ্বারাও হয়, যাতে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এমন জাতি কখনোও সফলকাম হবে না, যে জাতি তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কোন মহিলার উপর অর্পণ করবে।"

হাদিস থেকে-

عن أبي بكرة قال لما بلغ النبي له أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يقلحقوْمٌ وَلُوا أَمْرَهُم امرأة

আবু বাকরাহ (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসিগণ তাদের রাজক্ষমতা কিসরা (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে, তখন তিনি বললেন, 'সে জাতি কোন দিন

সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।' (সহিহ বুখারী ৪৪২৫, ৭০৯৯)

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম বাগাবী (রহ:) বলেন,

اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى
البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال

অর্থাৎ, (আলেমগণ) একমত যে নারীদের জন্য ইমাম (নেতা) বা কাযী (বিচারক) হওয়া কোনোটিই জায়েজ নয়...।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন:

،قوله :»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة احتج به من منع قضاء المرأة، وهو قول الجمهور وخالف الطبري فقال :يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه وأطلق بعض المالكية الجواز

এছাড়াও এই হাদিসের ব্যাখ্যায় একাধিক উলামায়ে কেরাম উলামায়ে কেরামের ইজমার কথা বলেছেন। এমনকি বিচ্ছিন্ন কিছু মতের উল্লেখ যারা করেছেন তারাও বলেছেন এই হাদিসের ব্যাখ্যায় জমহুর আলেমগণ নারীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়নকে জায়েজ মনে করতেন না এবং এই মতের উপরই ফতোয়া।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য:

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :فالمرأة لا تصح أن تكون إمامة للرجال بأي حال من الأحوال، حتى لو كانت أقرأ وأفهم؛ فإن الرجل هو الذي يكون إمامها . .وقال الشيخ أيضا يستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة؛ لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلا ح، وإلى فساد الأمور

উম্মাহের আমল ও উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত:

রাসুলুল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় কোনো নারীকে কোনো রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রধান বানাননি, এবং তাঁর পরবর্তীতেও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে এমনটি ঘটেনি। এবং তার পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহের মধ্যে খিলাফত বিদ্যমান থাকাকালীন এমন নযির বিরল।

এছাড়াও বিশ্বের নির্ভরযোগ্য কিছু ফতোয়া বিভাগ, OIC অন্তর্ভুক্ত ইসলামী ফিকহ একাডেমি)مجمع الفقه الإسلامي(, দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম করাচি থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায় নারীদের হুকুমতের কাজে নেতৃত্ব দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

এমনকি শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রাহি:)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলেও তিনি একই উত্তর দেন।

উল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে তাদের সংসদে নির্বাচন করা, রাষ্ট্রীয় কার্যে নেতৃত্ব দেয়া ইত্যাদি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের মাধ্যমে হারাম/অবৈধ।

যেসব বিচ্ছিন্ন মত অনুযায়ী বৈধ বলা হয়ে থাকে তাদের পক্ষের কিছু দলিল:

কুরআন থেকে-

و المؤمنون والمؤمنت بعضهم أولياء بعض يَا مُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنهونَ عن المنكر ويقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة ويطيعونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله ان الله عزيز حكيم)٧١ (و المؤمنون و المؤمنت بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة ويطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم)٧١(

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

মুসলমানদের আমল থেকে-

কুরআনে উল্লেখিত সাবার রানী বিলকিসের ঘটনা (এই উম্মাহের ঘটনা না এটা, এবং রাজত্ব পরিচালনার ঘটনাও তাঁর অবিশ্বাসী অবস্থার সময়ের।)

উমার রাযি: কর্তৃক আশ শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ আল-আদাউইয়াহ (রা:) কে মদিনার বাজারের হিসাবরক্ষক বানানো। (হিসাব রক্ষার কাজটির বাস্তব দৃশ্যায়নে রেওয়ায়েত নিরব। এবং এতেও তাঁর হুকুমতের কার্যে সরাসরি নেতৃত্ব প্রমাণ হয় না। একটা নির্দিষ্ট বিভাগে একটি নির্দিষ্ট কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়াও উসুলের write facts aff 01 الضرورة تبيح المحظورات mai জরুরত প্রয়োজন অনুযায়ী হারামকে হালাল করে দেয়। এটি মূলত ইসলামের প্রশস্ততার প্রমাণ। আর প্রসিদ্ধি আছে, প্রাক ইসলামি যুগের মাত্র ১৭ জন অক্ষরজ্ঞান মানুষের মধ্যে শিফা (রা:) ছিলেন একজন। এছাড়াও উসুলের ক্ষেত্রে القليل كالمعدوم والمعدوم ليس অর্থাৎ এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা কোনো দলিল হতে পারে না। بشيئ যেমন রাসুলুল্লাহ জীবনে একবার ওজরবশত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন। কিন্তু এদিয়ে পুরুষের জন্য দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েজ হয়ে যায় না বরং প্রয়োজনবশত করা যাবে সেই দলিল গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য এই যুগে সেই

জরুরত প্রমাণ করা মুশকিল। এবং উম্মাহের ১৪০০ বছরের ইতিহাসে জারি থাকা আমল দ্বারা আমরা কোথাও এমন কোনো দলিল পাই না যে তা দিয়ে সরাসরি নারীদের সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়াকে জায়েজ বলা যায়।

আয়েশা (রা:) উষ্ট্রীর যুদ্ধে গিয়েছিলেন এ বিষয়ে এটিই খুব মজবুত উদাহরণ। কিন্তু তাফসিরে তাফহিমুল কুরআনের ভাষ্যমতে, তাঁর পরবর্তী জীবনে যখনই এই আয়াত তিনি তিলাওয়াত করতেন যে,

و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى و اقمن الصلوة و اتين الزكوة و اطعن الله و رسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا

অর্থ- আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (আহযাব ৩৩)

আয়েশা রা: তখন কান্নায় ভেঙে পড়তেন এমনকি তাঁর ওড়না ভিজে যেত। তাহলে কীভাবে আমরা সেই ঘটনাকে এতটা গর্বভরে প্রচার করতে পারি? এমনকি সেই ঘটনায় নারী নেতৃত্ব বলে যা বুঝানো হয় তার বিন্দুমাত্রও ছিল না বরং এটি ছিল উম্মাহের চরম পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে।

আল মুহাদ্দিসাত থেকে অথবা ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকেও সরাসরি প্রমাণ করা যায় না অর্থাৎ ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রমাণ হয় না। খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদা কিংবা আরো যাঁদের কিছু কাজের কথা সামনে আসে সেগুলোও সামগ্রিক নেতৃত্ব না বরং ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করানো। যেমনটা হুদাইবিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে উম্মে সালমা (রা:) পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু সরাসরি সাহাবাদের নেতৃত্বে ছিলেন না।পরবর্তীতে আরো কিছু উদাহরণ আছে যেমন, ভারতবর্ষে রাজিয়া সুলতানা একজন নারী সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তবে তার পুরুষের পোশাকে রাজ দরবারে আসাযাওয়া ইত্যাদি বিষয়ও কিন্তু সেসময়ের আলিমগণ সমর্থন করেননি। এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যে মাহকেবার হানিম সুলতানের (কোসেম সুলতানা) কথা বলা হয় যিনি সরাসরি তার নাবালক পুত্র ৪র্থ মুরাদের সাথে সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করেন। তবে সেটিকেও প্রত্যক্ষভাবে সালতানাতের নেত্রী বলা যায় না। তার উপর সে বিষয়টি যদি গ্রহণযোগ্য হতোও তবে তার পরবর্তীতে

নারীদের রাজ কার্যে সরাসরি অংশগ্রহণকে উসমানীয় রীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো না।

তবে মোট কথা হলো, সরাসরি যেহেতু জায়েজ হবার সপক্ষে কোনো দলিল নেই এবং ইজমার সিদ্ধান্তও এর বিপরীত তাই এই বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যাগুলো উপরোক্ত সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবে না।

৩.

নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপারে আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর টেক্সট আছে। এবার আমরা চলে যাবো ইজমা বা ঐক্যমত আছে কিনা খুঁজতে। ইজমা বলতে কি বুঝাচ্ছি, সেটার একটা উদাহরন হলো, সমকামিতা কি হারাম নাকি হালাল? এটা নিয়ে আমাদের সালাফগন কখনোই দ্বিমত করেননি। তবে আজকে বিভিন্ন মডারেট "বক্তা" ইনিয়ে বিনিয়ে কুরআনের অপব্যাখা করছে, কওমে লুত (আ) এর ঘটনাকে অপব্যাখা করে এই বিধান বদলাতে চাচ্ছে। এমন অপব্যাখ্যাকৃত, অবিশুদ্ধ-জাল বর্ণনার কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করা বিচ্ছিন্ন মত থাকা মানেই ইজমার লঙ্ঘন নয়।ইসলামে কোনো বালিগ পুরুষের উপর নারীর নেতৃত্ব নেই। সেটি হোক সালাতে ইমামতি কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। এর উপর সাহাবী-তাবেয়ীগণ, সব মাজহাবের ইমামগণ, ফুকাহায়ে কেরাম, উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসগণ ও মুফাসসিরগণ সবাই ইজমা (ঐকমত্য পোষণ) করেছেন। এই নিয়ে উপনিবেশিক যুগের আগে ইসলামের ইতিহাসে কোনো আলেমই কখনো সন্দেহও করেননি। উপনিবেশবাদ নিয়ে একটু পরে কথা আছে।

“এমনকি ইবনে হাযমও তার 'মারতিব আল-ইজমা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে এই বিষয়ে পণ্ডিতদের ঐক্যমত ছিল। তিনি বলেছেন, "কিবলার লোকদের, সকল দলের মধ্যে [অর্থাৎ, সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের] মধ্যে এমন একটিও দলও নেই যা মহিলাদের নেতৃত্বের অনুমতি দেয়।" আল-কুরতুবি অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন এবং আল-আল্লামাহ আল-শানকিতি বলেছেন, "এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।"

من صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم

তার মানে আহলে কিবলা কোনো মুসলিম আলেমই দ্বিমত করেননি। উপনিবেশী যুগের পরে তবে কেন এবিষয়ে কারচুপি ও সন্দেহ বাতিক সৃষ্টি শুরু হলো?।

উত্তর দেয়ার আগে কিছু বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

অতীতের প্রায় সকল সভ্যতা ছিলো পুরুষতান্ত্রিক এবং পুরুষ শাসক দ্বারা শাসিত হতো। যদিও কিছু নারী শাসকের উদাহরন পাওয়া যায়, তবে সেটা সংখ্যায় খুবই নগন্য। এমনকি যত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ দেখা যায়, তাদের আসলে কোনো সভ্যতা বলা যায় না, বরং তারা শুধুমাত্র সমাজ হিসেবেই থাকতো। যদিও তারা দেখা যায় কোনো দেশের বা সমাজের একদম কোণার অংশে বসবাস করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের একদম কোণায় পাহাড়ি অঞ্চলে এর প্রমান দেখা যায়। তাদেরকে সভ্যতা বলা যায় না, বরং পৃথিবীর ইতিহাসের ৯৯% সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক।

এন্ড্রোপোলজিস্টদের মধ্যে অনেক কাজ দেখা যায়, তেমনি একজন হলো Steven Goldberg। তিনি তার বই, "Why men rule" Goldberg বই এ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেন যে, কেন ইতিহাসের প্রায় সব সভ্যতায় পুরুষেরা নেতৃত্ব স্থানীয় অবস্থানে থাকে? গোল্ডবার্গ এর জন্য দায়ী করে বায়োলজিকে। শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যকে, হরমোনাল পার্থক্য, জ্ঞান সম্বন্ধীয় ও আচরনভিত্তিক (cognitive) পার্থক্যকে।অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা- না করা উভয় অবস্থাতেই মানুষ তার মৌলিক সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় এবং এটা করাতেই সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতি। এর বিপরীতে অগ্রগতি নেই। এমনকি বোঝা যাচ্ছে ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কত বেশি মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল।নারীরা তার থেকে সমাজে উচ্চ স্থানীয় বা মর্যাদার পুরুষের প্রতি বেশি দুর্বল হয়। সেটা বেশি ক্ষমতাবান বা জ্ঞানী বা সম্পদবান, অথবা শারীরিক শক্তির ভিত্তিতেও হতে পারে। নারীদের এই বৈশিষ্ট্যকে বলে হাইপারগ্যামি।এটা একটা কারণ যার কারণে পশ্চিমা ও উন্নত দেশগুলোতে পরিবারব্যবস্থার ভঙ্গুর অবস্থা এবং এত ডিভোর্স কেইস। কারণ সেখানে নারী ও পুরুষের ক্ষমতায়ন একইসাথে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীল। যার কারণে নারীরা পুরুষদের উচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।হাইপারগ্যামির উদাহরণ রাসূল সা.-এর পবিত্র স্ত্রী যায়নাব রা.-এর জীবন থেকেই পাওয়া যায়। যারা রাসুল সা. ও উম্মুল মুমিনিন যায়নাব রা.-এর বিবাহের ঘটনা যারা জানেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে যায়নাব রা. ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তবে তাঁর বিয়ে আজাদকৃত দাস ও রাসুল সা.-এর এক সময়ের পালকপুত্র যায়েদ বিন হারেসার রা. সাথে হয়েছিল। তবে তাদের তালাক হয়ে যায় এবং সকল আলেমগন এই বিষয়ে একমত যে এর কারণ হলো যায়নাব রা. সম্ভ্রান্ত পরিবারের এবং যায়েদ একজন আজাদকৃত দাস হওয়ায় তাদের মধ্যে বনিবনা হয়নি এবং তিনি যায়নাব এর দৃষ্টিতে

লঘু হয়ে ছিলেন। যায়েদ রা. বারবার রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট যায়নাব রা. এর তাঁকে উপেক্ষা করার অভিযোগ করতে লাগলেন। পরবর্তীতে তাদের তালাক হয়ে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে রাসুল সা. এর সাথে তার বিবাহ হয়।

পুরুষরা নারীদের তুলনায় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে ও শত্রুদের প্রতি কঠোর হতে পারে। ইসলামের আল ওয়ালা ওয়াল বারাআকে মনস্তাত্ত্বিক in group ও out group আচরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি দেশের সবাই মিলে in group, দেশের বাহিরের মানুষ out group পুরুষেরা সাধারনত নারীদের তুলনায় out group এর প্রতি বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতা পোষণ করে। নারীরা out group এর প্রতি পুরুষদের মতো তেমন আক্রমণাত্মক এবং স্ট্রেস্ফুল নয়। তারা পদক্ষেপ অনেকটা সমান করতে চায় এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব করতে চায় না।

আল আল ওয়ারা ওয়াল বারা" অর্থাৎ মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের শাথে শত্রুতা পোষণ একটি আদর্শভিত্তিক কমিউনিটি এর আদর্শ ও ক্ষমতার সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য খুবই ক্রিটিকাল এবং জরুরী।)পুরুষরা সামাজিক হায়ারার্কির প্রত্যেক শ্রেণিকে রক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়। তবে নারীরা সেই অংশকে রক্ষা করে যাতে তারা আকর্ষণ অনুভব করে।

আমরা যদি উপনিবেশবাদ এর দিকে তাকাই, তাহলে দেখনো যে উপনিবেশবাদীরা নারী ক্ষমতায়ন এর খুবই পক্ষে ছিলো। তারা নারীদেরকে নেতৃত্বে আনতে চাইতো, নারীদেরকে সামনের কাতারে আনতে চাইতো, তারা সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়গুলো নারীদের সাথে পরামর্শ করতে চাইতো অনেক সময়। কেন? খুবই সহজ। এর কারণে তারা যত না সহজে পুরুষদের প্রভাবিত করতে পারবে তার থেকে বেশি নারীদের প্রভাবিত করতে পারবে। পুরুষদের আউট গ্রুপের প্রতি বেশি আগ্রাসী মনোভাব থাকে, আল ওয়ারা ওয়াল বারা এর মানসিকতা বেশি থাকে। এবং এর সবচেয়ে বাস্তব সাম্প্রতিক প্রমাণ পাওয়া যায় ট্র্যাম্পের ওয়াইট হাউসের একটা ফাস হওয়া মেমো থেকে। সেখানে State Department বলে,

"Focusing on female-empowerment as the primary information messaging goal within the Islamic-influenced world will allow the United States to maintain a moral component for American power and its liberation narrative,"

দেখুন, তারা নির্দিষ্ট ভাবে মুসলিম বিশ্বে নারীদের ক্ষমতায়ন চায় তাদের আধিপত্য এবং প্রভাব বিস্তারের সুবিধার্থে। এটা কি যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয় না? আমাদের শত্রুরা আমাদের নারীদের ঘর থেকে বের করতে চাচ্ছে তাদের সুবিধার্থে, তবে আমাদের আলেমগন নারীদের ঘরে থাকতে বললে তারা "কাঠমোল্লা" হয়ে যায়। আমেরিকানরা চায় যে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নারীরা থাকুক এবং তাদের মাধ্যমে তাদের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে, এবং আধিপত্য বিস্তার করতে। এবং আমেরিকা অনেক আগেই তাদের প্রকল্প গ্রহন করেছে কিভাবে মডারেট মুসলিম নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায় এবং এই বাস্তবায়নে তারা বেশ সফল।বর্তমান পশ্চিমা মতবাদ সমূহ মূলত উপনিবেশবাদ এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলো। রেনাসাঁ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্ধকার যুগ থেকে বেড়িয়ে আসা ইউরোপ রেফর্মেশ হয়ে চার্চ এর নির্যাতন থেকে বের হয়ে এসে এনলাইটমেন্ট হয়ে পরিপূর্ণ সেকুলার হয়ে ওঠে, এবং এনলাইটমেন্ট এর সেই সেকুলার লিবেরাল মতাদর্শন উপনিবেশবাদ এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে এবং আমরাও পরাজিতদের মতো আমাদের ২০০ বছর নির্যাতন করা জালেমদের আদর্শের প্রতি বন্দিত্বকে মেনে নেই এবং এমন বন্দীতে রুপান্তর হই যারা বন্দিত্বকে ভালোবাসে।ফলে বন্দিদশা থেকে বেরোতে চাইলেও চিন্তায় পরাধীন আমরা শত্রুদেরই ফাঁদা স্ট্র্যাটেজিতে নিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে সমাধানের চিন্তা করি। এসব কখনোই বিবেকবান মস্তিষ্কের কাছে যৌক্তিক নয়।

(আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছি আল্লাহর এই আইনের পেছনে যেই গভীর জ্ঞান, তা কতো বাস্তবসম্মত। সুবহানাল্লাহ।)

৪.

পৃথিবীতে অর্থ, জব সেক্টর সীমিত। কিন্তু মানুষের অভাব অসীম। কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা যদি হয় তিন লক্ষ এবং এক লক্ষ কর্মক্ষেত্র থাকে, এবং কর্মী পুরুষ এক লক্ষ বা তার কিছু কমবেশি। তখন এক লক্ষ পুরুষ কর্মক্ষেত্রে ঢুকলে এক লক্ষ পরিবার চলবে। গোটা তিন লক্ষ জনসংখ্যা হলো পরিবার সমেত।কিন্তু ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনে সামন্তবাদী শোষণের পর আরেক প্রকার শোষণ শুরু হয়। তা হলো শিল্প কারখানা ও চাকুরি ক্ষেত্রে শোষণ ও সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করা। সেটা কীভাবে হয়?ইন্ডাস্ট্রির হর্তাকর্তারা মুখরোচক শিল্প-স্লোগানের নামে নারীদের বের করে আনলো অর্থ উপার্জনের কাজে। তাই এক লক্ষ কর্মক্ষেত্রের দাবীদার হয়ে গেলো দুই লক্ষ মানুষ বা আরো বেশি। যার কারণে শ্রমের মূল্য কমে গেলো। শ্রম যতটুকু তার সমান এখন আর

বেতন থাকলো না। এত লক্ষ জনগণ ও পরিবারের টাকা কেন্দ্রীভূত হলো ইন্ডাস্ট্রির কাছে।নারীরা অর্থনৈতিক লাঞ্চনার শিকার ছিলো, সম্পদ সঠিকভাবে পেতো না, যৌতুক গুণতে হতো আরও কত কি। ক্ষমতায়ন হবার পর নারীরা কর্মক্ষেত্রে আসলো অনেক নারী চিন্তা করলো স্বামী স্ত্রী দুজনেই কর্পোরেট ফিল্ডে উপার্জন করলে পরিবার চলবে ভালো। এদিকে কর্পোরেট বিশ্ব, ইন্ডাস্ট্রি তো সীমিত। পূর্বে এক লক্ষ পরিবার চলতো। এখন দেখা গেলো সেটা কমে গিয়ে ষাট হাজার পরিবারে এসেছে। কারণ নারী-পুরুষ একত্রে ফিল্ডে আছে।

কারো পরিবার ভালো চলছে তো কারো পরিবারের মুখে খাবারই ওঠেনি। কারণ সীমিত অর্থসিস্টেমে তার জায়গাই হয়নি। তীব্র হলো বেকারত্ব সমস্যা।অন্যদিকে নারীদের বেতন পুরুষদের থেকে বিভিন্ন যুক্তিতে কম করা হয়েছে। নারীরা তাতে ইন্ডাস্ট্রিকে প্রশ্ন করেনি। কারণ বহুসংখ্যক নারী তো এসেছে empowered হতে, স্বাধীন হতে। তাদের হাতখরচ হলেই হবে। পুঁজিবাদের সাথে তাদের কোনো ঝামেলা নেই।

উল্লেখ্য পূর্বে নারীর প্রতি যেই সহিংসতা ছিলো, নারীকে তার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, সবই থেকে গেছে। নারীর ক্ষমতায়ন সে সমস্যাগুলির সমাধান করেনি। আগেও কর্মক্ষম কোনো আইন ছিলো না, ক্ষমতায়নের পরেও নেই। কিন্তু মানব মস্তিষ্কপ্রসূত এই সমাধান থেকে যে সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হলো তাকে সমাধান করার আর উপায় হলো না। যেই সমাধানের সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করতে আরো আরো সমাধান খুঁজে বের করতে হয় সেটা আদৌ কোনো সমাধান?

বরঙ নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ফিরে যেতে হবে স্রষ্টাপ্রদত্ত সমাধানের দিকে। পুঁজিবাদের প্রেসক্রিপশন সমাধান নয়। মহান আল্লাহ পুরুষকে যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন তা সে পালন করবে। নারীকে যেই রোল দিয়েছেন সেটা সে প্লে করবে।

আমাদের সামনে সমস্যা তিনটি। পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।আল্লাহ বলছেন-

للرجال عليهن درجة

তথা নারীর উপর পুরুষের রয়েছে মর্যাদা।

অর্থ উপার্জনে, ব্যয় করতে, নেতৃত্বে।

و في أموالهم حق السائل و المحروم

আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।

و امْرُهُم سُورَى بَيْنَهُم

তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।

অর্থনীতিতে যাকাত ও ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, পরিবার ও রাষ্ট্র চালাতে নেতৃত্ব হবে পুরুষের এবং রাজনীতির মূল হবে শূরা তথা যোগ্যদের মধ্যে পরামর্শ। এগুলো প্রতিষ্ঠা করাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশি যৌক্তিক।

এগুলো প্রতিষ্ঠা সম্ভব না যখন ফলো করা হবে পাশ্চাত্যের প্রেসক্রিপশন, ফলো করা হবে ওরিয়েন্টালিস্টের প্রেসক্রিপশন কিংবা পুঁজিবাদ ভোগবাদের প্রেসক্রিপশন।

এখান থেকে এমন নারীসমাজ যদি তৈরি হয় যারা নারী ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী, যারা পড়াশোনা করে উপার্জন না হলে পড়ার অপচয় ভাবে, যারা নারীর প্রতি সহিংসতার সমাধান হিসেবে নারী ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী কিংবা নারী ক্ষমতায়নের দ্বারা আমাদের মুসলিম সমাজের পারিবারিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কল্যাণ সাধন হবে মনে করে তারা আদৌ এই সমাধান বাস্তবে দেখা সম্ভব নয়। বরং এর দ্বারা আমাদের কাঠামো ভঙ্গুর হচ্ছে এবং আল্লাহপ্রদত্ত সমাধান থেকে মুসলিম জাতি শতধা দূরে চলে যাচ্ছে।

এখান থেকে সংশয়-

জব সেক্টরগুলোতে মুসলিম নারীরা না গেলে সেক্যুলার নারীরা দখল করবে।

পার্লামেন্টে মুসলিম নারীরা না গেলে সেক্যুলার নারীরা আল্লাহর আইনবিরোধী আইন পাশ করবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের যে কার্যকর আইনের কথা বলছি তা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫.

< জব সেক্টরে মুসলিম নারীরা না গেলে সেক্যুলার নারীরা দখল করবে...>

ইসলামপূর্বে খাদিজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাঁধে পৈত্রিক ও মৃত স্বামীসূত্রে পাওয়া বিশাল সম্পত্তির দেখভাল, ব্যবসায় করার বোঝা চাপে। অতঃপর নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিবাহের পর তিনি তাঁর সম্পত্তি দ্বীন ইসলামের খাতিরে রাসূলুল্লাহর সা. হাতে তুলে দেন এবং ব্যবসায় থেকে ইস্তফা নিয়ে পুরোপুরি রব্বাতুল বাইত হয়ে যান। আয়িশা রা. এমন সময় হাদীস বর্ণনা ও ফিকহ সমষ্টির কাজ করেছেন যখন ইলমে হাদীসই ছিলো তীব্র ঝুঁকির মুখে। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন, তাঁবুর মধ্যে থেকে তিনি বর্ণনা করতেন। তখন তাঁর দেহের অবকাঠামো দেখা যেতো না, সেটা সাধারণ বোরকা পড়ে সামনে আসার মতো নয়। সেটা থেকে কীভাবে প্রমাণ করা যায় যে আজ

পুরুষদের মধ্যে পারদর্শী থাকার পরেও একজন নারী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ ছাত্রদের পড়াবে?

ফাতিমা রা., উম্মে সালামা রা., আসমা বিনতু আবি বকর রা., উম্মে আতিয়্যা রা. নারী সাহাবারা ইসলামের আবিভাবের যুগে অন্দরমহল কেন্দ্রীক দায়িত্ব পালন ও সভ্যতা প্রস্তুত করতে কী চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

অনেক নারী সাহাবী কৃষিকাজ, চামড়া পাকা করার কাজ যেমন যায়নাব রা. করেছেন। সেগুলি তারা ক্যারিয়ার হিসেবে করেননি। সেগুলো কোনোটিই ক্ষমতায়নের উদাহরণ নয়।

নারীর ক্যারিয়ারের ডেফিনিশন অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ ডিকশনারি এবং উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে হলো নারীর প্রোফেশনাল কিংবা বিজনেস জীবনে সফলতা অর্জন।

আরো বলা হচ্ছে,

"It's distinct from a "working woman" who may primarily work for financial reasons or a "housewife" who focuses on domestic duties."

মানে হলো ক্যারিয়ার উইমেন আর জীবীকার তাগিদে ওয়ার্কিং উইমেন, হাউজওয়াইফ সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারিক পরিভাষা। আর নারী সাহাবারা জীবীকার প্রয়োজনে কাজ করেছেন, গৃহের সাথে সম্পৃক্ত কাজ করেছেন।কাজেই কিছু শর্ত ঠিক রেখে নারী অর্থ উপার্জন করুক বা অর্থ উপার্জন ছাড়াই অন্দরমহল ওয়ার্ক করুক, তাতে নিষেধাজ্ঞা নেই।শর্ত হলো-

> অন্দরমহল কেন্দ্রীক, নারী পৃথক ব্যবস্থা।

> ফ্রী মিক্সিং মুক্ত

> পূর্ণ পর্দার সুযোগ

> এটা করতে গিয়ে শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন না হওয়া

> প্রাইমারি পরিচয় ঘর-রব্বাতুল বাইত-কন্যা-স্ত্রী-মা-এর ব্যত্যয় না ঘটা।

এই সীমানা মেনে নারীরা নারীদের শিক্ষিকা হবে, শিক্ষার্জন করবে, চিকিৎসার কাজ করবে, নারীদের মধ্যে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার বজায় রাখবে।

(আমরা শরীয়তের রুখসতের গন্ডিতে আছি। এটা দিয়ে তো গন্ডির বাহিরে কোনো কিছুকে বৈধ প্রমাণ করা যায় না।)

কিন্তু প্রথম ক্ষেত্র শুরু হয় পরিবার থেকে। যেই সেক্যুলার নারী পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে যায় সে-ও তো কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য, কোনো

না কোনো মেয়ের আত্মীয়া-নিকটজন।আর সেক্যুলার নারীরা জব সেক্টর দখল করবে বলে আমাদের নারীদের আমরা শত্রুদের লেখা প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে রাজপথে ছেড়ে দিবো? তা হয় না। সেসব সেক্টরে সেক্যুলার নারীরা যায় বলে তা নারীর ক্ষেত্র হয়ে যায়নি। আমাদের পক্ষ থেকে পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষরা থাকাই যৌক্তিক।

< পার্লামেন্টে নারী সংরক্ষিত আসনে মুসলিম নারী না গেলে সেক্যুলার নারীরা গিয়ে আল্লাহর আইনবিরোধী আইন করবে...>

জবাব:

১। ফিকহী দৃষ্টিকোণ:

আবু বাকরাহ রা. বলেন,

উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় আল্লাহ একটি কথার দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই কথা পৌঁছালো যে পারস্যবাসী কিসরার কন্যাকে তাদের শাসনকর্তা বানিয়েছে তিনি বললেন,

لن يفلح قوم ولوا أَمْرَهُمُ امْرأة

কোনো জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না যদি তারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্তা বানায়।

(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭০৯৯)

সংশয়: বর্তমানকালে আধুনিকতাবাদী অনেকে বলতে চায় যে এই হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সা. কেবল সেই সময়কার পারস্যের অধিবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সকল জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেননি। প্রথমত আরবী ব্যাকরণ অনুসারে দেখলে বলা হয়েছে লান ইয়ুফলিহা কওমুন।কওমুন একটি জাতি / কোনো জাতি।অর্থাৎ কোনো জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না নারীকে তাদের ওয়ালী বানালে।এই ব্যাপক/সাধারণ বাক্যকে কোনোভাবেই একটিমাত্র জাতির জন্য নির্দিষ্ট করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, হাদিসটি বর্ণনা যিনি করছেন তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে আয়িশা রা.-এর পক্ষে যুদ্ধ করতে চেয়েও এই হাদীস স্মরণ করে বিরত থেকেছেন। এই হাদীস যদি কিসরার জাতির সাথেই খাস থাকতো তবে বর্ণনাকারী নিজে তা থেকে ইজতিহাদ করে উপকার নিতেন না।

প্রশ্ন আসতে পারে, এই রকম হাদিস থাকা সত্ত্বেও আয়েশা রা. কেন যুদ্ধের নেতৃত্ব দিলেন? উত্তরে বলা যায় আয়েশা রা. নেতৃত্ব দেবার উদ্দেশ্যে যাননি। তিনি গিয়েছিলেন উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে। একটি

অপরিকল্পিত যুদ্ধে তিনি জড়িয়ে পড়েন।কিন্তু সেখানে তার উপস্থিতির কারণে তিনিও নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে আসেন। হতে পারে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নারী নেতৃত্ব সংক্রান্ত হাদিসটি তখন পর্যন্ত তার জানা ছিলো না। তবে তার এই কর্মকাণ্ডকে যদি আমরা নারী নেতৃত্ব বলে ধরে নেই তবে বলতেই হবে সেই নেতৃত্বের পরিণতি ছিল পরাজয় এবং উভয়পক্ষের ১০,০০০ মুসলিমের মৃত্যুবরণ। অবশ্য আমারা বিশ্বাস করি শুদ্ধ নিয়্যতের কারণে উভয়পক্ষের কেউই গুনাহগার হবেন না।

কেউ যদি আয়েশা রা. এর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারী নেতৃত্বের বৈধতা পেতে চায় তবে আয়েশা রা. এর এই বক্তব্য তার জানা উচিত-

আয়েশা রা. বলেন,

"যদি নারীরা কী করছে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন তবে তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন যেমন বনী ইসরাইলের নারীদের নিষেধ করা হয়েছিল।" (দেখুন সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮৬৯)

আর এই হাদীস থেকে সফলতার অর্থ রোড কালভার্ট পদ্মা সেতু না। সফলতা সেটাই যেটা কুরআনে বারবার এসেছে "আর তারাই সফলকাম" হিসেবে।

আলেমদের থেকে:

ইবন কুদামার আল-মুগনি গ্রন্থ থেকে, ইমাম নববীর আল-মাজমু গ্রন্থ থেকে এবং ইবনে হাজার আল-হাইতামীর বর্ণনায় আমরা পাই,

ইসলামী শরীয়াহতে "ওয়ালায়াতুল উযমা" নারীর জন্য জায়েয নয়। সংসদ (শুরা/আইন প্রণয়নকারী) এই প্রকার নেতৃত্বের অংশ।

শায়খ আলবানী রহ. সিলসিলা হুদা ও নূর কিতাবে বলেছেন,

"নারীর জন্য মিনিস্ট্রী/নেতৃত্ব হারাম কারণ এটি পুরুষদের কাজ।"

সমসাময়িক স্কলার যেমন বিন বায, সালিহ ফাওযান বলেছেন, নারী জাতীয় নেতৃত্বে (শুরা/সংসদ) থাকা জায়েয নয়।

কোনো কাজ শরীয়তে নারীর ওপর ফরজ না হলে"না করলে সেক্যুলাররা নিবে" যুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয় না।সংখ্যা পূরণ করতে নারীদের সামনে রেখে "ইলেকটেবল" বানানো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে আসে। ইসলামি পলিটিকাল তত্ত্বে (আল-মাওয়ার্দী, আল-জুহাইমি, আল-ফারাবি) কোনো সমীকরণ নেই যেখানে, "ক্ষতি ঠেকাতে শরীয়তবিরুদ্ধ নেতৃত্বকে অনুমতি" দেওয়া হবে।

২। যুক্তি

পার্লামেন্টে নারী যাওয়ার দুইটি উপায় আছে। একটি নারী সংরক্ষিত আসন, দ্বিতীয়টি নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন পাওয়ার পর নির্বাচিত হয়ে আসা। আমরা দুইটা নিয়েই আলাদাভাবে কথা বলবো ইন শা আল্লাহ।

সংরক্ষিত আসন:

যেই পার্লামেন্টে নারীকে পাঠানো হয়, সেখানেই শরীয়তবিরোধী বিল, মুসলিম পরিবার আইনে পরিবর্তন, নারীবাদী নির্দেশনা, আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন হয়, এবং আইন পাশ হলে দায়িত্ব শুধু ভোটদাতার নয়, প্রতিনিধির উপরেও বর্তায়।বাংলাদেশে একাধিক সরকারের অধীনে গত ২০ বছরে যেসব শরীয়তবিরোধী আইন পাশ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

DV আইন (গৃহ সংস্কার) বহুল নারীবাদী ব্যাখ্যা, ব্লাসফেমি আইন সংশোধন, যা ধর্ম অনুশীলনকে আরও দূর্বল করেছে। সংরক্ষিত আসনে থাকা মুসলিম নারীরা একটি ক্ষেত্রেও ইসলামী আপত্তি তুলতে পারেননি।

আরো বাস্তব উদাহরণ:

* পাকিস্তান MMA ও জামাতে ইসলামী কয়েকবার নারী এমপি পাঠিয়েছে। কী দেখা গেছে?

HUDOOD Ordinance ইসলামি রেখা নষ্ট করার সময় নারীরা প্রতিরোধ করতে পারেনি।

পাকিস্তানের নারী নীতি পাশ হয়েছে ইসলামি রাজনৈতিক দলের নারীরা বাধা দিতে পারেনি।

সংসদে বহুবার বোরকা হিজাব নিয়ে উপহাস হয়েছে, নারীরা রক্ষা পায়নি।ইসলামি দলের সিদ্ধান্তে তাদের ভোট ছিল "প্রায় অকার্যকর"।

* তিউনিশিয়ার আন-নাহদার নারী সদস্যরা পার্লামেন্টে থেকেও গে-ম্যারেজ বৈধকরণ, সিভিল কোড, সেক্যুলার কনস্টিটিউশন ঠেকাতে পারেনি।মুসলিম নারী এমপিরা মিডিয়ায় কড়া আক্রমণ ও চাপের শিকার হয়।শেষ পর্যন্ত নাহদা পার্লামেন্টেই রাজনীতি সমর্পণ করে।

* মরক্কোর আল আদালাহ ওয়াত তানমিয়াহর

العدالة والتنمية (PJD)

নারী সংসদ সদস্যরা থেকেও Family Code-এ নারীবাদী পরিবর্তন ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে।তাদের বক্তব্যকে "ইসলামপন্থী সন্ত্রাস" হিসেবে মিডিয়ায় আক্রমণ হয় এবং তারা রাজনৈতিকভাবে অচল হয়ে পড়ে।

* তুরস্কের AKP নারী সদস্যরা যদিও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিলো কিন্তু Secular Civil Code-এর পরিবর্তন বন্ধ করতে পারেনি।হিজাববিরোধী পুরো প্রচারণা (২০০৭-২০১০)-এ AKP নারীরা সবচেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছেন।সংসদে তাঁদের উপর তামাশা, হাঁকডাক, মিডিয়া-আক্রমণ হয়।

এমনকি বাংলাদেশে মদ্যপান/বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রথমবার যখন একটি বেসরকারি কোম্পানিকে দেওয়া হয়, সেটি ছিল ২০০২ সালের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়, যখন ইসলামি দলের নারী সদস্যরা পার্লামেন্টে নারী সংরক্ষিত আসনে ছিলেন। তখন মদ বিক্রয় বা মদ আনার ওপর নতুন নীতি বা লাইসেন্সচালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়।এগুলো যদি মুসলিম বিশ্বের জন্য টেস্ট কেইস হয়েই থাকে তবে প্রমাণিত হয়েছে যে মুসলিম আদর্শবাদী নারীরা ইসলামি আইন তো পরে নিজেদের মর্যাদা রক্ষাই তাদের জন্য কঠিন ছিলো। নারী পাঠালে ইসলাম রক্ষা পাবে কিংবা সেক্যুলার নারীদের জায়গা দখল করলে কাজ হবে এই ধারণা কখনো বাস্তবে সত্য হয়নি।আর না যেসব নারীরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে সেখানে যায় তার কারণে সেটা নারীদের ক্ষেত্র হয়েছে। সুতরাং পুরুষদের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে পুরুষরাই যথেষ্ট।

সংসদে নারী সদস্যদের বিরুদ্ধে কটূক্তি ও অপমান (সমসাময়িক কিছু উদাহরণ লাগবে এক্ষেত্রে)

সংসদে নারী এমপিদের ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণ, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আক্রমণ, শারীরিক মন্তব্য করা হয়। ইচ্ছাকৃত এমন অনিরাপদ পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের সভ্যতার ধারক নারীদের কীভাবে ঠেলে দিতে পারি?

নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হলে:

আমরা জানি, সংসদে নারী সংরক্ষিত আসনে নারীরা কোনো নির্বাচনী এলাকায় মনোনীত হন না। তারা পুরুষের সাথে কম্পিটিশনে নির্বাচিত হন না কিংবা মনোনয়নও সেভাবে হয় না। কিন্তু চব্বিশোত্তর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো সংরক্ষিত আসনের বাহিরে তাদের নির্বাচনী এলাকায় ৫-৭ শতাংশ, কোথাও ৩৩ শতাংশ নারী মনোনয়ন দেয়ার প্রস্তাবনা আছে।সেসব নির্বাচনী এলাকায় কি যোগ্য পুরুষ প্রার্থী নেই? তবে পূর্বের সব আলোচনা একপাশে রেখে

পুরুষের বিপরীতে নারীকে প্রাধান্য দিয়ে মনোনয়ন দেয়া কোনোমতেই ইসলাম-সম্মত হয় না। কোনো বালেগ পুরুষের উপরে নারীর নেতৃত্ব নেই। সুতরাং নির্বাচনী এলাকায় নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে নারীকে রাজনীতির ময়দানে নামানোর বৈধতা আমদানি করা সম্ভব না।

* বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী ক্ষমতায়ন ইসলামি দৃষ্টিকোণ ও যৌক্তিকতার দিক থেকে কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়।

নারীর অধিকার নিশ্চিত হবে, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে যদি নারী তার আল্লাহপ্রদত্ত মানব ফিতরাত অনুযায়ী দায়িত্বে ফিরে যায়। আর পুরুষরা তাে দায়িত্বে।একটি সুষ্ঠু তদারকিমূলক আইনব্যবস্থাই নারীর সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে। সেই ব্যবস্থা করা ও ইসলামের দাবিগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভবও আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের দিকে অগ্রসর হলে। পশ্চিমা প্যারাডাইম তথা গণতন্ত্র,জাতীয়তাবাদ,ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা সমাজতন্ত্র অথবা পুঁজিবাদের প্রেসক্রিপশন কোনোটিই ইসলামের দাবি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। পৃথিবীর কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ তথা জীবনব্যবস্থা তরবারি ছাড়া শুধুমাত্র কূটনীতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, মাও সে তুং এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এর কোনোটিই তরবারি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ ফিলিস্তিনের গাযযা উপকূল। কূটনীতিক দীর্ঘ আলাপের পরেও দীর্ঘকালীন শোষণ ও গণহত্যার পর আল আকসা রক্ষা ও মুসলিম সম্পূর্ণ নিধন থেকে বাঁচাতে সশস্ত্র প্রতিরোধী হতে হয়েছে। সিরিয়া, ইদলিব, সুদান, মালি, সোমালিয়া, লিবিয়া, বুরকিনা ফাসো, আফগানিস্তান, কাশ্মীর কত মুসলিম ভূমির জন্য বাস্তবতা আজকে প্রতিরোধ।

সুতরাং তরবারি একটি সুপ্রিম ও অনস্বীকার্য হাতিয়ার। এর ব্যাপারে হীনমন্যতায় ভোগা মানে হলো নিজেদের আত্মপরিচয় সংকটে ভোগা।সমাধান ইসলামেই আছে নববী পন্থায়। রাসূল সা.-এর জীবন মক্কায়, মদিনায়, বদরে, আহযাবে, খায়বারে, তাবুকে, নাজরানে, ইয়েমেনে, রোম ও পারস্যের ভবিষ্যদ্বানীতে, হিন্দের ভবিষ্যদ্বানীতে।রাসূলুল্লাহ সা. হকের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। বিপ্লবের জন্য অন্যতম উপাদান জাগরণ তখন চলছে। জাহেলি মূর্তিপূজার সমাজে মূর্তিহীন তাওহীদের প্রচারণাই ছিলো সবচেয়ে বড় জাগরণ। তারপর বিপ্লবের প্রস্তুতি স্বরূপই হিজরত এবং পরে মক্কাবিজয় এবং একের পর এক ভূমি বিজয় হয়।সব ভূমির অবস্থা একই না। মক্কাতে যেমন বিপ্লব এসে

পৌঁছেছে তেমন সময় হলে এখানেও পৌঁছাবে। কিন্তু জাগরণের বিষয়টা তো বন্ধ থাকবে না। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার খন্ডন, পতনের আহ্বান; যেমন ছিলো জাহেলি শিরকি সমাজে তাওহীদের স্ফুলিঙ্গ, তেমনই দাওয়াতি কাজ হতে হবে। নারী ক্ষমতায়নের লাস্যময়ী স্লোগানে কী সমস্যা বলতে হবে। এটি ইসলামীকরণের কোনো পথ নেই। মানুষকে প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে বলতে হবে। যাতে সময় আসলে তারা প্রস্তুত থাকে। মিশরে ইখওয়ানকে, তিউনিসিয়ার আন নাহদাকে, আলজেরিয়ার স্যালভেশন ফ্রন্টকে বিপ্লব মূহুর্তে যেভাবে সাধারণ জনগণ ত্যাগ করেছে, মুসলিম আদর্শকে ত্যাগ করে সেক্যুলার হয়েছে তা যাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে না হয়।
সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি দৃষ্টিকোণ ও বাহ্যিক যুক্তি, মুসলিম স্বার্থের দৃষ্টিকোণ কোনো দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা কোনোভাবে এমন প্রজন্মের নারী তৈরি করতে পারি না যারা নারী ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী কিংবা বাস্তবতার কথা বলে নারী ক্ষমতায়ন চায় অথবা নারী ক্ষমতায়নের রাস্তা দিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোঁজে। এই অবস্থান সম্পূর্ণ অমূলক। এবং আমরা এই চিত্রায়ণের বিপক্ষে।

ফেমিনিজম বা নারীবাদ

স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সাথে নারীবাদী আন্দোলনের সম্পর্কটা সুস্পষ্ট। ফেমিনিস্টদের দাবির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের প্রতিটি দাবির পেছনেই এই বিশ্বাসগুলো কাজ করে। নারীবাদ সৃষ্টির পেছনে ইউরোপের বর্বরতার ইতিহাস থাকলেও পাশ্চাত্য বিশ্বাসই এটাকে স্বতন্ত্র মতবাদ কিংবা ইজমে রূপান্তরিত করেছে। ইউরোপের খ্রিষ্টানসমাজে নারী নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। খ্রিষ্টানসমাজের নারীরা এই নিপীড়নমূলক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের বিকৃত ধর্মে এর সমাধান খুঁজেছে। সেখানে কোনো সমাধানের অস্তিত্ব তারা পায়নি। নিজেদের মূল্যায়ন ও উল্লেখযোগ্য কোনো অধিকারেরও সন্ধান পায়নি তারা খ্রিষ্টধর্মে। তখন মুক্তির জন্য তারা পাশ্চাত্যের ঘোষিত মূলনীতি বেছে নেয়। গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, সমতা আর উন্নতির বস্তাপচা ধারণা। পুরো নারীবাদকে আমরা তিনটি দাবি কিংবা স্লোগানের ভেতর দিয়ে দেখতে পারি।

এক.

'নারী, তোমার ওপর থাকতে পারবে না কারও কর্তৃত্ব, তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তোমার কারও প্রয়োজন নেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বোঝা।'

নারীবাদীদের এমন স্লোগানের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার দর্শন। কি ধর্ম, কি পরিবার আর কি সমাজ, কারও বেঁধে দেওয়া ভালো-মন্দে নারী বিশ্বাসী হতে পারে না। সে যা ভালো মনে করবে, তাই করবে। নারী যখন এই পাশ্চাত্য স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে চাইবে, তখন ঘরে অবস্থান, পরিবার পরিচালনা, পুরুষের অভিভাবকত্ব গ্রহণের মতো আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়গুলো পরাধীনতা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বোঝাই মনে হবে। পর্দার বিধানকে সে শেকল আর বস্তাবন্দি বলে আখ্যায়িত করবে। আর এভাবেই সে আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্যের দাসত্বে প্রবেশ করে আর নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে। নারীবাদীরা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি ছেড়ে পুরুষের প্রকৃতি গ্রহণ করতে চায়। নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্জন করে পুরুষের অনুকরণ করতে চায়। এখানে কোনো স্বকীয়তা নেই, নেই কোনো অনন্যতা। একজন নারীবাদী নারী তার স্বামীকে খদ্দেরের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারে না, যেখানে কারেন্সি বা বিনিময়ই মুখ্য। প্রেম, ভালোবাসা, মমতা ও দায়িত্ববোধের সেখানে কোনো বালাই নেই।

তাদের সকল সমস্যা নারীর আল্লাহপ্রদত্ত মাতৃত্ববোধের সাথে। পরিবারকে খুশি রাখা, সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, সন্তান প্রতিপালন করার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকাই তাদের কাছে পরাধীনতা; অথচ এগুলো নারীর সহজাত ভূমিকা।তাদের কাছে একজন নারীর স্বাধীনতা হলো নগদ বিনিময় প্রাপ্তি, এমনকি যাদ তা হয় দেহসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেও। নারীবাদ হলো চরম ভোগবাদী চিন্তাভাবনা। মেকআপ, ড্রেসিং, ইনকাম, দেহ আর বিচরণ-স্বাধীনতার মাঝেই আটকে আছে তাদের পরিচয়। তারা মনে করে, এগুলো করতে পারাহ একজন নারীর সফলতা!

দুই

'নারী, একজন পুরুষ কখনোই তোমার আস্থার জায়গা হতে পারে না। এজন্য তুমি তার ওপর নির্ভর না করে বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। তাল মিলিয়ে চলো। এগিয়ে যাও তাকে পেছনে ফেলে।'

এই স্লোগানটি পাশ্চাত্য সমতার সাথে সম্পৃক্ত। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যখন (নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা) ভোগ করবে না। কেন এখানে নারী-পুরুষের ব্যবধান সৃষ্টি করা হবে? পুরুষ কেন উত্তরাধিকার সম্পত্তি নারীর চেয়ে বেশি পাবে? পুরুষ বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারলে নারী কেন সবার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তখন একজন নারী কেন তার স্বাধীনতা পারবে না?

পাশ্চাত্য সমতাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনে নিলে এরকম নানান জায়গায় প্রশ্ন আসবে, যেখানে নারী-পুরুষের বিধান ও অধিকারের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। কারণ ইসলাম সমতাকে মানদণ্ড মানে না। ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকে, সমতার সাথে নয়। কারণ প্রচলিত সমান অধিকারের ধারণা সব জায়গায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষ তা এক পক্ষের ওপর জুলুম বয়ে আনে। যার যা প্রয়োজন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাকে তা প্রদান করাই হলো ন্যায়।

পুরুষকে স্ত্রী, মা, বাবাসহ পরিবারের সবার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারীকে কারও ব্যয় বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এই দায়িত্ব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। কাজেই নারী যা পাবে, সবটাই তার সেভিং। সেখানে কারও প্রাপ্য অংশ নেই। ফলে পুরুষের টাকার প্রয়োজন বেশি এবং উপার্জন ও খাদ্যজোগানের জন্য তাকে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত বাইরে যেতে হয়। এজন্য তাকে বেশি ভাগ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বাইরের দিকটা সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা সামলানোর দায়িত্ব নারীর নয়। তার দায়িত্বের জায়গা পরিবার। ফলে তাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর ভরণপোষণই তার জন্য যথেষ্ট। আর বাবার সম্পত্তি তার জন্য অতিরিক্ত। সম্পত্তির ভাগে তাকে কম দেওয়াটা অন্যায় নয়, বরং ন্যায়সংগত। স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে স্ত্রীর অধিকার আছে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার। নারী পুরুষ কেউই সমান নয়; বরং একজন আরেকজনের জন্য পরিপূরক।

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والأمير زاع، والرجل راعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالمَرأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زوجها وولده، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল। স্ত্রী স্বামীর ঘর ও সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল।

তোমরা সকলে দায়িত্বশীল। সকলে নিজ অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫২০০) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষের দায়িত্ব হলো পরিবারকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা এবং তাদের হক আদায় করা। আর স্ত্রীর দায়িত্ব হলো, ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়া, সন্তান পরিচর্যা করা, সেবক-সেবিকাদের পরিচালনা করা এবং সকল বিষয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা করা। (ফাতহুল বারি, ১৩/১১৩)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো। (পরপুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না, যেমন প্রাচীন জাহেলি যুগে প্রদর্শন করা হতো।' (সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থানকে অবধারিত করে নাও। প্রয়োজন ব্যতীত ঘর হতে বের হয়ো না।'

আধুনিক সময়ে এসে নারী-পুরুষের এই সমতার প্রশ্ন শুধু বিধান ও অধিকারেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন সৃষ্টিগত ও জিনগতভাবেই নারী-পুরুষের সমতার দাবি তোলা হচ্ছে। নারীবাদ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, নারী-পুরুষের পার্থক্য নিছক একটি সামাজিক নির্মাণ বা সোশ্যাল কন্সট্রাক্ট (জেন্ডার ধারণা)। আদতে এখানে বায়োলজিক্যাল কোনো ব্যবধান নেই। সমাজে প্রচলিত বৈষম্যের ফলেই একজন মেয়ে কোমল, ঘরের কোণে থাকতে পছন্দ-করা, মাতৃত্ব ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মানবীতে পরিণত হয়। নতুবা সেও ছেলেদের মতো বহির্মুখী ও পুরুষালি গুণাবলির অধিকারী হতো। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মিথের পক্ষে পশ্চিমা রিসার্চ পেপারও পাওয়া যায়। বড় অদ্ভুত তাদের গবেষণা! বড় অদ্ভুত তাদের সমাজবিজ্ঞান! আদতে বর্তমান বিজ্ঞান আর গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলো চলে ক্ষমতা আর মিথ্যাচারের ওপর।

পৃথিবীর সমস্ত কর্মকাণ্ড একসেট মিথ্যাচারের ওপর ভিত্তি করে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। মিডিয়া, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সবকিছু পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য পক্ষপাতদুষ্ট গবেষণা ও ফল প্রকাশ করে। এটা তারা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। নতুবা ডোনেশনের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বেশ্যাবৃত্তির মতো এই অদ্ভুত বিজ্ঞানচর্চা।"

(নারী-পুরুষের সমতা প্রমাণের বৈজ্ঞানিক ধাপ্পাবাজির একটা ছোট্ট নমুনা উল্লেখ করছি: ইদানীং আমরা যে IQ টেস্ট করি, সেই পদ্ধতিটি ১৯৫০ এর দশকে Dr. D Wechsler এর বানানো। শুরুতে তিনি পেলেন, ৩০-এরও বেশি টেস্ট নারী-পুরুষের মাঝে 'একজনের' পক্ষে 'বৈষম্য' করছে। যেন টেস্টেরই দোষ, সে কেন একই রেজাল্ট দিচ্ছে না। কেন দুই লিঙ্গ দুই রকম পারফর্ম করবে? উভয়ে তো সমান। অতএব টেস্টই ঠিক নেই। বোঝেন ব্যাপারটা। পারফর্মেন্স গ্যাপ যেগুলোতে বেশি, সেই টেস্টগুলো বাদ দিয়ে দিলেন মিস্টার Wechsler. 'সমস্যা'টা সমাধান করা দরকার। এরপরও যখন দুই লিঙ্গকে সমান দেখানো যাচ্ছে না, তখন যা করা হলো: কিছু টেস্ট রাখা হলো যেগুলোতে পুরুষ ভালো করে, নারী খারাপ করে। আর কিছু টেস্ট রাখা হলো, যেগুলোতে নারী ভালো করে, পুরুষ খারাপ করে। পুরোটাকে বলা হলো 'IQ টেস্ট'; এবং 'নারী-পুরুষ' আইকিউ সমান।

এই হলো বিজ্ঞানের অবস্থা। যখন গবেষণার রেজাল্ট আপনার পছন্দ হচ্ছে না, মনমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আপনি প্রাপ্ত ডেটা এদিক-সেদিক করে নিচ্ছেন। উদাহরণত, অলিম্পিকে কোনো পোলভোল্ট ইভেন্টে কয়েকজন অ্যাথলেটকে আপনি ওজনের বাটখারা বেঁধে দিচ্ছেন আর কয়েকজনকে পোলের উচ্চতা কমিয়ে দিচ্ছেন। যাতে 'সত্য'টা প্রমাণিত হয় যে, শক্তি আর দ্রুততা যাই হোক, সৃষ্টিগতভাবে সব পোলভল্টারই সমান। (all the pole-vaulters, regardless of their prowess and agility, are created equal) Brainsex, page ১৩, Anne Moir Phd. এবং David Jessel.

➤ সমাজকর্মীরা American Psychological Association-কে বাধ্য করছে তাদের হয়ে কথা বলতে। এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করছে, যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

> তখনই APA কোনো রিসার্চ পরিচালনা করে, যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কী হবে। সম্ভাব্য যে ফল পক্ষে আসবে, তেমন রিসার্চই কেবল অনুমোদন দেওয়া হয়।)

এজন্যই বলি,বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার আগে বিজ্ঞানের সত্যতা নিশ্চিত করে নেওয়া দরকার। বিজ্ঞান অকাট্য কোনো বিষয় নয় যে, তার সবকিছু চিরসত্য হবে। কিন্তু ইসলাম চিরসত্য ও অকাট্য।

তিন.

'নারী, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়াই তোমার সম্মানের একমাত্র উপায়। অন্যের আয়ের ওপর নির্ভরশীল হলে মানে তুমি নিজের সম্মান হারালে। এজন্য তোমাকে নিজস্ব অর্থনৈতিক আয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে।'

নারীবাদীদের এই স্লোগানটির সম্পর্ক পাশ্চাত্য আকিদার তৃতীয় বিষয় তথা উন্নতির সাথে, যেখানে উন্নয়নকে মাপা হয় কেবল জিডিপি আর জিএনপির স্কেলে। ফলে পরিবারের আঙিনায় নারীর ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয় না পাশ্চাত্য সমাজে। নারীকে ঘর থেকে বের করে কর্মস্থলে আনতে পারাটাই যেন দেশের উন্নয়ন ও নারী অধিকারের বাস্তবায়ন। এগুলোকে উন্নয়ন তখনই মনে হবে যখন পাশ্চাত্যের উন্নতিকে বিশ্বাস করা হবে। উন্নতির ইসলামি স্কেল দিয়ে দেখলে আপনি নারীর সামাজিক ও পরিবারিক অধিকার, তার মাতৃত্বের সংরক্ষণ, পরিবার গোছানো, সন্তান প্রতিপালন এবং শিশুর সুস্থতা ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের মাঝেই উন্নতি খুঁজে পাবেন। নারীর ক্যারিয়ারের সম্পর্ক তার মাতৃত্বের সাথে, মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সাথে নয়। মাতৃত্বই নারীর ক্যারিয়ার।

এই পুঁজিবাদী বিশ্বে নারীর পারিবারিক ভূমিকার কোনো বাজারমূল্য নেই। নেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এর হিসাব। কিন্তু ইসলামে এর কোনো বিকল্প নেই। পুঁজি দিয়ে সমাজ ও পরিবারের প্রতি নারীর এই অবদান ক্রয় করা সম্ভব নয়।

(> যখন মিস্টার Cummings ও আরেক মনোবিজ্ঞানী Rogers Wright, Ph.D একটা বই লিখছিলেন Destructive Trends in Mental Health নামে, তখন তারা আরও কিছু সহকর্মীর সাহায্য চান। তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হবার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি বঞ্চিত হবার ভয়ে। বেশি ভয় পেত তারা 'gay lobby' বা 'সমকাম সমর্থক'দেরকে, যারা APA-তে খুবই শক্তিশালী।

এই হচ্ছে পশ্চিমা বিজ্ঞান ও গবেষণার বাস্তবতা। এইসব রিসার্চের ভিত্তিতে ইসলামকে সন্দেহ করা কতটুকু যৌক্তিক?)

বাজারমূল্যের চেয়েও অনেক উর্ধ্বের বিষয় এই ভূমিকা, যাকে পরিমাপ করার মতো ভারী কোনো মানদণ্ড নেই পাশ্চাত্য সমাজে। অথচ আল-কুরআন ছোট একটি বাক্যে কত সুন্দর মূল্যায়ন করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।' (সূরা বাকারা,১৮৭)

আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম হচ্ছে, 'তোমরা একে অন্যের পরিপূরক। একজনের কমতিকে আরেকজন পূরণ করবে, এভাবেই তৈরি হবে পরিপূর্ণতা।'

আপনি যদি পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ নারী খোঁজেন, তাহলে খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমার মতো উম্মাহর আদর্শ মেয়ে, স্ত্রী ও মায়েদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে আবিষ্কার করতে পারবেন না। তাদেরকে আপনার কাছে সেকেলে, বস্তাবন্দি, অসহায়, ব্যর্থ মনে হবে। অথচ এই পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নারী। একজন নারী যতই মমতাময়ী ও সাংসারিক হোক, আদর্শে-চরিত্রে-গুণে যতই উন্নত হোক, পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে সে ব্যর্থ নারী, যদি না সে টাকা কামাই করছে। কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী একজন সফল গৃহিণীও এই মানদণ্ডে ব্যর্থ ও অসফল। এখানে ক্যারিয়ারই সবকিছু। এজন্য দেহ বিক্রি করে, হাজারো পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করে যেসব নারী কথিত ক্যারিয়ার গড়ছে, নারীবাদীদের দৃষ্টিতে তারাই সফল। তারাই ফেমিনিস্টদের আইডল। তাদের মতে অর্থই নির্ধারণ করবে নারীর মূল্যমান।

ফেমিনিজমের মোকাবিলায় পাশ্চাত্যের এই বিশ্বাসগুলোতে আঘাত করার পাশাপাশি আমাদের ইসলামপ্রদত্ত নারী অধিকার সমাজে বাস্তবায়ন করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এই জায়গাটায় আমাদের চরম পর্যায়ের অবহেলা রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্শ্ববর্তী শিরকি সমাজের প্রভাবে এবং ইসলাম পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে নারীদের সাথে এমন কিছু বিষয় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। অথচ সাধারণ মুসলিমরা এগুলো ইসলামি নির্দেশনা বলে বিশ্বাস করে আসছে। যেমন মহর আদায়ে গড়িমসি করা, সম্পদের মিরাস এবং পারিবারিক অধিকার যথাযথরূপে আদায় না করা। আমরা যখন পশ্চিমা নারীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলব, তখন ইসলামপ্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া একপ্রকার ভণ্ডামি।

বর্তমান মুসলিম সমাজে নারীরা যে দুটি প্রাপ্য থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে, তা হলো মহর ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি। নারীদের মিরাস চাওয়াকে নির্লজ্জতা ও ঘৃণার চোখে দেখা হয়। ভাইয়েরা ইমোশনাল ব্লাকমেইল করে দায়সারাভাবে কিছু টাকা দিয়ে বোনদের এই অধিকার কেড়ে নেয়। তাদেরকে বঞ্চিত করে প্রাপ্য অধিকার থেকে। আর স্বামীরা মহরকে অঘোষিতভাবে রহিতই করে দিয়েছে সমাজ থেকে। মহর এখন কাগুজে সংখ্যা ছাড়া কিছুই না। অনেকে তো শুধু স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়াকেই মহর

হিসেবে গণ্য করে থাকে। অথচ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও বাসস্থান স্বামীর ওপর আলাদা ওয়াজিব। মহরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন ও হেনস্তার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো যৌতুক। পূর্বনির্ধারিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত অর্থ বা বস্তু না পেলে সারাজীবন বউয়ের ওপর এর শোধ তোলে স্বামীর পরিবার। যৌতুকের জের ধরে বহু নারী অকালে ঝরে পড়ে। অসংখ্য নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। আবার অনেকে সারাজীবন হজম করে যায় নানারকম খোঁটা ও কটু কথা। নারীর ওপর এই যৌতুকের বোঝা ইসলাম চাপিয়ে দেয়নি। দিয়েছে হিন্দুপ্রভাবিত সমাজ। ইসলামে যৌতুকের অর্থ সম্পূর্ণ হারাম। স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কোনো প্রকার উপঢৌকন এসে গেলে ভিন্ন কথা। কিন্তু চুক্তি করে কিংবা পূর্বাকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পদ না পেয়ে স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালানো কিংবা তাকে কটু কথা শোনানো সম্পূর্ণ জুলুম। ইসলামে এর কোনো বৈধতা নেই।

নারীবাদকে উস্কে দেওয়ার মতো পুরুষদের আরেকটি জঘন্যতম আচরণ হলো, নারীর ঘরের কাজকে মূল্যায়ন না করা এবং তাকে নিজ উপার্জনের খোঁটা দেওয়া। 'তুমি আর কী করো, সারাদিন তো ঘরেই বসে থাকো'- এই ধরনের তাচ্ছিল্যপূর্ণ বাক্য কিছু পুরুষের মুখের বুলি হয়ে গেছে। নারীর ঘরের কাজগুলোকে সে কিছুই মনে করে না। এসব অবমূল্যায়নমূলক আচরণ নারী-পুরুষের মাঝে ভালোবাসার পরিবর্তে বিদ্বেষই তৈরি করবে।

উপার্জন নিয়ে খোঁটা দেওয়াটাও কিছু পুরুষের কাছে ফ্যাশন হয়ে গেছে। 'তোমার কামাই দিয়ে সংসার চলে না, সব আমার কামাই'-এর মতো বাক্যগুলো কারও কারও মুখে দৈনন্দিনই শোনা যায়। অথচ এই উপার্জনের মাধ্যমে সে মোটেও নারীর ওপর ইহসান করছে না। কারণ এটা তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব। একজন পাওনাদারকে টাকা শোধ করা যেমন তার ওপর ঋণী ব্যক্তির ইহসান নয়, তেমনই একজন পুরুষের উপার্জন নারীর ওপর ইহসান নয়। বরং একজন নারী তা প্রাপ্য।

তাই আমাদেরকে আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ড ঠিক রাখতে হবে। তবেই নারী-পুরুষের মাঝে আচরণের ভারসাম্য বজায় থাকবে। আল্লাহ নারী পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়, পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সম্পর্কের ভিত্তি হিসাব-নিকাশ নয়, বরং প্রেম ও আত্মত্যাগ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের

সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া তৈরি করে দিয়েছেন।'(সূরা রুম,২১)

নারী-পুরুষের ব্যাপারে যৌথভাবে ইসলামে যে নির্দেশনা রয়েছে, তাকে যদি কেউ একতরফাভাবে দেখে, তাহলে সে ইসলামের ভারসাম্য বুঝতে পারবে না। যেমন কেউ শুধু নারীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা দেখল, তাদেরকে স্বামীর সন্তুষ্টি হাসিলের নির্দেশ করা হয়েছে, ঘরের ভেতরই তাদের মূল অবস্থান স্থির করা হয়েছে ইত্যাদি, তখন সে ভাববে ইসলাম নারীদের অবহেলা করেছে এবং পুরুষদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আবার কেউ পুরুষদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনাগুলো দেখল; পুরুষদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট বউদের হাতে, নারীর ভরণপোষণ, আবাসন, ঘরোয়া কাজসহ সব ধরনের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরুষদের কাঁধে, তখন সে মনে করবে ইসলাম পুরুষদের ওপর জুলুম করেছে। অথচ ব্যাপার তা নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। তার পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা বাদ দিয়ে খণ্ডাংশ নিয়ে পড়ে থাকলে ফাসাদ হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীপুরুষ কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একজন অপরজনের পরিপূরক। তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা প্রতিযোগিতার নয়, ভালোবাসার। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একে অন্যের পোশাকস্বরূপ।'(সূরা বাকারা,১৮৭)

Feminism Classification (নারীবাদের শ্রেণিবিভাগ)

১. Liberal Feminism

>এটি নারীবাদের এমন একটি ধারা যা নারী-পুরুষের সমান আইনি, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

এরা বিশ্বাস করে সমাজের আইন ও নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

২. Radical Feminism

>এই ধারা মনে করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই নারীর নিপীড়নের মূল কারণ।

তারা পরিবার, সামাজিক কাঠামো ও প্রচলিত gender role পরিবর্তনের দাবি করে।

৩. Marxist Feminism

>এই ধারা অনুযায়ী নারীর শোষণের মূল কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা।

এরা নারীর শ্রম ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

৪. Socialist Feminism

>এটি Radical Feminism ও Marxist Feminism এর সমন্বিত রূপ।

এরা মনে করে নারীর নিপীড়নের পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় কারণ কাজ করে।

৫. Cultural Feminism

>এই ধারা নারীর স্বতন্ত্র গুণাবলি, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়।

তারা মনে করে নারীর কোমলতা, সহানুভূতি ও মানবিক বৈশিষ্ট্য সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৬. Eco Feminism

>এই মতবাদ নারী নিপীড়ন ও প্রকৃতির শোষণের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করে।

এরা মনে করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী ও প্রকৃতি উভয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

৭. Postmodern Feminism

>এই ধারা gender, পরিচয় ও সত্যকে পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক হিসেবে দেখে।

এরা মনে করে সব নারীর অভিজ্ঞতা এক নয় এবং সমাজভেদে তা ভিন্ন হতে পারে।

৮. Islamic Feminism

>এটি কুরআন ও ইসলামী উৎসের আলোকে নারীর অধিকার ও মর্যাদা পুনর্ব্যাখ্যার চেষ্টা করে।

সমালোচকদের মতে এতে পশ্চিমা নারীবাদের প্রভাব রয়েছে।

নারীবাদের উদ্ভব ও বিস্তৃতি(তরঙ্গসমূহ)

First Wave Feminism (প্রথম তরঙ্গ নারীবাদ)

প্রথম তরঙ্গ নারীবাদ মূলত উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নারী অধিকার আন্দোলন। এই wave-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীদের মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সে সময় পশ্চিমা সমাজে নারীরা ভোটাধিকার, সম্পত্তির মালিকানা এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত ছিল। সমাজে নারীদের ভূমিকা কেবল গৃহকেন্দ্রিক হিসেবে বিবেচিত হতো এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নারীরা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। বিশেষত women suffrage movement (নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন) এই wave-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই তরঙ্গের মাধ্যমে নারীরা আইনি স্বীকৃতি ও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম বহু শতাব্দী পূর্বেই নারীদের উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও বিবাহে সম্মতির অধিকার প্রদান করেছে। ফলে প্রথম wave-এর কিছু দাবি ইসলামী ন্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

Second Wave Feminism (দ্বিতীয় তরঙ্গ নারীবাদ)

দ্বিতীয় তরঙ্গ নারীবাদ ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। প্রথম wave যেখানে মূলত আইনি অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে দ্বিতীয় wave সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন বিষয়কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। এই wave-এর মূল দাবি ছিল workplace equality (কর্মক্ষেত্রে সমতা), reproductive rights (প্রজনন অধিকার), sexual freedom (যৌন স্বাধীনতা) এবং traditional gender role-এর বিরোধিতা। “Personal is Political” স্লোগানের মাধ্যমে নারীবাদীরা দাবি করেন যে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার অংশ। এই wave-এর অনেক প্রবক্তা marriage institution (বিবাহপ্রথা), motherhood (মাতৃত্ব) এবং traditional family structure (প্রচলিত পরিবারব্যবস্থা)-এর সমালোচনা করেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই wave-এর কিছু ধারণা সমালোচিত, কারণ ইসলাম পরিবারব্যবস্থা, নৈতিকতা ও শালীনতাকে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা

করে। ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বৈধ বিবাহের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক এবং unrestricted sexual freedom অনুমোদিত নয়।

Third Wave Feminism (তৃতীয় তরঙ্গ নারীবাদ)

তৃতীয় তরঙ্গ নারীবাদ ১৯৯০-এর দশকে আত্মপ্রকাশ করে এবং এটি পূর্ববর্তী wave-গুলোর তুলনায় অধিক বৈচিত্র্যময় ও জটিল রূপ ধারণ করে। এই wave individuality (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য), diversity (বৈচিত্র্য) এবং gender identity (লিঙ্গ পরিচয়)-এর উপর গুরুত্বারোপ করে। এই wave-এর চিন্তাবিদরা মনে করেন যে সব নারীর অভিজ্ঞতা এক নয়; বরং জাতি, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে নারীদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। এখান থেকেই intersectionality ধারণার উদ্ভব ঘটে। একই সঙ্গে gender fluidity (পরিবর্তনশীল লিঙ্গপরিচয়) এবং self-defined identity (নিজস্ব পরিচয় নির্ধারণ)-এর মতো ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে। ইসলামী দৃষ্টিতে এই wave-এর সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হলো gender identity-কে পরিবর্তনশীল হিসেবে উপস্থাপন করা। কারণ ইসলাম নারী ও পুরুষকে আল্লাহপ্রদত্ত স্বতন্ত্র পরিচয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং gender fluidity ধারণাকে গ্রহণ করে না।

Fourth Wave Feminism (চতুর্থ তরঙ্গ নারীবাদ)

চতুর্থ তরঙ্গ নারীবাদ ২০১০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি মূলত digital activism (ডিজিটাল আন্দোলন)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। Social media platform ব্যবহার করে নারীদের অধিকার, sexual harassment (যৌন হয়রানি), body positivity এবং LGBTQ rights-এর বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরি করা হয়। #MeToo movement এই wave-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে নারীরা যৌন নির্যাতন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে শুরু করে। একই সঙ্গে এই wave body autonomy (শরীরের উপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ) এবং unrestricted self-expression-এর বিষয়েও গুরুত্ব দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর নিরাপত্তা, সম্মান ও হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও শরীয়াহবিরোধী যৌন স্বাধীনতা, LGBTQ normalization এবং নৈতিক সীমাহীনতার ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম স্বাধীনতাকে নৈতিকতা ও আল্লাহপ্রদত্ত সীমার মধ্যে পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ দেয়।

(নারীবাদের সমালোচকদের মতে বর্তমান সমস্যাসমূহ)

১. Family Breakdown (পারিবারিক ভাঙন)

সমালোচকদের মতে modern feminism:

~marriage commitment (বৈবাহিক অঙ্গীকার) দুর্বল করেছে।

~divorce culture (বিচ্ছেদ সংস্কৃতি) বৃদ্ধি করেছে।

~motherhood (মাতৃত্ব) কে burden (বোঝা) হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

Result (ফলাফল)

~single parent family (একক অভিভাবক পরিবার) বৃদ্ধি।

~children mental instability (সন্তানের মানসিক অস্থিরতা)।

~family bonding collapse (পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়া)।

২. Gender Conflict (নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব)

কিছু Radical Feminism:

~men as oppressor (পুরুষকে নিপীড়ক হিসেবে) portray করে।

~masculinity demonize (পুরুষত্বকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন) করে।

Result (ফলাফল)

~male-female mistrust (নারী-পুরুষের অবিশ্বাস)

~marriage fear (বিবাহভীতি)

~social tension (সামাজিক উত্তেজনা)

৩. Sexual Liberalism (যৌন স্বাধীনতাবাদ)

Modern feminism-এর কিছু ধারা promote করে:

~premarital relationship (বিয়ের পূর্ব সম্পর্ক)

~hookup culture (অস্থায়ী যৌন সম্পর্ক সংস্কৃতি)

~Unrestricted sexual freedom (সীমাহীন যৌন স্বাধীনতা)

~Criticized Effects (সমালোচিত প্রভাব)

~zina increase (ব্যভিচার বৃদ্ধি)

~STD spread (যৌনরোগ বিস্তার)

~Emotional instability (মানসিক অস্থিরতা)

~broken relationships (সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া)

৪. LGBTQ & Gender Ideology (এলজিবিটিকিউ ও জেন্ডার মতবাদ)

Postmodern Feminism support করে:

~gender fluidity (পরিবর্তনশীল লিঙ্গ ধারণা)

~non-binary identity (দ্বৈততার বাইরের পরিচয়)

~LGBTQ normalization (সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ)

Islamic Criticism (ইসলামিক সমালোচনা)

অনেক আলেমের মতে এটি:

~fitrah conflict (স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরোধী)

~family system weaken (পরিবারব্যবস্থা দুর্বল)

~identity confusion create (পরিচয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি)

৫. Motherhood Devaluation (মাতৃত্বের অবমূল্যায়ন)

সমালোচকদের মতে কিছু feminist narrative:

~housewife role (গৃহিণীর ভূমিকা) কে inferior (নিম্ন) দেখায়।

~career success (পেশাগত সফলতা) কে ultimate goal (চূড়ান্ত লক্ষ্য) বানায়।

৬. Modesty Decline (শালীনতা হ্রাস)

কিছু feminist movement:

~hijab criticism (হিজাব সমালোচনা)

~body exposure normalization (শরীর প্রদর্শনের স্বাভাবিকীকরণ)

~sexual openness (যৌন উন্মুক্ততা) promote করে।

Result (ফলাফল)

~haya decline (লজ্জাশীলতা কমে যাওয়া)

~objectification increase (পণ্যায়ন বৃদ্ধি)

~moral instability (নৈতিক অস্থিরতা)

৭. Religious Authority Challenge (ধর্মীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ)

কিছু Islamic feminist interpretation:

~inheritance law reinterpretation (উত্তরাধিকার আইনের পুনর্ব্যাখ্যা)

~gender role criticism (লিঙ্গভূমিকার সমালোচনা)

~polygamy opposition (বহুবিবাহ বিরোধিতা)

করে।

Critics' Opinion (সমালোচকদের মত)

এতে fixed shariah rulings (স্থায়ী শরীয়াহ বিধান) প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

৮. Identity Crisis (পরিচয় সংকট)

Modern feminism-এর কিছু ধারণা:

~traditional femininity rejection (প্রচলিত নারীত্ব প্রত্যাখ্যান)

~self-defined identity (নিজে পরিচয় নির্ধারণ) promote করে।

Result (ফলাফল)

~youth confusion (তরুণদের বিভ্রান্তি)

~loneliness (একাকীত্ব)

~unstable relationship (অস্থির সম্পর্ক)

~depression increase (হতাশা বৃদ্ধি)

৯. Hyper Individualism (চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা)

Modern feminism অনেক সময়:

~"my body my choice" absolute autonomy (পরম ব্যক্তিস্বাধীনতা) promote করে।

Criticism (সমালোচনা) এর ফলে:

~family responsibility decline (পারিবারিক দায়িত্ব কমে)

~self-centered culture (আত্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি)

~collective values weaken (সমষ্টিগত মূল্যবোধ দুর্বল)

১০. Westernization in Muslim Society (মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্যকরণ)

অনেক ইসলামি গবেষকের মতে feminism:

~western secular values (পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ)

~Islamic gender law doubt (ইসলামিক gender law নিয়ে সন্দেহ)

~hijab resistance (হিজাব বিরোধিতা) বৃদ্ধি করেছে।

Islamic Conclusion (ইসলামিক উপসংহার)

অনেক ইসলামি চিন্তাবিদের মতে modern feminism-এর কিছু ধারা:

~fitrah opposing (স্বাভাবিক প্রকৃতিবিরোধী)

~family destructive (পরিবার ধ্বংসকারী)

~morality weakening (নৈতিকতা দুর্বলকারী)

~religion conflicting (ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক) প্রভাব সৃষ্টি করেছে। তবে নারীশিক্ষা (women's education), নির্যাতনবিরোধী সচেতনতা (anti-abuse awareness) এবং কিছু মৌলিক অধিকার (basic rights) প্রতিষ্ঠায় feminism-এর কিছু ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলেও কিছু গবেষক মত দেন।

নারী-স্বাধীনতার নামে পর্দাহীনতার দিকে আহ্বান

নারীস্বাধীনতার আহ্বায়কেরা নারীদের ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে পাঁচটি ধাপে কথাহীনতার প্রতি আহ্বান করে:

প্রথম ধাপ: পুরুষের সামনে চাদর খুলে ফেলা, নেকাব উন্মোচন করা।

এই কাজে নারীদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কুরআন কারিমের আয়াত ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে বলা হতে থাকে যে, ইসলামে চেহারার কোনো পর্দাই নেই। এই দাবিও করা হয়, নারী সাহাবিরা, এমনকি উম্মুল মুমিনিনরাও চেহারার পর্দা করতেন না।

দ্বিতীয় ধাপ: গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে মেলামেশা।

নেকার অবমুক্তকারী নারীদের বোঝানো হয়ে থাকে, এখন তাদের ঘরে আগত পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা দরকার এবং নারী-পুরুষের অবাধ সম্মিলিত অনুষ্ঠানে যাওয়া দরকার। এভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বভাবজাত লজ্জা-শরম উঠিয়ে দেওয়া হয় আর তার নাম দেওয়া হয় প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন। তার পক্ষে দলিলের স্তূপ হাজির করা হয়। যেমন মিশরের সেক্যুলার চিন্তাবিদ কাসেম আমিনের বক্তব্য:

যখন পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা না হবে, তারা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। একে অপরের চরিত্র ও মানসিকতা বুঝতে পারবে না। যদি স্বামী-স্ত্রী বিবাহের পূর্বে একে অপরকে না বুঝতে পারে তাহলে পরবর্তীতে অল্প সময়েই বিচ্ছেদের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্র্যাকটিস আরম্ভ হয়ে যায় নার্সারি থেকেই। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষ প্রথম থেকেই একসাথে ওঠাবসা করবার ফলে ধীরে ধীরে অন্য লিঙ্গের প্রতি জন্মগত দ্বিধা তাদের থেকে দূর হয়ে যায়। এবং মিশ্রিত পরিবেশে থাকা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে ওঠে। কারণ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকেই। যে-কারণে কিছুটা অনুভবের বয়সে উপনীত হবার পর ছেলেমেয়ে পড়াশোনার

চেয়েও বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক রক্ষার পেছনে অধিক সময় ব্যয় করতে থাকে, যার ক্ষতি দৃষ্টিগোচর হয় তাদের জীবনের পরবর্তী দিনগুলোতে।

তৃতীয় ধাপ: চার দেয়ালের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি।

পর্দার অভ্যাস শেষ করে দেবার পর আহ্বান করা হয়, ঘরে লুকিয়ে থেকে গোঁড়ামির বহিঃপ্রকাশ করা নারীর উচিত নয়; বরং তার কর্তব্য ঘরের বাইরে পা রেখে দুনিয়া দেখা। তার পক্ষে দলিল হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, খাইরুল কুরুন বা শ্রেষ্ঠ যুগের নারীরাও ঘরের বাইরে বের হতেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন।

এ ছাড়াও এক্ষেত্রে মুসলিম নেতাদের বোন-স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির করা হয়ে থাকে। যেমন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী বেগম রা'না লিয়াকত আলী খান, বেগম খালিকুজ্জামান, মিসেস নুসরাত ভুট্টো, বেনজির ভুট্টো-এদের মধ্যে কেউ-ই পর্দা ই করেননি। সবাই ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে জনসাধারণের সেবা করে গেছেন। এই দলিলটি বেশ প্রভাবক হয়ে দেখা দেয়। এ ছাড়াও মিডিয়াতে দৃশ্যমান চিত্রাবলিও বেশ অনায়াসেই নারীদের ঘর থেকে বের হয়ে পড়তে এবং নেকাব ও পর্দা ছুঁড়ে ফেলতে প্ররোচিত করে থাকে।

চতুর্থ ধাপ: পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা।

পরবর্তী ধাপ হয় নারীকে একেবারে কর্মের ময়দানে নামিয়ে আনা। নারীকে বলা হয়ে থাকে, জীবনের প্রতিটি বস্তর নারীর বিভায় আলোকিত হয়ে আছে। যে কারণে প্রতিটি মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভার মূল্য আদায় করে স্বাবলম্বী হওয়া প্রত্যেকের স্তরেই আগ্রহের সাথে তাদের অংশ নেওয়া উচিত। এবং যুক্তিযুক্ত আয়-উপার্জনের কর্তব্য। স্বাবলম্বী হলেই একজন নারী পুরুষের ইজারাদারি ও নজরদারি থেকে মুক্ত হতে পারে। বোরকা ছুঁড়ে ফেলে অবাধ পরিবেশে সময় পার করা আধুনিক-মনস্ক যে নারী তার কাছে এইসব কথা খুবই আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে। তারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরম্ভ করে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী; এমনকি রাজনীতিতে পর্যন্ত পুরুষের কাজ করবার জন্য অতি দ্রুত তৈরি হয়ে যায়। এবং শিক্ষা, বাণিজ্য, ট্রান্সপোর্ট থেকে সাথে মিলেমিশে কাজ আরম্ভ করে দেয়। ইসলামি দেশগুলোর অ্যাসেম্বলিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে। প্রতিটি বড় প্রতিষ্ঠানের অফিসে বড় অফিসারের সেক্রেটারি হয়ে থাকে কোনো মেয়ে। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে যাকে বসের সকল

তামাশা ও রঙ্গ-রসিকতা সহ্য করে যেতে হয়। এমনকি অনেক সময় তাকে নিজের সম্মানও হারিয়ে বসতে হয়।

পঞ্চম ধাপ: শিল্প-সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ।

পঞ্চম ধাপে এসে নারীকে শেখানো হয়-সেলস গার্ল, সেক্রেটারি অথবা এয়ার হোস্টেস হবার থেকেও বহুগুণ লাভের কাজ হল নিজের সৌন্দর্য ব্যবহার করে অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিপুল অর্থবিত্ত ও খ্যাতির অধিকারী হয়ে ওঠা। যার কাছে সামান্য কিছু সৌন্দর্য আছে এবং সে তার লজ্জা-শরম সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত-এমন সব নারীর জন্য আজ শোবিজের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এমন মেয়েদের মডেল, অভিনেত্রী, নর্তকী বা কলগার্ল বানিয়ে তার শরীর এবং আয়ার প্রতিটি সৌন্দর্য ও লাবণ্য সারা দুনিয়ার পুরুষের জন্য অবারিত করে দেওয়া হচ্ছে। এই শ্রেণির নারীদের দ্বারা যে চারিত্রিক অবক্ষয় প্রসার লাভ করছে, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এভাবেই আমাদের সমাজ পৌঁছে যাচ্ছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে: এবং এর মাধ্যমে ধর্মহীন শক্তির দেড় শতকের যে প্রয়াস, তা সফলতা ও পূর্ণতার সাথে এগিয়ে চলছে।

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ এবং সুরক্ষা-ব্যবস্থা

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে কিছু মৌলিক কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার। ইসলামি বিধান বুঝতে এবং বেশ কিছু ভুল ধারণা দূর করতে তা সহায়ক হবে। নারীবিষয়ে ইসলাম এবং পশ্চিমের দৃষ্টিকোণের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পশ্চিম নারীর আত্মা ও শরীরকে পুরুষের জন্য অধিক থেকে অধিকতর জাদুকরী করে তুলতে চায়। পশ্চিমে পুরুষেরা এমন পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যার মাধ্যমে মানবিক প্রবৃত্তি এবং চাহিদা বেশি পরিমাণে মেটানো যায় এবং তারা চায়, কামনা চরিতার্থ করবার পথে কোনো প্রকারের বাধা-প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে।

ইসলাম নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য এমন উপযুক্ত ও পবিত্র পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যা পার্থিব কাজের জন্যও সুবিধাজনক হবে এবং হবে তাদের আত্মিক উন্নতির জন্যও সহায়ক। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা নিজের নাজুকতম সৃষ্টি নারীদের জন্য পবিত্রতা ও নিরাপত্তার একটি সমৃদ্ধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তাকে শরিয়তের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন।এটা এমন ব্যবস্থা, যেখানে নারীর সতীত্ব সংরক্ষিত থাকে এবং মুসলিম

পুরুষও ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে। ইসলামের চারিত্রিক ব্যবস্থা এমন পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যেখানে মানুষ আত্মিক প্রশান্তির সন্ধান লাভ করবে এবং খুঁজে পাবে শারীরিক প্রশান্তিও। রুহানিয়্যাত হাসিলের পাশাপাশি কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই তার শরীর ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ হতে থাকবে। যখন মানুষের প্রবৃত্তিগত চাহিদা উপযুক্ত পদ্ধতিতে পূরণ হতে থাকে তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় না।

আল্লামা ইবনুল জাওযি এই বিষয়ে 'সাইদুল খাতির' গ্রন্থে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন, যার সারসংক্ষেপ হল, আল্লাহ তায়ালা যেভাবে মানুষের মধ্যে খাবারের ক্ষুধা তৈরি করেছেন সেভাবে তার মধ্যে প্রবৃত্তির ক্ষুধাও দিয়ে দিয়েছেন, এবং উভয় চাহিদার পেছনেই একটি উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে। ক্ষুধার পেছনের উদ্দেশ্য হল মানুষের শরীর যেন টিকে থাকে (আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, মানুষের দেহ প্রতি মুহূর্তেই নির্মাণ এবং ভগ্নদশার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সেই ত্রুটি পূরণ করবার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সাথে খাদ্যগ্রহণের মধ্যে মানুষের জন্য স্বাদও রেখে দিয়েছেন। কেননা স্বাদ না থাকলে খাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজে পরিণত হয়ে উঠতো। আর মানুষ যদি ভালো মতন খাদ্য গ্রহণ না করত তাহলে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তো। সে-কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে ক্ষুধার চাহিদা এবং খাবারগ্রহণের মধ্যে স্বাদ দিয়ে রেখেছেন। যার কারণে মানুষ আগ্রহের সাথে নিজের শরীরের এই চাহিদা পূর্ণ করে থাকে।

মানুষের মাঝে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে- তার পেছনেও একটি মহান লক্ষ্য রয়েছে। আর তা হল, আল্লাহ তায়ালা চান, মানুষের বংশধারা যেন চলমান থাকে।ক্ষুধার মতন প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাবার মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন 'স্বাদ'; আনন্দ। যদি এই স্বাদ বা আনন্দ না থাকত তাহলে বহু মানুষ লজ্জা ও শরমের কারণে স্ত্রীমিলন করত না। তা ছাড়া সন্তানের দায় থেকে বাঁচার জন্যও বহু মানুষ স্ত্রীসহবাস থেকে দূরে থাকত। কিন্তু প্রবৃত্তির চাহিদার কারণে মানুষ এই কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। এই তৃপ্তির কারণেই শারীরিক সম্পর্ককে আনন্দের সাথে; বরং একপ্রকার বাধ্য হয়েই যেন-বা সম্পূর্ণ জোশ নিয়ে একজন মানুষ নিজের যৌনচাহিদা পূরণ করে থাকে। আর এভাবেই মানুষের বংশরক্ষার উদ্দেশ্য সম্পাদন হতে থাকে।

এখন মূলকথায় আসা যাক। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে খাবারদাবারের মধ্যে হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা রেখেছেন সেভাবে প্রবৃত্তির চাহিদাপূরণের মধ্যেও কিছু সীমা-

পরিসীমা রেখে দিয়েছেন। পানাহারের ক্ষেত্রে একজন মানুষ যদি শরিয়ত ও আখলাকের সকল সীমালঙ্ঘন করে খোরাক হাসিলের পেছনে পড়ে তাহলে তার দুর্নাম রটে যায়। রুটিরুজির জন্য কারুর সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হলে বা চুরি করা হলে তার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে যদি কেউ সীমালঙ্ঘন করে বসে তখন তার দুর্নাম হয় আরও অনেক বেশি। ক্ষতিও হয়ে থাকে সম্পদের চেয়েও বহু মূল্যবান বস্তুর: ইজ্জত ও সম্মানের।

কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষের আরেকজন জীবন্ত জাগ্রত মানুষের দরকার হয়। এবং তারা উভয়েই আপন সমাজ ও পরিবারের অংশ হয়ে থাকে। যদি তারা শরিয়ত ও আখলাকের সকল সীমালঙ্ঘন করে নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে তাহলে এর ফলে কেবল তাদের সম্মান-মর্যাদায় অমোচনীয় কলঙ্ক পড়ে যায় তা-ই না; বরং উভয়ের পরিবারও লজ্জার মুখে পড়ে এবং সারা জীবন ধরে অর্জিত সম্মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশে যায়।

তারপর তাদের এই কাজ, যা সাময়িক প্রবৃত্তির প্রশমনে করা হল, যদি অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক পন্থায় হয়ে থাকে তাহলে মানবীয় সত্তার সৃষ্টি-উপকরণ নষ্ট করবার কারণে তা অনেক বড় অন্যায় হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর যদি তা হয়ে থাকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই তাহলে তাদের এই মিলন আরেকজন মানুষের জন্মের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আর এটা একজন নবজাতকের অধিকার যে, দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই বাবা-মায়ের আইনসম্মত পৃষ্ঠপোষকতা, ভালোবাসায় আগলে রাখবার মতন পরিবার এবং একটি সম্মানজনক বংশীয় ধারা তাকে দেওয়া হবে। যদি এই সম্পর্কটি শরিয়তের বিধানের বিপরীতে হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ একটি বংশধারার অধিকার খর্ব করা হবে এবং অনাগত প্রজন্মের সকলের গলায় লজ্জা ও অপমানের বেড়ী পড়ে যাবে।এই সকল বিষয় সামনে রেখে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর জন্য যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে, তা পানাহারের সীমাবদ্ধতার থেকেও বহুগুণ বেশি সতর্কতামূলক,কঠিন ও জটিল।

ফলত এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, অমুক অমুক সম্পর্ক হালাল। এবং অমুক অমুক সম্পর্ক হারাম। শরিয়ত স্পষ্ট বলে দিয়েছে-কার দ্বারা প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো যাবে আর কার দ্বারা যাবে না। যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, তাকে মাহরাম নির্ধারণ করা হয়েছে। যার সাথে বিবাহ বৈধ, তাকে গায়রে মাহরাম বলা হয়েছে। আর এই গায়রে মাহরামদের সাথেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা

রাখা হয়েছে, যাতে করে ফেতনা ও নৈরাজ্যের দরজা উন্মোচিত না হয়। পুরুষকে নজর অবনত রাখবার এবং নারীকে পর্দা ও হিজাব ব্যবহার করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম নারীকে মা-বোন ও স্ত্রী-কন্যা হিসেবে যে অবস্থান দিয়েছে, পশ্চিমে তার কল্পনাও করা সম্ভব নয়। এরপরও, শরয়ি প্রতিবন্ধকতাগুলো গুরুত্বের সাথে আমলে নেওয়ার পরও, মুসলিম নারীরা যে কর্মযজ্ঞ আনজাম দিয়ে দেখিয়েছেন, তা বর্ণনার জন্য বিশাল কলেবরের গ্রন্থ দরকার। যেমন: উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্দার মধ্যে থেকেও উম্মাহর কাছে অজস্র হাদিস পৌঁছে দিয়েছেন এবং ফিকহের ক্ষেত্রে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের ইতিহাস মহান সব নারী ফকিহ, মুহাদ্দিস, এবং কবি-সাহিত্যিকের আলোচনায় পূর্ণ। এ ছাড়াও অসংখ্য সৃস্বতী-সাধ্বী নারী এমন গত হয়েছেন, যাদের গর্ভে জন্ম নিয়ে, যাদের কোলে বেড়ে উঠে ইতিহাস ও সময়কে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন জিয়াদ, মাহমুদ গজনবী, মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মতন বীর সন্তানেরা। এমনকি তারা 'গুমনাম' থাকাই পছন্দ করেছেন। সন্তানের নেক প্রতিপালনের মাধ্যমে একজন নারী সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে যে ভূমিকা পালন করে তা হাজারো মহৎ কাজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে যে অধঃপতিত প্রজন্ম তৈরি হয়, কোনো চাকুরি বা কোনো প্রকারের উন্নতি তাদের কোনো উপকার করতে পারে না।

পর্দার গুরুত্ব বোঝার জন্য এই কথাটিও মনে রাখতে হবে, ইসলাম যখন কোনো অপরাধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তখন তার অনেক দূরবর্তী অনুঘটকও নিষেধ করে দিয়েছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কিত বিষয়টিও একই ধরনের, যেখানে বড় অন্যায়ের দূরবর্তী অনুঘটককেও নিষেধ করা হয়েছে। মূলত এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা। কারণ, একজন মানুষ, পুরুষ হোক বা নারী, আল্লাহ তায়ালার কাছে তার মূল্য অনেক। দুনিয়াতেও আমরা দেখি, যদি কোনো বস্তু অনেক মূল্যবান হয় তাহলে সর্বাত্মকভাবে তা সংরক্ষণের এন্তেজাম করা হয়ে থাকে। কারেন্সির বাজারে দুজন অস্ত্রধারী পাহারাদার রাখাই যথেষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু যে জাদুঘরে হিরা সংরক্ষিত থাকে সেখানে প্রতি কদমে পাহারাদার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই ধরনের মূল্যবান বস্তুর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামান্য ঝুঁকি নেওয়াও বিবেকসমর্থিত নয়।

আল্লাহ তায়ালার কাছে তার প্রতিটি বান্দার মূল্য হিরার চাইতেও বহুগুণ বেশি। তাকে সংরক্ষণ করবার জন্য কেবল শরীর নয়; বরং চিন্তার পবিত্রতার প্রতিও পূর্ণ লক্ষ রাখা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা চিন্তা পবিত্র রাখবার জন্য দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণশক্তিকেও

গায়রে মাহরাম থেকে বাঁচিয়ে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলেছেন। কারণ এইক্ষেত্রে সামান্য থেকে সামান্য ঝুঁকি নেওয়ারও অবকাশ নেই।

দূরবর্তী অনুঘটক থেকে বেঁচে থাকবার পাশাপাশি বিবাহের জন্য মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি, ইজাব-কবুল এবং সাক্ষ্যের উপস্থিতিকে আবশ্যক করার মাধ্যমে এই ধারাবাহিকতাকে সর্বপ্রকারের আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর বান্দা নিজেই যদি এই সকল পাবন্দি ও প্রতিবন্ধকতা ভেঙে ফেলে তাহলে তার ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক নৈরাজ্যের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে।

পর্দাহীনতার ক্ষতি

পর্দাহীনতার ক্ষতি বা অপকার অসংখ্য, যার কিছু হল:

১. পবিত্রতা এবং সতীত্ব মানুষের সবচাইতে বড় সম্পদ। সতীত্ব মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি। পারিবারিক সম্পর্কের মূল; এবং মানবীয় বংশ-প্রজন্মের সংরক্ষক। যদি সতীত্ব লীন হয়ে যায় তাহলে সবকিছু শেষ হয়ে পড়ে।

২. মানুষের প্রতিপালনে ভালোবাসা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু যে পরিবারে বাবা-মায়ের মধ্যকার ভরসা নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে প্রতি মুহূর্তে ঘৃণা জন্ম নিতে থাকে। ভালোবাসার নামগন্ধও সেখানে নজরে পড়ে না। ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে সন্তান একেবারে বেপরোয়া হয়ে যায়। তার সঠিক প্রতিপালন আর সম্ভব হয় না। এভাবে ঘরও ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তানও।

৩. পর্দাহীনতার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাস তৈরি হয়। হার্দিক বোঝাপড়া থাকে না। ঘরের মধ্যে কোনো প্রকারের শান্তি ও প্রশান্তি আর দেখা যায় না।

৪. বংশ সমাজেরই একটি মৌলিক একক। যখন বংশধারাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে তখন সমস্ত সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

৫. মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রশান্তির সন্ধান করে। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই, সমাজে তার অবস্থান যেমনই হোক না কেন, প্রশান্তির সন্ধানে থাকে। কিন্তু আত্মার প্রশান্তি এবং শারীরিক ও দৈহিক স্বস্তি ব্যতীত বাস্তবিক প্রশান্তি কল্পনা করা যায় না। আর এমন প্রশান্তি কেবল স্ত্রীর সাথে বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এই সম্পর্ককে

মজবুত করবার জন্য প্রধান ভূমিকাই পালন করে পর্দা ও দৃষ্টির হেফাজত। বেপর্দা এবং বেপরোয়া নজর এই সম্পর্ককে আরও দুর্বল করে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে আত্মিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত করে ফেলে।

৬. পর্দাহীন পরিবেশ এবং সতীত্বমুক্ত সমাজে বংশধারা ও পরিবার-ব্যবস্থা একদমই ধ্বংস হয়ে পড়ে, সম্পর্কগুলো লীন হয়ে যায়। প্রতিটি সম্পর্কের সূচনার মূলে থাকে কেবল প্রবৃত্তির চাহিদা,যা কয়েক সপ্তাহ, আবার কখনো মাত্র কয়েক ঘন্টাতেই ফুরিয়ে আসে।

নারী মুক্তির চূড়ান্ত পরিণতি

এবার আমরা পশ্চিমা সমাজে সফল নারীদের কিছু গল্প শুনবো।কারণ তাদের জীবনের দিকে না তাকালে আমরা বাস্তবতাটুকু বুঝতে পারবো না।তাদের সফলতা বলতে কর্পোরেট জব ও অধিক কামাই কে বুঝানো হয়।যদিও তাদের মধ্যে ইসলাম নেই।তবে যেহেতু আমাদের মুসলিম মেয়েরা সবদিক দিয়ে পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে আগ্রহী,তাই তাদের লাইফস্টাইলের কুফল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা বাধ্যতামূলক।মুসলিম মেয়েদের ঘর থেকে বের করে কর্পোরেট জবের প্রতি উৎসাহিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়।যাদের মতো হওয়ার জন্য আমাদের মোটিভেট করা হয়,তাদের চোখে বিশ্ব দেখতে কেমন?তারা কীভাবে ভ্রান্তির পেছনে নিজের জীবন শেষ করছেন তা দেখে শিক্ষা নেয়াটাই আমার উদ্দেশ্য।শুরু করা যাক-

একটি সিক্রেট বলি-এটা খুব বেদনাদায়ক একটা ব্যাপার। আমেরিকার মাঝবয়সি উচ্চপদস্থ নারীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের কোনো সন্তান নেই।

২০০১-এর জানুয়ারি মাসে আমেরিকার উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের নিয়ে দেশব্যাপী একটা জরিপ করা হয়। এতে দেখা গেছে যে, ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সি উচ্চ-উপার্জনকারী নারীদের মধ্যে ৩৩% নিঃসন্তান এবং কর্পোরেট নারীদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৪২%।এসব নারীরা কি ইচ্ছা করেই সন্তানহীন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? মোটেই না, বরং ঠিক তার উলটো। এদের মধ্যে বেশিরভাগই একটিমাত্র সন্তানের জন্য পৃথিবীর সব কষ্ট সইতে রাজি। এই উদ্দেশ্যে তারা হাজার হাজার ডলার এবং অঢেল সময় ব্যায় করেছেন, নিজেদের শরীরকে অপমানজনক সব

মেডিক্যাল চিকিৎসার সম্মুখীন করেছেন, বারবার করছেন। এমনকি এসব করতে গিয়ে নিজেদের সাধের ক্যারিয়ারের ক্ষতি হলেও তারা পিছপা হননি।

অথচ এতসবের ফলে তারা কী পেয়েছেন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লবডঙ্কা।

কারণ, মেডিক্যাল সাইন্স যতই উন্নতি করুক-না কেন, ৪০ বছর বয়সের পর সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি মাত্র ৩-৫% ক্ষেত্রে সফল হয়। এত টাকা, এত পরিশ্রম-বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সব জলে যায়।

আজকের উচ্চপদস্থ নারীদের জন্য গর্ভধারণের মতো এমন একটা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, আদিম প্রক্রিয়া এত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন? এখন তো আমরাআমাদের নানি-দাদিদের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত, বেশি উপার্জন করি, তাদের তুলনায় আমাদের ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ অনেক বেশি। তার ওপর আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে, তা ছাড়াও গর্ভধারণের এমন সব নতুন রাস্তা আমাদের জন্য খোলা হয়েছে-যা আগের যুগে কল্পনা করা যেত না।এত সব নতুন সুযোগ-সুবিধা আমাদের পারিবারিক জীবনে কোন ছাই কাজে লাগছে? সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আমরা আগের যুগের নারীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে গেছি। আমরা লেখক হতে পারি, নেত্রী হতে পারি, আভিজাত কোনো কোম্পানির বস হতে পারি-একমাত্র মা হতে গিয়েই আমরা হিমশিম খাচ্ছি।

এরকম কেন হলো? কবে কীভাবে হলো? এর উত্তর জানার জন্য আমরা ব্রেকথ্রু প্রজন্মের কয়েকজন উচ্চপদস্থ নারীর গল্প শুনব। তারা যখন যৌবনে পা দেন, তখন নারী আন্দোলনের যুদ্ধ চলছে। তারাও লড়াইয়ে যোগ দেন এবং তুমুল যুদ্ধ করে এমন সব শিখরে পৌঁছান যেখানে যাওয়ার স্বপ্ন তাদের মা-খালারাও কোনো দিন দেখেননি। তারপর একসময় তারা উপলব্ধি করেন-বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক দেরিতে-যুদ্ধ লড়তে গিয়ে যেসব জিনিস তারা হারাতে বসেছেন, তার মধ্যে একটি হলো মাতৃত্ব। ক্যারিয়ার আর পরিবার একসাথে সামলানো তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব সাব্যস্ত হয়েছে।

বর্তমানে তাদের বয়স ৪৫-এর বেশি, অর্থাৎ গর্ভধারণের সময় আর নেই।

এইসব নারী তাদের জীবনের যুদ্ধ এবং ত্যাগের গল্প আমাদের বলতে চান, অত্যন্ত জরুরি কিছু তথ্য ও উপলব্ধি শেয়ার করতে চান। যেসব কঠিন, নির্মম বাধার মুখোমুখি তাদের হতে হয়েছে, সেগুলো যেন আজকের যুগের মেয়েরা এড়িয়ে চলতে পারে, এটাই তাদের অভিপ্রায়। তাদের গল্প এখনকার তরুণীদের জন্য সতর্কবাণী।আমি জানি-

আজকের মেয়েরা অসতর্ক কিংবা অবুঝ নয়; তারা জানে-রাস্তা কঠিন। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সিনিয়র নারীদের পারিবারিক জীবনের অতৃপ্তি এবং একাকিত্বকে তারা চাক্ষুস দেখেছে।

আমার দুশ্চিন্তা এই নিয়ে যে, এখনকার মেয়েরা মনে করে পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই-সময় বদলেছে, অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের বিশ্বাস এখনকার নিয়োগকর্তারা পরিবারবান্ধব অনেক সুযোগ-সুবিধা দেন, এখনকার ছেলেরা স্ত্রীদের প্রতি অনেক বেশি সাপোর্টিভ এবং এখন প্রযুক্তি এত উন্নত হয়েছে যে, মেয়েরা চল্লিশের পরেও অনায়াসে গর্ভধারণ করতে পারে। একদিন একজন ২৯ বছর বয়সি নারী উকিল আমাকে দারুণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিল: '৭০ আর ৮০-র দশকের অগ্রগামী নারীদেরকে ক্যারিয়ারের ওয়াস্তে অনেক কঠিন বলিদান দিতে হয়েছে। আমাদের ব্যাপার আলাদা। আমরা ক্যারিয়ার ও পরিবার-দুটোই অর্জন করব।'কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি আছে কি? আমার তো মনে হয় না।

সুতরাং, ব্রেকথ্রু প্রজন্মের নারীদের বক্তব্য জানা দরকার। তাদের কাছ থেকে নতুন প্রজন্মের মেয়েদের অনেক কিছু শেখার আছে-তাদের জীবনের কোন পথগুলো সঠিক গন্তব্যের দিকে গেছে, কোনগুলো ছিল কাঁটায় ভরা, কোন বাঁকে তারা হোঁচট খেয়েছেন, তারপর কীভাবে আবার সামলে নিয়েছেন। কোন পথগুলোতে চলে তারা সুখ-সমৃদ্ধির গন্তব্যে পৌঁছেছেন, আর কোন পথগুলোর শেষে ছিল শুধুই অনুশোচনা।

এবার ওয়েন্ডির গল্প দিয়ে শুরু করি।

ওয়েন্ডি ওয়াসারস্টিন

ওয়েন্ডি সৌভাগ্যবানদের একজন। কারণ, তিনি দশ বছরের চেষ্টার পর অবশেষে একটি সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে সাংবাদিক লিষ স্মিথ এই সুখবরটির ঘোষণা করেন।

নিউজডে পত্রিকায়-

'ব্রডওয়ের সবচেয়ে প্রতিভাশালী নাট্যকারদের একজন, মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে একটি মেয়ে-সন্তান জন্ম দিয়েছেন। মাতৃত্বের স্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা ওয়েন্ডির বহুদিন ধরেই, তাই শিশুটিকে পেয়ে তিনি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন। যদিও প্রিম্যাচিউর হওয়ার কারণে আরও কিছুদিন শিশুটিকে হাসপাতালেই কাটাতে হবে। (বাবার নাম প্রকাশ করা হয়নি)। অনেক অভিনন্দন আপনাকে, ওয়েন্ডি। আপনি নিজের আকাঙ্ক্ষা নিজের মতো করে পূর্ণ করেছেন।'

আসলে পত্রিকায় যতটা হালকাভাবে লেখা হয়েছে, ব্যাপারটা মোটেই এত সহজ ছিল না। ওয়েন্ডির বয়স বেশি হওয়ার কারণে গর্ভাবস্থায় তার একটি গুরুতর জটিলতা দেখা দেয়, যেটির কারণে মাত্র ৬ মাসের অপরিণত গর্ভজাতককে সি-সেকশন করে বের করে আনতে হয়। ফলে প্রথম দশ সপ্তাহ ওয়েন্ডি নিজের শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিতে পারেননি। দিনের পর দিন তিনি শুধু এনআইসিইউর কাঁচের জানালা দিয়ে ছোট্ট মানুষটিকে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে দেখেছেন। এরকম একটি সংকটের সময়ে ওয়েন্ডির পাশে দাঁড়ানোর জন্য তার সন্তানের বাবাও উপস্থিত ছিল না।যাইহোক, ৪৮ বছর বয়সে সন্তান জন্ম দেওয়া যে চাট্টিখানি কথা নয়-সেটা সবাই জানে।

নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় ওয়েন্ডিকে 'ব্রেকথ্রু প্রজন্মের কণ্ঠ' আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, এই প্রজন্মের অসাধারণ নারীদের সাফল্য এবং কষ্টের গল্পগুলো শুধু ওয়েন্ডির নিজের জীবনেই নয়, সেই সাথে তার গল্পের নারী চরিত্রগুলোর জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে। ষাট এবং সত্তরের দশকে যে সমান-অধিকার আইনগুলো পাশ হয়েছিল, এই নারীরা সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন, ফলে তাদের জন্য অনেক বন্ধ দরজা খুলে গেছে। কর্মক্ষেত্রে এর ফলাফল প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ছিল-ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো নারীরা ভর্তির সুযোগ পায়, ফুটবলের মাঠে পর্যন্ত নারী খেলোয়াড়রা বল নিয়ে নেমে পড়ে এবং নারীরা নিজ উদ্যোগে মর্গেজ নেওয়ার অনুমতি পায়। তাদের পারিবারিক জীবনেও অনেক নতুন পরিবর্তন আসে, তবে এই পরিবর্তনগুলো সব ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাব্যস্ত হয়নি।

দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদের কারণে যেসব বন্ধ দরজা খুলেছে, সেগুলোর সাথে ওয়েন্ডি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে (গর্ভধারণের ঠিক পূর্বে) একটা সাক্ষাৎকারে তিনি জোর দিয়ে বলেন-আমি মনে করি নারী আন্দোলন আমার জীবন বাঁচিয়েছে-এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার মাকে কেউ একজন বলেছিল যে 'স্মিথ কলেজে পড়া মানে পরকীয়া করা, আর হোলিহক কলেজে পড়া মানে বিয়ের ফুল ফোটা।' বলা বাহুল্য, মা আমাকে হোলিহক কলেজেই পাঠান। আমি যদি ৫০-এর দশকে সেখানে ভর্তি হতাম, তাহলে আসলেই এতদিনে কোনো এক ধনী লোকের ঘরকন্না সামলাতাম এবং সেই সাথে আমার আত্মার একটা বড়ো অংশের মৃত্যু হতো। আমার ক্রিয়েটিভদিকটা নষ্ট হয়ে যেত।

ঠিক সেই সময় নারী আন্দোলনের আবির্ভাব আমাকে বাঁচিয়ে দিলো, আমার সুযোগের পরিসর বেড়ে গেল। আমি নিজের লেখার ক্ষমতার সাথে পরিচিত হতে পারলাম এবং

জানলাম যে, আমার মতামতেরও দাম আছে। আশ্চর্য লাগে যে, একটা মাত্র চেতনা এমনভাবে জীবনের দিক পরিবর্তন করতে পারে।তবে ওয়েন্ডির জীবনের পারিবারিক অংশটিতে নারী আন্দোলনের প্রভাব ছিল অন্যরকম।

মাতৃত্ব ব্যাপারটা আমার কাছে সব সময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি আমি ছেলে হতাম, তাহলে এই পর্যায়ে একজন সুন্দরী, শিক্ষিতা ৩৪ বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে করতাম এবং সেই মেয়ে নিজের ক্যারিয়ার স্থগিত রেখে আমার সন্তানদের জন্ম দিত আর লালনপালন করত। হয়তো সংসারের খরচ বাড়ার কারণে আমার আয় বাড়াতে হতো, নতুন কিছু লেখার কাজ হাতে নিতে হতো, কিন্তু তাতে আমার কোনোই আপত্তি থাকত না।

তার বদলে গত সাত বছর ধরে আমি সিঙ্গেল মা হওয়ার চেষ্টা করছি। শুরু করেছিলাম পার্গোনাল দিয়ে। দুই বছর সেটা খেয়ে যখন বাচ্চা হলো না, তখন আরও আধুনিক ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিলাম। পাঁচ বছর ধরে জিআইএফটি।। করলাম, সাত বার আইভিএফ করলাম, এমনকি সারোগেসির ওখি চেষ্টা করলাম।প্রথমে ল্যাবে কৃত্রিম উপায়ে ভ্রূণ তৈরি করা হলো আমার ডিম্বাণুর সাথে অপরিচিত একজন পুরুষের শুক্রাণু মিশিয়ে। তারপর সেই ভ্রূণগুলো নিজের গর্ভে পালার জন্য মার্সি নামক একজন নারী এলাস্কা থেকে আসেন। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ভ্রূণগুলো কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, আর বেচারি মার্সিকে আলাস্কা ফিরে যেতে হয়।(১.জিআইএফটি- gamete intrafallopian tube transfer.

২.বন্ধ্যত্বের চিকিৎসার একটি পদ্ধতি, যাতে একজন নারীর ডিম্বাণুর দিয়ে তৈরি ভ্রূণ আরেকজন নারীর গর্ভে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় নারী যদি গর্ভধারণ করেন, তবে গর্ভাবস্থা সম্পন্ন করে শিশুর জন্ম দেওয়ার পর, জেনেটিক মায়ের কাছে শিশুটি হস্তান্তর করে দেন, অনেক ক্ষেত্রেই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।)

এই ক-বছরে আমি এত রকমের ট্রিটমেন্ট করিয়েছি এবং এত রকমের ইনজেকশন আমার রক্তে মেশানো হয়েছে যে, আমার সবগুলোর কথা মনেও নেই। এত সব করে কী লাভ হয়েছে? শুধু এটা প্রমাণ হয়েছে যে-আমি বন্ধ্যা, আমি আসলে মেয়েই না।

শুরুর দিকে প্রযুক্তি নিয়ে দারুণ আশাবাদী ছিলাম। ডাক্তারের কাছে যাবেন, তিনি নানান রকম নতুন পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে একটা বেছে নিতে বলবেন এবং সন্তানলাভের প্রতিশ্রুতি দেবেন। এরপর দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে যাবে এবং এত দিন

লাগাতার এসব ট্রিটমেন্টের ঠেলা সামলানোর পর, এক পর্যায়ে আপনি নির্যাতিত, বিধ্বস্ত বোধ করতে শুরু করবেন, দেউলিয়া হওয়ার কথা তো বলা বাহুল্য।

ক্লিনিকের দেওয়ালগুলোতে সারে সারে শিশুদের ছবি সাজিয়ে রাখা হয়, সেগুলোর মধ্যে থেকে একটি শিশুও কি তারা আমার কোলে তুলে দিতে পারে না? এত কিছুর পরেও তারা পারেনি।

আমার এখন মনে হয়, এসব প্রযুক্তির উন্নতির কারণে ছাই লাভ হয়েছে। আমার প্রজন্মের এমন নারীদের কথা ধরেন-যারা কর্মক্ষেত্রে আকাশ ছুঁয়েছেন; অথচ ৪০ পেরিয়ে যাওয়ার পরও মা হতে পারেননি। এসব নতুন প্রযুক্তি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা কর্মক্ষেত্রে যত কীর্তিই ফলিয়ে থাকুক, বাচ্চা না থাকলে তারা সম্পূর্ণ নয় এবং এরপর যখন তারা এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করেও মা হতে বার্থ হন এবং তাদের বেশিরভাগই আমার মতোই নিঃসন্তান থেকে যায়—তখন কর্মজীবনের পরিতৃপ্তি ও নারীত্বের আত্মবিশ্বাস দুটো একই সাথে মিইয়ে যায়। এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে আমি চরম বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হই, এত খারাপ জীবনে আর কখনো লাগেনি।

ওয়েন্ডির কথাগুলো থেকে তার মনের তিক্ততার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য তিনি মা হওয়ার পর তার সাথে আমার আর কথা হয়নি। এই সাফল্যের কারণে নিশ্চয় প্রজনন প্রযুক্তির ব্যাপারে তার ধারণা পালটেছে: কিন্তু ১৯৯৯ সালে তিনি এসব নতুন প্রযুক্তি নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না।'প্রজনন-প্রক্রিয়ার ঝক্কিগুলো কেন সব সময় মেয়েদেরকেই সহ্য করতে হয়?' প্রতিবাদের সুরে বলেন তিনি। 'অল্প বয়সে জন্মনিয়ন্ত্রণের ভারও আমাদের ওপর ছিল, আর এখন বাচ্চা নেওয়ার জন্য খোদাই জানেন-কী-না-কী সব ইনজেকশন আমাদের শরীরে ঢোকানো হচ্ছে। পুরুষদের কেন এসব কিছু করতে হয় না?মাতৃত্বের তৃষ্ণা যে কী রকম ভয়ানক তীব্র হতে পারে, তা বলে বোঝানো যাবে না। আমি এখনো হার স্বীকার করিনি। এখনো পালক সন্তান নেওয়ার জন্য উকিলরা ফোনে অফার দেন, আর ভাবছি টেস্ট টিউব বেবির জন্য আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। যতদিন সন্তান জন্ম দিতে সফল না হচ্ছি, ততদিন আমার স্বস্তি নেই।বলতে বলতে এই অসাধারণ সংগ্রামী নারীর গলা ধরে যায়। এর ঠিক দুই মাস পরই তিনি গর্ভধারণ করেন।

ওয়েন্ডি ওয়াসারস্টিন, আমেরিকার পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী একজন নাট্যকার, আমার প্রজন্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় নারীদের একজন। অথচ সন্তানলাভের জন্য তার এই দীর্ঘদিনের কঠিন সংগ্রামে তার আকাশছোঁয়া খ্যাতি কোনো কাজে লাগেনি। উলটো তার

এইসব সাফল্যই একটি সুখী পারিবারিক জীবন গড়ার পথের কাঁটা হয়ে যায়। কারণ, এগুলো তার পুরুষ সঙ্গীদের ইগোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।একবার তার একজন দীর্ঘদিনের বয়ফ্রেন্ড তাকে হুমকি দেয় যে তার নাটক 'আনকমন উইমেন' যদি ব্রডওয়েতে মঞ্চস্থ হয়, তাহলে সে ওয়েন্ডিকে ছেড়ে দেবে। একদিকে নাটক ব্রডওয়ের মঞ্চে উঠল, অন্যদিকে বয়ফ্রেন্ডও চলে গেল।৪০ পার হওয়ার পর ওয়েন্ডি সিদ্ধান্ত নেন যে, এবারে স্বামী খোঁজা বাদ দিয়ে নিজেই একটা সন্তান নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর তখনই তিনি সম্মুখীন হন নতুন সমস্যার-বয়সজনিত বন্ধ্যত্ব।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যে নারী যত সফল, তার স্বামী এবং সন্তান থাকার সম্ভাবনা তত কম; অথচ পুরুষদের বেলায় ঠিক তার উলটো। পুরুষরা যত বেশি সফল হয়, তাদের সুখী সংসার পাওয়ার সুযোগ তত বৃদ্ধি পায়। এক জোড়া পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যায়: কর্পোরেট নির্বাহী নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের বাৎসরিক বেতন এক লাখ ডলার বা তার ওপরে, তাদের মধ্যে ৪৯ শতাংশ সন্তানহীন, অথচ একই স্তরের পুরুষদের বেলায় এই সংখ্যা মাত্র ১৯ শতাংশ।

সফল পেশাদারদের মাঝে পারিবারিক সাফল্যের ক্ষেত্রে এই চরম লিঙ্গভিত্তিক ব্যাবধানের উদাহরণ দেখতে বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই-ওয়েন্ডির নিজের পরিবারেই আছে এর স্পষ্ট নমুনা। ওয়েন্ডির ভাই ব্রুস ওয়াসারস্টিন একজন অত্যন্ত সফল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। ওয়েন্ডি যখন প্রিএক্লাম্পসিয়ার [১] কারণে মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে ভর্তি, ঠিক সেই সপ্তাহেই একই হাসপাতালে তার ভাইয়ের স্ত্রী ভর্তি হয়। ৩৪ বছর বয়সি ক্লড ওয়াসারস্টিন ব্রুসের দ্বিতীয় স্ত্রী।একদিকে ওয়েন্ডি তার ৭৯০ গ্রাম ওজনের ছয় মাসের প্রিম্যাচিউর, পিতৃহীন শিশুকে জন্ম দেয়, অন্যদিকে তার ভাইয়ের ৩.৬ কেজি ওজনের নাদুসনুদুস একটি ছেলে-সন্তান হয়। এটি ব্রুস ও ক্লডের দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম স্ত্রীর থেকে ব্রুসের আরও তিনটি সন্তান আছে।প্রাচুর্য ও খ্যাতি ক্রসের মতো পুরুষদের জীবনে সুন্দরী স্ত্রী আর ফুটফুটে সন্তানের আবির্ভাব ঘটায়। আর সেই একই প্রাচুর্য ও খ্যাতি ওয়েন্ডির মতো নারীদের জন্য বয়ে আনে একাকিত্ব।

[১. প্রিএক্লাম্পসিয়া: একটি গর্ভজনিত জটিলতা, যার কারণে গর্ভবতী মায়ের উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে মা ও শিশু দুজনেরই মৃত্যুর ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।]

তবুও অবশেষে ওয়েন্ডির সন্তান হয়। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরের এক রবিবার সকালে তিনি তার এই বিস্ময়কর সাফল্যের গল্প বলেন, RESOLVE নামের একটি সংস্থার

বার্ষিক কনফারেন্সে। এই সংস্থাটি সারা দেশে বন্ধ্যত্বের ব্যাপারে তথ্য ও সাহায্য প্রদান করে। কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয় সেই একই মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে; যেখানে লুসির জন্ম হয়েছিল। এতে ৫০০ জন অংশ নেন-কিছু দম্পতি, কিছু অবিবাহিত নারী-সবাই বন্ধ্যত্ব চিকিৎসার ভুক্তভোগী। উদ্বোধনী বক্তব্যে ওয়েন্ডি তাদের সাথে নিজের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সাফল্যলাভের গল্পটি শেয়ার করেন: 'সাত বছর আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন কিছু হলো না, তখন ভাবলাম যে হাল ছেড়ে দিই।'

তবে হাল ছাড়ার ঠিক আগেই, একটি রেস্টুরেন্টে তার প্রথম ফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একজনের সাথে ওয়েন্ডির দেখা হয়ে গেল। তিনি জানালেন যে, ইদানীং এমন নতুন প্রযুক্তি বেরিয়েছে-যা ওয়েন্ডিকে সাফল্যের ৫০% নিশ্চয়তা দেবে। এর ছয় মাসের মধ্যে ওয়েন্ডি গর্ভধারণ করেন, কিন্তু তারপর শুরু হয় নতুন কিছু সমস্যা।গর্ভধারণের ষষ্ঠ মাসে ওয়েন্ডির প্রিএক্লাম্পসিয়া ধরা পড়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। প্রথম দিকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু ষোলো দিন যেতে-ই হঠাৎ করে অসুস্থতা বেড়ে যায়। ডাক্তাররা সিজারিয়ান করার সিদ্ধান্ত নেন। ১২ সেপ্টেম্বর, বিকেলে ওয়েন্ডির মেয়ের জন্ম হয়: নাম লুসি জেন, লম্বায় ১৪ ইঞ্চি, ওজন ৭৯০ গ্রাম। লুসিকে প্রথমবার কোলে নেওয়ার অনুভূতি কেমন ছিল? ওয়েন্ডির মতে: 'লুসি প্রায় ওজনহীন ছিল। পুতুলের পায়ের মতো ছোট্ট দুটো পা। ওর ডায়পারগুলো ছিল একটা সিগারেটের প্যাকেটের সমান।'লুসির দীর্ঘদিনের হাসপাতাল যাপনের সময় ওয়েন্ডি কয়েকবার আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ইহুদিদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় দিন ইয়োম কিপুরের সন্ধ্যায়, ওয়েন্ডি হাসপাতালে এসে দেখেন যে, মেয়ের নাকেমুখে রেস্পিরেটর টিউব লাগানো-লুসিকে সেদিন রক্ত দিতে হয়েছিল। আরেকদিন গিয়ে দেখেন, তার মেয়ের ছোট্ট টুপিটা মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠেন, হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে দৌড়ে যান ডাক্তারের খোঁজে। ডাক্তার বলেন যে, লুসির ব্রেইনের ভেন্ট্রিকেলগুলো অস্বাভাবিকরকম বড়ো, তাই নিয়মিত ওর ব্রেইনের সনোগ্রাম করতে হচ্ছে।এত সব মেডিক্যাল বিপর্যয় সত্ত্বেও ছোট্ট লুসি কিন্তু হাল ছাড়েনি। সব সমস্যাকে জয় করে সে তরতর করে বেড়ে উঠতে থাকে। জন্মের দশ সপ্তাহ পর সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে, মায়ের কোলে চড়ে বাড়ি যায়।

এসব ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার পর ওয়েন্ডি অবশেষে ধরা গলায় বলেন,

এই সপ্তাহে লুসির এক বছর পূর্ণ হয়েছে এবং সে দিব্যি বেড়ে উঠছে-এটা হলো প্রথম মিরাকল। আর আমি যে মেডিক্যাল-প্রযুক্তির সাহায্যে বাচ্চা নিতে সক্ষম হলাম এবং

সেটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলো-এটা দ্বিতীয় মিরাকল।অডিটোরিয়ামের চারিদিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, দর্শকদের প্রায় প্রত্যেকের চোখ ভেজা।

স্টেলা পারসন্স

স্টেলা পারসন্স, বয়স ৪৫, আমার পুরনো বন্ধু। ১৯৯১ সালে আমরা একই ক্লিন্টন ট্রাঞ্জিশন টিমের সদস্য ছিলাম। সেদিন সকালের কনফারেন্সের পরে আমার স্টেলার সাথে দেখা করার কথা। সে এই কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্যই আমার শহরে এসেছে।মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের একটা বারান্দায় বসে আমরা দুজন কফি খাচ্ছি আর ভাবছি এরপর কনফারেন্সের কোন সেশনে যাওয়া যায়। ওয়েন্ডির বক্তব্য শুনে স্টেলা অনেক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে।

'আমি জানি ওয়েন্ডির কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্য ছিল না; বক্তা হিসেবে সে খুব মজার, সাহসী আর স্পষ্টভাষী, তার নাটকের অসাধারণ নারী চরিত্রগুলোর মতোই; কিন্তু বন্ধ্যত্বের কষ্ট আর না-পাওয়ার হতাশার ব্যাপারে তার আরও বলা উচিত ছিল। সেই অডিটরিয়ামে যত নারী দর্শক ছিল, তারা হয় হাজার চেষ্টা করেও বাচ্চা নিতে অক্ষম হচ্ছে; নয়তো বাচ্চা হওয়ার পর মারা যাচ্ছে। আর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়েন্ডি-একটা চলন্ত মিরাকল। ৪৮ বছর বয়সে সে গর্ভধারণ করে। শুধু তাই না, ৭৯০ গ্রাম ওজনের একটা বাচ্চা জন্ম দেয়, সেই বাচ্চা বেঁচেও যায়, আবার এখন দিব্যি সুস্থভাবে বড়ো হচ্ছে। আমি জানি না, ওর অলৌকিক সৌভাগ্যের ব্যাপারটা কীভাবে হজম করব। আমার গল্প যে ওর থেকে পুরোই উলটো।'

আমি চুপ করে বসে রইলাম। স্টেলা অভিমানী মুখ করে ওর কফিতে চিনি ঢালছে। বুঝলাম ওর আরও বলার আছে।

'আমার রাগ হচ্ছে কেন জানো? কারণ, এই সৌভাগ্যের একটা বড়ো কারণ হচ্ছে টাকা। এই নারী ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের পেছনে বালতি বালতি টাকা ঢেলেছে। হিসেব করে দেখো-সাতটা আইভিএফ, দুবার সারোগেসির অসফল চেষ্টা-শুধু এই কয়টা হিসেব করলেই মোট খরচ দাঁড়ায় এক লাখ ত্রিশ হাজার ডলার। আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের জন্য সে কি খুব অনুকরণীয় রোল মডেল? আমার স্বামী জন আর আমি তিনবার টেস্ট টিউব বেবির চেষ্টা করি, তাতেই আমাদের বাড়ির ওপর দ্বিতীয় মর্গেজ নিতে হয়। আর তাতে কচু লাভ হয়! তিনবারই ফেল। আর শুধু তাই না, আমাদের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে যায় যে, গোটা দু-বছর অনেক হিসেব করে চলে টাকা জমিয়ে তারপরই আরেকবার চেষ্টা করার কথা ভাবতে পারি।

'আমি জানি ওয়েন্ডিও অনেক ভুগেছে, কিন্তু তারপরও সে কি জানে-কেমন লাগে যখন ৪৩ বছর বয়সে তোমার উর্বরতার ঘড়ি জোরেজোরে ঢংঢং করা শুরু করে দিয়েছে, অথচ কিছু করার মতো আর্থিক সামর্থ্য না-থাকায় তোমাকে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে? জানে না।' স্টেলার কণ্ঠস্বর উঁচু এবং রুক্ষ হয়ে গেছে।এর দুদিন পর আমি স্টেলার সাথে আবার দেখা করি। একসাথে বসে যখন লাঞ্চ করছি, তখন জানতে পারলাম যে-স্টেলা ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন চেয়ারপার্সন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমি ওকে অভিনন্দন দিতে যাচ্ছি, এমন সময় ও আমাকে থামিয়ে দিলো। 'আমার কর্মজীবনের এত সাফল্যের ছিটেফোঁটাও যদি ব্যক্তিগত জীবনে পড়ত!' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। কিন্তু আমার বন্ধ্যত্বের সমস্যার জন্য দায়ী আসলে আমি নিজেই। বয়স যখন কম ছিল, তখন আমি চেষ্টা করিনি।'

এরপর স্টেলা আমাকে ওর যৌবনের গল্প বলল।

'ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সময় আমার একটি ছেলের সাথে এঙ্গেজমেন্ট হয়। সেই ছেলে আমার এক বান্ধবীর সাথে লুকিয়ে প্রেম করে, তাই আমি ওকে ছেড়ে দিই। তারপর পিএইচডি শেষ করে (ডিউকে পিএইচডি করতে আর যাযাবরের জীবন হবে-তা আগে বুঝিনি। প্রথমে এক বছর ছিলাম সান্টা ক্রুজ অনেক সময় লাগে) শিক্ষকতা শুরু করি, কিন্তু সেটা যে এমন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র শহরে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছুটিরত শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে। এরপর তিন বছর কাটাই চ্যাপেল হিল শহরে, এক বছর ব্র্যান্ডাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশেষে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনিউর ট্র্যাক পদ পেয়ে গেলাম। এত ঘুরাঘুরির কারণে এমন কোনো ছেলের দেখা পাইনি; যার ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়া যায়।ভ্যান্ডারবিল্টে গিয়ে অবশেষে জনের সাথে দেখা হলো। আমার বয়স তখন ৩৭পেরিয়েছে, তাই আর সময় নষ্ট করিনি। জন আর আমি এক বছরের মধ্যে বিয়ে করে বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা শুরু করি। প্রথম ছয় মাসে গর্ভধারণ করিনি, পরের ছয় মাসেও না। পরের ছয় মাসেও না।আমার জন্য এটা ছিল বড়ো একটা ধাক্কা। মা হওয়া আমার সারা জীবনের স্বপ্ন। তাই যখন এতদিনেও কিছু হলো না, তখন মনে প্রশ্ন জাগল-আমি কি বন্ধ্যা? ভেবেই কষ্টে বুক ফেটে গেল। আমার সাথে কেন এমন হলো? আমি তো শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। একটা জিনিস পরিষ্কার ছিল-আমাকে সময় নষ্ট না করে এখনই ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে; কিন্তু তখনই একটা আকস্মিক সমস্যা দেখা দিলো-জনের অনিচ্ছা।

মাসের পর মাস ও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওর কথা হচ্ছে, অযথা এত টাকা খরচ করে এসব ট্রিটমেন্ট করার চেয়ে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করেই দেখি, হয়তো এমনিতেই ভাগ্য সায় দেবে। আর আমার কথা হচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে তত আমার ডিম্বাণুর সংখ্যা কমে আসছে, তাই যা করার এখনই করতে হবে; যদিও আমার বয়স তখন মাত্র ৩৮। আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, ক্রমশ আমার উর্বরতার সূর্য ঢলে পড়ছে। আমার মাসিকের পরিমাণ দিনদিন কমে আসছিল। যেন আমার শরীর আমাকে সংকেত দিচ্ছে-আর বেশি সময় নেই।আমি বলছি না যে, জন খারাপ। ও একজন খুব ভালো মানুষ এবং অবশেষে ও ঠিক কাজটাই করে এবং আমাকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করে। আসলে সমস্যাটা ছিল প্রবৃত্তিগত। আমার নারীত্ববোধ আমাকে তাড়া দিচ্ছিল যে, শীঘ্রই মেনোপজ এসে যাবে, সময় কম। পুরুষ হওয়ায় ওর এই তাড়া ছিল না; কারণ, পুরুষদের উর্বরতার সময়সীমা অনেক বেশি। এমন না যে, ও সন্তান চায় না। ও চায় ঠিকই, কিন্তু ওর আমার মতো প্রবৃত্তিগত দুশ্চিন্তা নেই। এখনো অনেক বছর সময় আছে, তাড়া কীসের?

অন্য মানুষের বাচ্চা দেখলে আমার চোখ চুম্বকের মতো আটকে যায়-ওর আটকায় না। যখন কেউ ছোটো বাচ্চাকে ওয়াকারে নিয়ে বের হয়, আমি ঝুঁকে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে হাসি দিই, আর নিজের শরীরের শিহরণগুলো অনুভব করে অবাক হই, যেন আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটা ছোট্ট শরীরকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। প্লে-গ্রাউন্ডে বসে ছোটোছোটো বাচ্চাদের ছুটোছুটি দেখি আর আকুল হয়ে ওদের হাসির শব্দ শুনি। শিশুদের অকৃত্রিম আনন্দের খিলখিল শব্দ যে কী মধুর-শুনে প্রতিবার আমার গায়ে শিহরণ হয়।

অবশেষে আমরা বন্ধ্যত্ব চিকিৎসা শুরু করি। ৪ মাস ক্লোমিড খাবার পর অবশেষে আমি গর্ভধারণ করতে সক্ষম হই। যেন খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছিল আমাদের জীবনে।১১ সপ্তাহ পর আমার গর্ভপাত হয়।আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলেন, বাচ্চার হার্টবিট শুনতে পাচ্ছেন না। স্ক্রিনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম-একটা ছোট্ট, অপূর্ণ শরীরের অবয়ব-নিথর, নির্জীব।এটাকে বলে মিড্ মিসক্যারেজ, মানে কোনো ব্যথা, রক্তপাত বা অন্য কোনোরকম দুর্ঘটনার আভাস ছাড়াই জরায়ুর ভেতর বাচ্চার মৃত্যু হওয়া।

সেদিনের কষ্টের কথা আমি কখনো ভুলব না। প্রথমবার হারানোর কষ্ট, সহ্য করা কঠিন ছিল। খুব কঠিন।পাশাপাশি এইচএসজি নামক একটি টেস্ট করি: যেটা দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় কয়েক মাস পর আমরা আবার চেষ্টা করি। এবার আমি ক্রোমিড

খাওয়ার যে, আমার ডিম্বনালিগুলো পরিষ্কার আছে। আবারও আমি গর্ভধারণ করি। দেখতে দেখতে তিন মাস পার হয়। আর ভয় নেই। আমরা প্রায় নিশ্চিন্ত, এবার হবেই। দুজনে মিলে বাচ্চার কিছু নাম বাছাই করলাম।

এবার তেরো সপ্তাহে মিসক্যারেজ হয়, আবারও মিসড মিসক্যারেজ। এবারের কষ্টটা আরও বেশি কঠিন ছিল।এরপর আমরা কোমর বেঁধে নামি। আমাদের বাড়ির ওপর দ্বিতীয় ঋণ নিয়ে আইভিএফের জন্য নাম লেখাই। ১২ মাসে তিনটি আইভিএফ চক্র সম্পন্ন করি এবং তৃতীয়বারে সফলভাবে গর্ভধারণ করি। এবারে ৫ সপ্তাহ পর গর্ভপাত হয়।নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, এবারের গর্ভপাতটা এত আগে হয়েছে যে, এটা অন্যগুলোর মতো দুঃখজনক নয়। আসলেই কি তাই? জানি না। শুধু এটা জানতাম যে, আমাকে একটা দেওয়াল গড়তে হবে। আমার এবং আমার জমে থাকা কষ্টের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য দেওয়াল।তিনবার আইভিএফ করে আমরা নিঃস্ব হয়ে যাই। শুধু আর্থিক অবস্থার কথা বলছি না। মাসের পর মাস মনের ওপর যেই টানাহ্যাঁচড়া হলো-বারবার আশার আলো জেগে ওঠা, আবার ধপ করে নিভে গিয়ে সব অন্ধকার হয়ে যাওয়া-তাতে আমাদের মানসিক শক্তি লোপ পায়। আমাদের দাম্পত্য জীবনেও এর গুরুতর প্রভাব পড়ে।এক সময় আমার নিজের শরীরের ওপরই বিরক্তি চলে আসে, আমার প্রজনন অঙ্গগুলোকে ঘৃণা করতে শুরু করি। যদি এগুলো কোনো কাজেই না আসে, তাহলে প্রতি মাসে অযথা রক্তক্ষরণ, ব্যথা-বেদনা সহ্য করতে বিরক্ত লাগবে না তো কি?

নিজেদের ক্ষতগুলোকে সারাতে সময় লাগবে, তাই আমরা দুইজনেই ঠিক করলাম-কিছুদিন বিরতি নেবো। আড়াই বছরের বিরতির পর, এখন আবার নতুন করে শুরু করতে যাচ্ছি। এই কনফারেন্সে আসাটা আমার নতুন চেষ্টার প্রথম ধাপ, আমার জন্য এখনো কী কী পথ খোলা আছে-তা জানার প্রচেষ্টা।

আমাদের প্রজন্মকে যে মূলমন্ত্র শেখানো হয়েছিল, তাতে বিস্তর গণ্ডগোল আছে। আমাদের বলা হয়েছিল, 'পুরুষরা যা করে তোমরাও তাই করো। কাজ করে হাত ক্ষয় করে ফেলো যতক্ষণ না নিজের কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও।ক্যারিয়ারের জন্য যা ত্যাগ স্বীকার করা লাগে, সব করো।'কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস, যদি তুমি বাচ্চা চাও, তাহলে পুরুষের প্রতিযোগিতামূলক আদর্শকে অনুকরণ করলে লাভ হবে না।

এখন আমি আমার ছাত্রীদের শিক্ষা দিই, 'আধগড়া ক্যারিয়ার ছাড়তে ভয় পেয়ো না। তোমরা স্মার্ট, বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত এবং জীবনের এখনো দীর্ঘ সময় বাকি। ক্যারিয়ারকে পুনরায় ধরা যেতে পারে, কিন্তু উর্বরতার সময়কাল খুব সীমিত-সেটা

একবার উড়ে গেলে সেটাকে আর ধরা যাবে না। সন্তানহীনতা নিয়ে যেন পরে অনুতাপ করতে না হয়।'

এই গল্পগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্রেকথ্রু প্রজন্মের নারীদের সবচেয়ে কষ্টদায়ক সংগ্রামের একটি হলো মেনোপজের থাবা থেকে সন্তান ছিনিয়ে আনার চেষ্টা। কেউ কেউ এতে সফল হয়, তবে বেশিরভাগই ব্যার্থতা স্বীকার করে নেয়। অঢেল টাকা আর অলৌকিক সৌভাগ্যের প্রয়োজন হয়-যা ওয়েন্ডির ছিল; কিন্তু স্টেলার ছিল না। যেই নারীরা ব্যার্থ হয়, তাদের কেউ কেউ আবার পরে গিয়ে সন্তান পালক নেয়, প্রায় সময় একাই সিঙ্গেল মা হিসেবে।তাদের জন্মদানের প্রবণতাকে অন্যভাবে গঠনমূলক কাজে লাগিয়েছে, এমন সব কাজের জন্ম দিতে যেগুলো তাদের নিজেদের এবং অন্যদের জন্য দীর্ঘদিন কল্যাণ বয়ে আনবে।

হলি অ্যাটকিন্সন

তিন বছর আগে আমার প্রথম হলির সাথে দেখা হয়। তখন আমি মনে মনে বলি, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে-কোন নারী সব দিক জয় করার ভাগ্য প্রচলিত যে সংজ্ঞা, সেটার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য তার আছে-বয়কাট সোনালি চুল, নিয়ে জন্মেছে? তাহলে আমি হলিকেই দেখিয়ে দেবো। আমেরিকায় নারী-সৌন্দর্যের নিখুঁত গড়ন-যেন গ্রেস কেলির জমজ বোন। হলি শুধু সুন্দরই নয়, সে একজন ডাক্তার এবং ই-কমার্স সেক্টরের একজন খুব প্রভাবশালী এবং উচ্চ-উপার্জনকারী কর্মজীব। অল্প বয়সে হলি তখনকার নারীদের সংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডি ভেঙে বের হয়ে আসার পেছনে অঢেল সময় এবং শ্রম ব্যয় করে। সে ছিল কোলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৪ ব্যাচের ছাত্রী, সেই ব্যাচেই প্রথমবার নারীদের ভর্তি নেওয়া হয়। এরপর সে ইউনিভার্সিটি অফ রচেস্টার স্কুল অফ মেডিসিনে ভর্তি হয়। সেখানে সে ছিল ১০৩ জনের ক্লাসে মাত্র ৭ জন নারীর একজন। হলির মেডিক্যাল কলেজের অভিজ্ঞতা খুব জঘন্য ছিল।

সেখানে যৌন-উৎপীড়ন ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত এমন সব ব্যবহার করা হতো, যা ইদানীং বেআইনি। আমাদের এনাটমি ক্লাসের অধ্যাপক ইচ্ছা করে আমাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য এনাটমির স্লাইডের মধ্যে পর্নগ্রাফির স্লাইড ঢুকিয়ে দিয়ে না-জানার ভান করত। ছেলে ছাত্ররা দারুণ মজা পেয়ে রং-তামাশায় যোগ দিত। অশ্লীল প্র্যাঙ্ক আর অকথ্য ভাষায় লেখা চিঠি প্রায়ই মুখ বুজে সহ্য করতে হতো।প্রতিবাদ হিসেবে আমি কোমর বেঁধে পড়াশোনায় লেগে পড়ি। অন্য মেয়েগুলোর সাথে আমার তেমন সক্ষতা গড়ে ওঠেনি। কারণ, হয়তো আমরা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড

অসহায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত বোধ করতাম। নারীত্বের বন্ধনের কথা শুধু একটা সময়ই মনে পড়ত-যখন আমরা কেউ একজন কোনো ভুল করতাম, তখন সেটা পুরো নারীসমাজের অক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে দেখা হত।আমার মনে আছে-একবার ওটিতে একটা অপারেশনের পর সার্জন আমাকে সুযোগ দিলো রোগীর চামড়া সেলাই করার। জানেন, আমি সেলাইয়ে খুব পারদর্শী। মা আমাকে শিখিয়েছিলেন-কীভাবে গির্জার পুরোহিতদের পোশাকে ফুল তুলতে হয়। আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন থেকেই আমরা দুজনে একসাথে বসে জরিদার রেশমি কাপড়ের ওপর সুন্দর সব ফুলের নকশা করতাম। মা সেলাইয়ের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। কাজ শুরুর আগে আমরা সাদা হাতমোজা পরে নিতাম এবং ইংল্যান্ড থেকে আনানো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের রেশমি সুতা ব্যবহার করতাম। কৈশোরে পা দিতে দিতে আমি অত্যন্ত যোগ্য কারিগর হয়ে যাই।তো আমি সেই রোগীকে সেলাই করা শুরু করলাম। রোগী ছিল মেদবহুল। মেদবহুল চামড়া সেলাই করা খুব জটিল ব্যাপার, অনেকটা ঘের দেওয়া স্কার্টের নিচে লেস লাগানোর মতো। চামড়া নিখুঁতভাবে জোড়া লাগতে চায় না। আমি বুদ্ধি করে একটা সেলাইয়ের কায়দা খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করে ফেললাম, আর পটাপট সুচ চালিয়ে গেলাম। সেলাইটাও হলো প্রায় নিখুঁত; কোনো ঢেউ নেই, কোনো ঝুলে থাকা চামড়ার টুকরো নেই। নিজের হাতের কাজ দেখে প্রচণ্ড গর্ববোধ করছি, এমন সময় সেই অহংকারী অসভ্য সার্জন আমার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল: 'আরে দ্যাখ কাণ্ড, এই নারী তো সেলাই জানে!' তারপর সেলাইটার দিকে আঙুল দেখিয়ে খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করল। সাথে যোগ দিলো তার চেলারা, অর্থাৎ ছেলে ছাত্ররা।

আমি রাগে টগবগ করছিলাম। এই জঘন্য লোকটা জানত না, আমি আমার সেলাইয়ের ব্যাপারে কতটা গর্ব অনুভব করতাম, এটা আমার জন্য কতটা অর্থপূর্ণ ছিল। ইচ্ছা করছিল ওর গলা টিপি, না হলে কমপক্ষে হাতের সুচটা ওর গায়ে ফুটিয়ে দিই; কিন্তু অবশেষে যা করলাম, তা হলো মুখ ফিরিয়ে নিলাম। শুধু লোকগুলোর থেকে মুখ ফেরাইনি। সার্জারি জিনিসটা থেকেই মুখ ফিরিয়েছি, ওর মতো লোকের অহংকারের কারণে। ব্যাপারটা দুঃখজনক; কারণ, আমি ভালো সার্জন হতে পারতাম। হাতের কাজে আমি খুব পারদর্শী।খুব মসৃণভাবে এবং জোরের সাথে এগোয়। মেডিক্যাল পড়া শেষ করার পর সে ঠিক করে চিকিৎসা-সাংবাদিক হবে। তাই সে 'ওয়াল্টার ক্রঙ্কাইট শো'-নামক একটা বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিষয়ক সংবাদ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। সেখানে দু-

বছর কাটানোর পর সে সিবিএস মর্নিং নিউজে লাইভ চিকিৎসা সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে। এরপর সে পরপর লাইফটাইম এবং রিউটার্সে উচ্চপদে সাংবাদিকতা করে। শেষের চাকরিটার সময় সে ডাক্তারদের সংবাদ সেবা প্রদানের জন্য রিউটার্স হেলথ নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ১৯৯৮ সালে তাকে healthanswers.com-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা করা হয়। প্রথম দিকে এত সব সহ্য করতে হয়েছে ঠিকই,কিন্তু হলির নিজেই স্বীকার করে যে, তার পেশাগত জীবন যতটা সাফল্যপূর্ণ ছিল, ব্যক্তিগত জীবনের পথ তেমন মোটেই ছিল না। ১৯৮৩ সালে হলি তার থেকে ১৭বছরের বড়ো একজন লোককে বিয়ে করেছিল, নাম ছিল গ্র্যান্ট।'গ্র্যান্ট ছিল আইবিএম-এ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। ওর প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কারণ হয়তো ছিল ওর অমায়িকতা এবং নম্র-ভদ্র স্বভাব। তার ওপর অন্যদের মতো ও আমার সাফল্যকে মোটেই ভয় করত না। অত্যন্ত সফল ক্যারিয়ার নিয়ে ও নিজেই অনেক প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওর আগে একজন স্ত্রী ছিল, তার থেকে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানও আছে।গ্র্যান্টকে বিয়ে করার কয়েক বছরের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমি বাচ্চার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছি। আর গ্র্যান্টও যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। আগের বিয়ের শেষের দিকে ও ভ্যাসেক্টোমি অপারেশন করিয়ে শুক্রাণুর টিউব কাটিয়ে ফেলেছিল, সেগুলোকে আবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে। [ভ্যাসেক্টোমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি, যাতে অপারেশন করে পুরুষের অন্ডকোষ থেকে শুক্রাণু বহনকারী টিউবগুলো কেটে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়; যাতে বীর্যে শুক্রাণু না পৌঁছতে পারে।]

তা-ও যখন কাজ হলো না, তখন আমরা ইনফার্টিলিটির পরীক্ষানিরীক্ষা করাই, তাতে জানতে পারি যে সমস্যা আসলে আমার। কয়েক বছর আগে আমার অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গিয়েছিল, যার কারণে ডিম্বনালিতে ক্ষত হয়ে স্কার টিস্যু তৈরি হয়। আমাদের বলা হলো যে, একমাত্র আইভিএফ করেই বাচ্চা নেওয়া সম্ভব; কিন্তু ততদিনে আমাদের দাম্পত্যজীবনে নানারকম সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আইডিএফ করার মতো মনোবল অবশিষ্ট ছিল না।ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলাও আমার জন্য কঠিন। অনেক কষ্ট হয়েছিল। কয়েক বছর পর আমাদের বিচ্ছেদ হয়। আমার বয়স তখন ৪০। বিশ্বাস করো, ৪০ বছর বয়সে ডিভোর্স হওয়াটা একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। যখন উপলব্ধি করলাম যে, আমি একা, আমি সন্তানহীনা-মনে হচ্ছিল আমার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছে।

অনেক বছর ধরেই আমি জানতাম যে, সময় থেমে থাকবে না; কিন্তু কেন যেন আমার মনে হতো, সময় অন্যদের জন্য না থামলেও, আমার জন্য ঠিকই থেমে আছে। কারণ,

আমি শক্তিশালী; কারণ, আমি পরিশ্রম করেছি এবং সফল হয়েছি। তা ছাড়া আমি একজন ডাক্তার এবং সব ডাক্তাররাই জাদুর ছড়িতে বিশ্বাস করে। তাই তো সবচেয়ে বেশি সিগারেট খায় ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা। তারা মনে করেন যে, তাদের বিশেষজ্ঞতা তাদের কোনো-না-কোনোভাবে ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা করবে। আসলে এটা পুরোই কাল্পনিক। অথচ আমিও এই জাদুর ছড়ির ভাওতায় পড়ে যাই। মনে হয়, সময় যত যাচ্ছে তত আমার গর্ভধারণের ক্ষমতা কমছে ঠিকই, কিন্তু কোনো-না-কোনোভাবে আমার মাতৃত্বের দরজা সব সময়ই খোলা থাকবে।তারপর ৪০-এ পা দিলাম। স্বামী নেই, সন্তান নেই। এখন নয়, কখনো নয়।কত রাত কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়েছি তার ঠিক নেই।'

হলির কণ্ঠ ধরে এসেছে। একটু চুপ থেকে আবার ও বলে চলল।'জানো, মানুষ যখন আমার মতো কাউকে দেখে, যে সুন্দর এবং সফল অথচ সন্তানহীন, তখন তারা মনে করে যে, এই নারী নিশ্চয় বাচ্চা পছন্দ করে না অথবা সে ক্যারিয়ারের জন্য মাতৃত্ব ত্যাগ করেছে। অনেকে তো আমার মুখের ওপরেই এসব বলে ফেলে। তখন আমার টগবগিয়ে রাগ ওঠে। কারণ, আমি এই ব্যাপারটা স্পষ্ট করেছি যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানহীনতা বেছে নিইনি।কয়েক বছর আগে আমি একাই একটি চীনা মেয়ে পালক নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম এবং কিছুদিন আগে আমি আমার বোনকে জিজ্ঞেস করি সে আমাকে তার কিছু ডিম্বাণু দেবে কি না। আমার মনে হচ্ছিল সঠিক জীবনসঙ্গীকে আর খুঁজে পাব না। আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম: কারণ, আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, আমার বয়সে শুধু তিন ধরনের পাত্র আছে। প্রথমত যারা ভালো লোক, কিন্তু তারা ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে। এরাই একমাত্র দায়িত্বশীল। দ্বিতীয় হলো, এমন পুরুষ যারা বিয়ে করেনি। তারা হয় সমকামী: নাহয় এত যাচ্ছে-তাই যেকোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মেয়ে ওদের বেছে নেবে না। তৃতীয় হলো সেই পুরুষরা যারা বিবাহিত ঠিকই; কিন্তু তাদের দাম্পত্যজীবন হলো একেকটা যুদ্ধক্ষেত্র। এরাই হয়তো সবচেয়ে খারাপ ধরনের লোক। তাদের নিজেদের বউদের ওপর মন উঠে গেছে এবং ভাবছে ডিভোর্স নেবে কি না। এরপর হলি হাসল। আমাদের দুই ঘণ্টার কথোপকথনে তার হাসি এই প্রথম দেখলাম। 'ভাগ্যিস আমার এসব হতাশাবাদী ধারণা ভুল ছিল। গত বছর আমার একজন চমৎকার পুরুষের সাথে দেখা হয় এবং আমাদের পরস্পরকে দারুণ পছন্দ হয়ে যায়। শীঘ্রই গ্যালেন আর আমি আমাদের এঙ্গেজমেন্ট ঘোষণা করব। ভাবতে পারো?'

কথাটা বলেই এই রূপসী নারী খিলখিল করে হেসে দিলো, আনন্দের রং লেগে তার সৌন্দর্য যেন আরও দীপ্তিময় হয়ে উঠল।কিন্তু সেদিন যাওয়ার আগে সন্তানের কথা ভেবে আরেকবার হলির মন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে-জানো, আমার সবচেয়ে বড়ো চাওয়া, গ্যালেনের সাথে আমার একটা বাচ্চা হোক; কিন্তু সেটা আর সম্ভব না। আমার বয়স পেরিয়ে গেছে। এখন আমরা পালক নিতে পারি অথবা ডিম্বাণু দান নিতে পারি; কিন্তু সে সন্তান তো আমার আর গ্যালেনের বংশধর হবে না।

***কিছুদিন আগে ভিলানোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উদ্বোধনী বক্তৃতায় লেখিকা অ্যানা কুইন্ডলেন এ-ব্যাপারটা অত্যন্ত জোরালো যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বলেন।

'একটা জীবন গড়ার তুলনায় সিভিতে বড়ো বড়ো ডিগ্রি আর অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করা অনেক সহজ। অথচ কনকনে শীতের রাতে সিভি তোমাকে তাপ দেবে না, কষ্টের সময় সিভি তোমার কাঁধে হাত রাখবে না। একাকিত্বের মুহূর্তে সিভি তোমাকে সঙ্গ দেবে না। ব্লাড টেস্টের রিপোর্টে খারাপ কিছু দেখে যখন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে, তখন সিভি তোমাকে সামলাবে না।

আমার সিভিটা এইরকম: আমি আমার তিন সন্তানের যোগ্য মা। আমার স্বামীর ভালো বন্ধু। বিয়ের অঙ্গীকারগুলোকে আমি সত্যিকারর্থে পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি আমার বন্ধুদের এবং তারা আমার সত্যিকারের বন্ধু। তাদের ছাড়া আমার আজকে আপনাদের সামনে কিছুই বলার থাকত না; কারণ, আমি হতাম একটা নিষ্প্রাণ পুতুল। আমি তাদের ফোন দিই, তাদের সাথে লাঞ্চ করি। আমি তাদেরকে সময় এবং মনোযোগ দিই।যদি এসব সত্যি না হতো তাহলে আমি কর্মী হিসেবেও খুব একটা ভালো হতে পারতাম না। যদি কাজই তোমার জীবন হয়, তাহলে উচ্চমানের কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি তোমাদের আজ একটা কথাই বলতে চাই: জীবন গড়ো। সত্যিকারের জীবন। আরও পদোন্নতি, আরও টাকা, আরও বড়ো বাড়িগাড়ির পেছনে পাগলাঘোড়ার মতো ছোটা-এটা জীবন নয়। কাল যদি শরীরে একটা টিউমার দেখা দেয় অথবা রক্তনালিতে সমস্যা ধরা পড়ে, তখন কি বাড়িগাড়ির মূল্য আর তোমার কাছে থাকবে?'

একজন ইউরোপে বসবাস করা পিতার অভিজ্ঞতা:

জীবনের ২০টা বছর, মেডিক্যাল পাশ করার পর থেকে হাসপাতালের চাকরি ছাড়া অবধি, আমি এতটাই কাজের মধ্যে আটকে পড়েছিলাম যে, নিজের পরিবারের সাথে প্রায় দেখাই হতো না। রাতে যতক্ষণে আমি বাড়ি ফিরতাম, ততক্ষণে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ত এবং ছুটির দিনগুলোতে এতই ক্লান্ত থাকতাম যে, ওদের নিয়ে কিছু করার কোনো শক্তি পেতাম না। অতীতের কথা ভাবলে উপলব্ধি করি, আমার স্ত্রী যেভাবে মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছে, আমি সেই অর্থে পিতৃত্বের স্বাদ পাইনি। আমি স্কুলের পর ওদের আইসক্রিম খেতে নিয়ে যেতে পারিনি, ওদের বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে পারিনি। আজ অবদি আমি জানি না ওদের কোন গান পছন্দ, ওরা মৃত্যুকে ভয় পায় কি না। আমার মনে হয় এই লোকসান কোনো দিন পোষানো যাবে না। একটা সময়সাপেক্ষ ক্যারিয়ার পাওয়ার জন্য উঁচু দাম দিতে হয়েছে বটে।

ভালোবাসা এবং ক্যারিয়ার, সন্তান এবং চাকরি-এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে নানারকম ত্যাগ স্বীকার করা থেকে বেঁচে যাওয়া উচ্চস্তরের কর্মজীবীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই। তবে এসব ত্যাগের মাত্রাটা নারীদের জন্য অনেকগুন বেশি এবং এটা গুরুতর অন্যায়।

ক্রেইগ অত্যন্ত সহানুভূতিশীল একজন পুরুষ এবং আমার দুঃখ হয়েছে জেনে যে, সে তার সন্তানদের শিশুকালকে হারিয়েছে। কিন্তু তবুও, সত্যি বলতে ক্রেইগের না-পাওয়া এবং ক্যারা অথবা সারাহর (পশ্চিমা নারী) না-পাওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। ক্যারা এবং সারা নিঃসন্তান, অথচ ক্রেইগের তিন-তিনজন আদরের মেয়ে আছে। ক্রেইগ এখনো তার প্রাপ্তবয়সি মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে এবং চাইলেই হতে পারে বিশ্বের সবচেয়ে স্নেহময় নানা।

দ্বিতীয় দশকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার নতুন সিলসিলা: ইসলামি নারীবাদের সাতকাহন

খেয়াল করলে দেখবেন, খুব ধীরে কিন্তু কার্যকরী উপায়ে ইসলামের পরিসরকে সঙ্কোচন করে আনার একটা জোরদার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক , রাষ্ট্রিয়

ও সামাজিক, সকল ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়ার দৃশ্যমান উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। প্রফেসর ওভামির আঞ্জুম যেটাকে বলেছেন , ইসলামকে মক্কান পিরিয়ডের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, ইসলামের প্রাথমিক যুগ তথা মক্কি যুগে যেভাবে কুরায়েশের মুশরিকরা সম্মিলিত হয়ে অস্ত্রের জোরে ইসলামের দাওয়াতকে ঠেকিয়ে রাখতে, এবং ইসলামের পরিসরকে ক্ষুদ্র একটি বৃত্তের ভেতর বন্দি করে ফেলতে চেয়েছিলো, সেই একই প্রচেষ্টার পূণরাবৃত্তি হচ্ছে এখন। ইসলামের অনেক নুসুস এবং শরিয়াহর অনেক বিধান আপনি এখন আর জন-পরিসরে সামনে আনতে পারবেন না। এমন কি রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত এমন অনেক মুসলিম সমাজ থেকেও এই পরিবেশটাকে নাই করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নারীদের সম্পর্কে শরিয়াহর বিভিন্ন নুসূস এবং ফিকহি বিধানাবলী, যা ইসলামের শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল স্থান ও কালে সমানভাবে চর্চিত ও পালিত হয়ে আসছে, সেগুলো কে সামনে আনা যায় না। আমাদের বক্ষমাণ আলোচনার মূল উদ্দেশ্যও তাই।

যেমন, বাংলাদেশের মতো ধর্মীয় রক্ষণশীল একটি মুসলিম সমাজে নারীদের সম্পর্কিত অনেক আয়াত, হাদিস ও ফিকহি বিধান নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ক্রমেই একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে পড়ছে। সেখানে পলিটিক্যাল কারেক্টনেস বজায় রাখা কিংবা বিশেষ কোন কোন শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব মাথায় রাখার ব্যাপার সামনে আসছে। ধরুন কোন জন-পরিসরে, চাই সেটা ওয়াজের ময়দানে কিংবা সাধারণ কোন ফেইসবুক পোস্টে, আপনি বললেন, ইসলাম নারীর জন্য তার স্বামীর আনুগত্য কে আবশ্যক করে দিয়েছে। কোন যৌক্তিক ও শরঈ কারণ ব্যাতীত স্বামীর অবাধ্যতা করা তার জন্য বৈধ নয়, সে এতে গুনাহগার হবে। কিংবা সেই হাদিসটা পাঠ করলেন,যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার পর এই উম্মতের পুরুষদের জন্য নারীর চাইতে বড় আর কোন ফিতনা রেখে যাইনি। কিংবা প্রসঙ্গ ক্রমে সেই আয়াতের কথা বললেন, যেখানে আল্লাহ্ স্বামীদের কে ক্ষেত্র বিশেষে স্ত্রীদের শাসনের অধিকার দিয়েছেন, সীমিত প্রহার কিংবা শয্যা পৃথক করার মাধ্যমে।

নিঃসন্দেহে এগুলো শরিয়াহর নুসুস এবং অকাট্য বিধান। কিন্তু এতটুকু বলার জন্য আমি নিশ্চিত আপনি বিভিন্ন দিক থেকে চ্যালেঞ্জ ও ঘোরতর আপত্তির মুখোমুখি হবেন। এবং চ্যালেঞ্জগুলো সেক্যুলার লিবারেল ফেমিনিস্ট হিসেবে বিখ্যাত এমন কারও কাছ থেকে আসবেনা, তাদের প্রসঙ্গ বাদই থাক, বরং খোদ ধর্মীয় মুসলিমদের মধ্য

থেকেই আসবে। যারা হয়তো ধর্মের আচরনীয় ও পালনীয় বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে পালন করে, এবং শরিয়াহর কোন বিধানকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেনা, কিন্তু এমন নির্জলা কথা শুনার জন্যও তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত না। এর ফলে তাদের মাঝে বিভিন্ন স্তরের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ উদ্ধত্যের চরম শিখরে পৌঁছে এগুলো কে সরাসরি অস্বীকার করবে, এবং এই সদম্ভ ঘোষণা দিবে যে- এসব ছাড়াই আমি দ্বীন পালন করবো। কেউ হয়তো এক নিদারুণ অস্বস্তি ও দ্বিধায় ভুগতে থাকবে, সত্যিই কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এমন "পক্ষপাতমূলক" কথা বলতে পারেন? আবার কেউ এই কথাগুলোর তুলনামূলক সহজ ও তাঁর মনোবৃত্তির কাছাকাছি হয় এমন ব্যখ্যার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটবে। এবং কোথাও পেয়ে গেলে এর সত্যাসত্য যাচাই না করে এবং বাস্তবতা উপেক্ষা করে সেটাকেই আঁকড়ে ধরবে।

বাংলাদেশে এই অধ:পতিত ও বিপদজনক চিন্তা প্রবণতার ব্যাপক বিকাশ কখন ও কিভাবে ঘটেছে, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল । কিন্তু আমার ব্যাক্তিগত অনুমান হলো গত দশকের যে সময়টা থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সকলের অংশগ্রহণ ঘটেছে, পৃথিবীর সকল প্রান্তের সবধরণের মানুষ একই প্লাটফর্মে উঠে এসেছে, ঠিক সে সময়ে আমরা এমন একটা প্রজন্মের সরব উত্থান টের পাই। কারণ যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতায় মানুষের চিন্তা ও আদর্শের অবাধ বিনিময় লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। হয়তো এরই সূত্র ধরে এ দেশের প্রেক্ষাপটেও আমদানি হয়েছে "ইসলামিক ফেমিনিজম" বা ইসলামী নারীবাদ নামক প্রপঞ্চটির। এবং যথারীতি কয়েকজন মানুষের অগ্রণী ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এর ব্যাপক বিস্তার ও বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম নারীদের মাঝে এই চিন্তা প্রবণতা দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যেকোন পর্যায়ে তারা এর মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছেন।

এ দেশে নারীবাদ বহু বছর ধরেই চর্চিত হয়ে আসছে। কিন্তু সেটা একটা বিশেষ শ্রেণী বা চিন্তা ঘরানার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো, নির্দিষ্ট করে বললে কামালিস্ট বা র‍্যাডিক্যাল সেক্যুলারপন্থিদের মাঝে। জনপরিসরে পশ্চিম থেকে আমদানিকৃত এই মতবাদটি কখনও জনপ্রিয়তা পায়নি। বরং ধর্মের সাথের এর সংঘাতের ব্যাপারটি স্পষ্ট থাকায় মানুষ খুব সহজেই একে এড়িয়ে যেতে পারতো। কিন্তু একই মতবাদ যখন ইসলামের পোষাক পরিহিত হয়ে আসলো তখন আমরা ভিন্ন চিত্র দেখতে পেলাম। যে রক্ষণশীল ধর্মীয় সমাজের লোকেরা, বিশেষত নারীরা নিজেদের কে এই মতবাদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নিজেদের দ্বীন, ঈমান ও সমাজ রক্ষার জন্য, তারাও নামে বেনামে একে

গ্রহণ করা শুরু করলেন। কেউ আংশিক, কেউ পুরোপুরি। তাদের কেউ নিজেকে মুসলিম নারীবাদি পরিচয়ে ব্যাক্ত করেন, আবার কেউ এই পরিচয় অস্বীকার করেন তবে এর এজেন্ডাগুলোর সাথে দ্বিধাহীন ঐক্যমত পোষণ করেন এবং এগুলোর জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করেন। বর্তমানে সংখ্যায় তারা বিপুল।

নারী, নারীবাদ ও ইসলামী নারীবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ধর্ম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ কিংবা সামাজিক আচার আচরণ, তথা যেসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় নির্মিত হয় , সেইসব পুরাতন ভিত্তিমূলকে তারা চূর্ণ বিচূর্ণ করে নতুন এক সমাজ দর্শন নির্মান করতে চেয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের উত্থান ঘটে, গত শতকের ষাটের দশকে। বিখ্যাত ফরাসি লেখিকা সিমন দ্যা বেভ্যুওয়ার (Simone de Beauvoir) এর "দ্বিতীয় লিঙ্গ" (The second sex) এবং কেইট মিলেট (Kate Millet) এর ''লৈঙ্গিক রাজনীতি" (Sexual Politics) নামক বইগুলো এই আন্দোলনের ইশতেহার ও রোডম্যাপ তৈরী করে দেয়। নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ থেকে এই তরঙ্গের পার্থক্য আকাশ পাতাল। ইউরোপিয়ান সমাজে নারী সত্ত্বাকে যে দৃষ্টিতে দেখা হতো তার বিবেচনায় নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের দাবী ও চাওয়া ছিলো একেবারেই মৌলিক এবং যৌক্তিক। কিন্তু দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদ কোন সীমা পরিসীমার ধার ধারেনি। তারা একাধারে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের স্বভাবজাত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সবকিছুর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। খোদ নারী সত্ত্বাকে অস্বীকার করে তারা ঘোষণা করলেন, নারী বলতে কিছু নাই, এটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরী ধারণা। কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী বানায়। যাকে তারা সামাজিক নির্মান বা Social construction হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। এর ভিত্তিতে গোটা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য তিনটি পদক্ষেপে বর্ণনা করা যায় এভাবে-

Construction

Deconstruction

Reconstruction

অর্থাত তারা প্রথমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, নারী হলো সমাজের তৈরী করা ধারণা। আদতে নারী বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব নাই, বরং সকলেই মানুষ হিসেবে সমান। তারপর নারী সত্ত্বার সেই সামাজিক নির্মাণের বিনির্মাণ বা Deconstruction

করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান ও মতবাদের উপর ভিত্তি করে এই নারী-ধারণা টিকে আছে সেগুলো থেকে নারীকে মুক্ত করতে হবে। তথা ধর্ম, সমাজ , ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। সেসব প্রতিষ্ঠানের বিনাশ ঘটাতে হবে। কারন সেগুলো টিকে থাকা মানেই পিতৃতন্ত্র টিকে থাকা। তারপর আসে পুনঃনির্মাণ বা Reconstruction এর ধাপ। অর্থাৎ নারী পরিচয় ও সত্ত্বাকে পুনঃনির্মাণ করতে হবে। যেখানে থাকবেনা কোন ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় কিংবা পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব। এসব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে নারী হবে তার হৃদয় ও দেহের একান্ত অধিকারী, নিজ রাজ্যে একাকি স্বাধীন মুক্ত ও বাধাহীন।

এই উদ্দেশ্যে তারা পরিবার, বিবাহ, সন্তানধারণ এবং সকল সামজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে জোর আওয়াজ উঠালেন। পুরুষ ও পুরুষতন্ত্র থেকে মুক্তিই হয়ে উঠলো হলো নারীর চূড়ান্ত লক্ষ্য।তাদের দৃষ্টিতে কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর সংসার করা ,সন্তান লালন পালন করা, সমাজের প্রথা অনুযায়ী বাধ্য হয়ে চলা নারীর জন্য চূড়ান্ত অপমান ও পরাজয়ের ব্যাপার। এর সাথে সাথে গর্ভপাতের বৈধতা ও নারীদের যৌন স্বাধীনতার দাবীও উঠলো জোরেশোরে। এর প্রভাবে গোটা ইউরোপের সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থাগুলো ধ্বসে পড়তে থাকে। এবং মানুষের আজীবনের লালিত ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো বিলীন হতে থাকে।

বেভ্যুয়ারের সেই বই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সকল প্রান্তে নারীবাদের সবচে শক্তিশালী এবং লক্ষ্যভেদী গ্রন্থ হিসেবে পাঠ করা হয়। বেভ্যুয়ার যে স্বাধীন নারী সত্ত্বার নির্মান করতে চেয়েছেন সেই গ্রন্থে , সেটাই সকলের কাছে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেন ইউরোপের নিপীড়িত নারীকূলের মুক্তির অন্যতম আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছেন তিনি।

কিন্তু সত্যিই কি বেভ্যুয়ার নারীর মুক্তি ও কল্যাণ চেয়েছেন? আমরা দেখি তিনি প্রচন্ডভাবে নারী-বিদ্বেষী ছিলেন। নারীর স্বত্ত্বা ও সৃষ্টিগত পরিচয়, কোনটাই তার পছন্দনীয় ছিলোনা। ফলে তিনি চেয়েছেন নারী সত্ত্বাকে নির্মূল করে সকলেই যেনো একজন যথার্থ পুরুষ হয়ে উঠে। সমাজের আর দশজন পুরুষের ন্যায় নারীও একজন পুরুষ হিসেবেই বাঁচবে। এমন বিকৃত নারীবিদ্বেষী চিন্তাকে কিভাবে উগ্র পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা হিসেবে আখ্যায়িত না করে নারীর মুক্তি হিসেবে কল্পনা করা যায়? বেভ্যুয়ার নিজে তার ব্যক্তি জীবনের পুরোটাতেই একাধিক পুরুষের নির্ভরতায় কাটিয়েছেন। জ্যা পল সার্ত্রের মতো ফ্রান্সের প্রভাবশালী চিন্তক ও দার্শনিকের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছেন।

আজীবন সার্ত্রের পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন, তার জ্ঞান থেকে "আলোকিত"হয়েছেন। নিজে বই লিখে বিখ্যাত হওয়ার আগ পর্যন্ত সার্ত্রের দেয়া বিপুল "খরপোষে" আরামদায়ক জীবন কাটিয়েছেন। তার বিখ্যাত বই দ্যা সেকেন্ড সেক্স লেখার পর অর্থ এবং খ্যাতী উভয়ই লাভ করলেন এবং সার্ত্রে কে বাদ দিয়ে নিজের মতো করে জীবন যাপন শুরু করলেন। সে সময়ে আমেরিকার এক ইহুদি লেখক নেলসন আলগ্রীনের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। নিউ ইয়র্কের কয়েক মাস দেখা সাক্ষাতের পর যে যার গন্তব্যে ফিরে যান। একজন প্যারিসে অপরজন নিউইয়র্কে। কিন্তু সেই সম্পর্কের গভীরতা প্রগাঢ় হয় পত্র চালাচালির মাধ্যমে। সেইসব পত্রাবলী যখন পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়ে আমাদের সামনে আসে সেখানে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বেভ্যুয়ারকে দেখতে পাই। বিপ্লবী, বিদ্রোহী, সবকিছু ভেঙে চুড়ে ফেলা বেভ্যুয়ার নন তিনি। যার আন্দোলন ও লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাজারো নারী স্বামী, সন্তান, পরিবার ও সমাজের বন্ধন চ্ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করে ফেলতে চায়, সেই বেভ্যুয়ারকে দেখা যায় সেখানে কিশোরীসুলভ আবেগ নিয়ে নিজেকে একজন একান্ত অনুগত বাধ্য প্রেমিকা হিসেবে নিবেদন করছেন তার প্রেমিকের কাছে । যার একমাত্র স্বপ্ন হলো স্বামীর সেবা করে সুখি ও সৌভাগ্যবান হওয়া। ঠিক একজন গ্রামীন কিশোরী যেভাবে স্বামী সন্তান সহ নিজের সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে আনন্দিত হয়, তিনি যেন তারই প্রতিচ্ছবি। সেইসব পত্রাবলীতে নিজেকে সম্বোধন করতেন " ছোট্ট ব্যাঙছানা" নামে।

দ্যা সেকেন্ড সেক্স বইয়ে বেভ্যুয়ার যে বিপ্লবী ও বন্ধনহীন স্বাধীন নারী সত্ত্বার নির্মান করেছেন, তিনি নিজে কেন সেই নারী হতে চাননি? কেন নিজে আজীবন একজন পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থেকে আবার অপর আরেকজন পুরুষের আদরের "ছোট্ট ব্যাঙ ছানা" হয়ে থাকতে হলো? এটা কিসের তাড়না? নারীবাদি আন্দোলনের পুরো প্রকল্পটির বাস্তবতা বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এই প্রশ্নটা জরুরী। এর মাধ্যমে আমরা নারীবাদ ও নারী সত্ত্বার মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের বিশ্লেষণও করতে পারবো।

মুসলিম বিশ্বে নারীবাদ নতুন কোন বিষয় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে যখন এই আন্দোলন অস্তিত্ব লাভ করলো এর অব্যবহিত পরেই অনেক মুসলিম দেশে এর উপস্থিতি বেশ জোরালোভাবেই টের পাওয়া গেলো। তখনকার ইউরোপিয়ান উপনিবেশ শাসিত ইন্ডিয়া, আরব ও আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশভক্ত একশ্রেণীর এলিট ছিলেন, যারা গতকালের ইউরোপে আবিষ্কৃত যেকোন চিন্তা বা মতবাদকে পরদিনই নিজের দেশে আমদানি করতেন আলোকায়নের নামে।

তাদের হাত ধরেই নারীবাদের আগমনও ঘটে । মিশরের বিখ্যাত আইনজীবী ও লেখক কাসেম আমীন তার "নারীর মুক্তি" (তাহরীরুল মারআহ) বইটি প্রকাশ করেন ১৮৯৯ সালে। বইটি তখন সব মহলেই হৈচৈ ফেলে দেয়। একই সময়ে মিশর, সিরিয়া ও লেবাননের যেসব "সংস্কারপন্থি" ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন তারাও এ বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। জামালুদ্দীন আফগানী, মোহাম্মাদ আব্দুহু, রশিদ রেজা, রিফায়া তাহতাবী প্রমূখ ছিলের অগ্রণী ভূমিকায়। তারা ইসলামে নারী প্রশ্নে এমন সব প্রস্তাবনা সামনে আনলেন যা ইউরোপের নারীবাদি আন্দোলনের বিচারেও অনেক অগ্রগামী ছিলো। যদিও তারা "নারীবাদ" নাম গ্রহন না করেই এই আন্দোলন চালিয়েছেন। তাদের সাথে ছিলো ঔপনিবেশিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার হাত। মিশরের ইংরেজ শাসক লর্ড ক্রোমার মুসলিম নারীদের দুঃখ আর ব্যাথা বেদনার কাহিনী লিখতে লাগলেন এবং নিজেকে তাদের উদ্ধারকারী হিসেবে উপস্থাপন করতে লাগলেন। যদিও ক্রোমারের নিজের দেশ ইংল্যান্ডে তখনও নারীদের ভোটাধিকারই দেয়া হয়নি। অন্যান্য অধিকারের কথা বাদই থাক।

কিন্তু হুবহু ইউরোপের আদলে মুসলিম দেশগুলোতেও নারীবাদী আন্দোলন সংঘটিত ও সুসংহত হয়ে উঠতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। যারা সরাসরি পশ্চিমা সেক্যুলার নারীবাদকে গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের প্রতি উপর্যপুরি হামলা চালিয়েছেন। নাওয়াল সা'দাবি, হুদা শা'রাবি, দোরিয়া শফিক, কিংবা সামীরা মুসার মতো নারীবাদী চিন্তকরা সেক্যুলার জায়গা থেকে ধর্ম ও আরব সমাজের তির্যক সমালোচনা করেছেন। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের উত্থানকালীন সময়েই এর আরও বেশকিছু শাখা প্রশাখা গড়ে উঠেছে, বিশেষত অ-ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে। Black Feminism, Radical Feminism, Marxist Feminism, liberal Feminism, Post Colonial Feminism ইত্যাদি। কিন্তু দিনশেষে এর সবগুলোই লক্ষ্য ও আদর্শের বিচারে এক ও অভিন্ন। হয়তো পার্থক্য কেবল নাম ও চর্চার ধরণে। এরই ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ের দশকে Islamic Feminism নামক ধারণার উদ্ভব ঘটে, প্রধানত ইরান ও আরবে। এর বাইরে আমেরিকান নারীবাদি লেখিকা মার্গট বাদরানকেও এর উদ্ভাবক হিসেবে ধরা হয়। ১৯৯৫ সালে তার বই "ইসলামে নারীবাদ" (Feminism In Islam) এ তিনি এই ধারণা প্রস্তাব করেন। একটা মজার ব্যাপার হলো সেক্যুলার নারীবাদ কিংবা ইসলামি নারীবাদ, এর সকল এক্টিভিস্ট, চিন্তক ও লেখক পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন। হয় তারা সেসব দেশে বসবাস করেন, নতুবা সেসব দেশের

কোন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন, অধ্যাপনা করান, কিংবা অন্য কোন এজেন্সিতে কর্মরত আছেন। ইসলামী নারীবাদ কিভাবে সরাসরি পশ্চিমা সেক্যুলার নারীবাদেরই মূদ্রার অপর পিঠ, সেটা বুঝতে গেলে এই তথ্য আমাদের কাজে লাগবে। এবং পূর্বে আমরা যা বলেছি, নারীবাদের সকল শাখা প্রশাখা মিলিয়ে মূলত একটি সেক্যুলার নারীবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন নামে, এর বাস্তবতাও টের পাওয়া যায়। সেই নব্বই দশক থেকেই আমরা মুসলিম দেশ বা সমাজগুলোতে দুই ধরণের নারীবাদের চর্চা দেখি। সেক্যুলার র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ, ও ইসলামি নারীবাদ। বাংলাদেশে ইসলামী নারীবাদের চর্চার ব্যাপকতা থাকলেও এর একাডেমিক বা জ্ঞানগত কোন ভিত্তি এখনও তৈরী হয়নি। ফলে সুনির্দিষ্টভাবে এর বিচার বিশ্লেষণ করা মুশকিল। তাদের বক্তব্য, দাবী দাওয়া, কিংবা লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সুসংহত কোন বয়ান আমার নজরে পড়েনি । মূলত অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে তাদের এই আন্দোলন। সেখানে তাদের গতিবিধি ও কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝা যায় ইসলামী নারীবাদ নামক যে প্রপঞ্চটি রয়েছে সেটারই একান্ত ভোক্তা তারা। এর বাইরে তাদের নিজস্ব কোন বয়ান নাই।

সুতরাং, ইসলামি নারীবাদ কী, এবং মূলধারার সেক্যুলার নারীবাদের সাথে এর পার্থক্য কোন জায়গায়, এই প্রশ্নে আসা যাক। সেক্যুলার নারীবাদ নিজেকে ধর্মের বৃত্তের বাইরে রেখে ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রিটিক করে। এগুলোকে পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার অভিযোগে খারিজ করে দেয়। তারা মনে করে ধর্ম পিতৃতন্ত্রের আবিষ্কৃত সিস্টেম, যার আবিষ্কারই হয়েছে নারীকে দমন ও শাসন করার জন্য। সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক জুলুমের সিস্টেম দূর করতে গেলে হয় ধর্মকে আমূল সংশোধন ও সংস্কার করতে হবে, নতুবা একে পুরোপুরি বাদ দিতে হবে।

অপরদিকে ইসলামি নারীবাদ মনে করে, ইসলাম একজন নারীকে একজন পুরুষের মতোই সমান অধিকার, ক্ষমতা ও ব্যাক্তিস্বাধীনতা দিয়েছে। নারী ও পুরুষের মাঝে আচরণ ও বিধানগত কোন পার্থক্য রাখেনি। কিন্তু ইসলাম অবতীর্ন হয়েছে ঘোরতর পুরুষতান্ত্রিক একটি সময় ও সমাজে। ফলে সেসময়ের মানুষ ইসলামকে যেভাবে বুঝেছে সেই বুঝাপড়াটা সার্বিকভাবে পুরুষতন্ত্রের বুঝাপড়া। সেখানে নারীর কোন অংশগ্রহণ ছিলো না। পুরুষতন্ত্রের হাত ধরে ইসলামের যে ব্যখ্যা আমাদের পর্যন্ত এসেছে সেখানে নারী নিতান্তই গৌণ ও অনুল্লেখযোগ্য, কখনও তুচ্ছ ও হীন। ইসলামে এই পিতৃতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে এর পূর্বের দুই ধর্ম তথা ইহুদি ও খৃষ্ট ধর্ম থেকে।

সুতরাং ইসলামি নারীবাদ ইসলামকে পিতৃতন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে, এবং ইসলাম নিয়ে চিন্তা করার সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাবনা তৈরী করতে চায়। ইসলাম, যা কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কুরআন বুঝার জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার যে মানবীয় মাধ্যম রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে বুঝতে হবে।

মিশরের নারীবাদী লেখিকা রাফা'ত হাসান মনে করেন, নারীর অধিকার প্রশ্নে হাদিসের চাইতে কুরআন বেশি ইনসাফ করেছে। এবং হাদিস সেই ইনসাফের ক্ষেত্রগুলোকে সঙ্কোচন করে দিয়েছে।

আমেরিকান নারীবাদী লেখিকা আমিনা ওয়াদুদ এর মতে – ইসলামের সার্বজনীন ও সর্বকালীন বিধান হওয়ার অধিকার কেবল কুরআনেরই রয়েছে। কারণ কুরআন এর স্থান ও কালের কোন সীমানা নেই। বরং সকল যুগের সকল মানুষের জন্যই একে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক যুগে সে যুগের দাবী ও চাহিদা অনুযায়ি কুরআন কে বোঝা ও এর বিধান প্রয়োগ করা খোদ কুরআনেরই দাবী। সেজন্য কুরআনকে ব্যাখ্যার নির্দিষ্ট কোন কাঠামো নেই, বরং একে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে উদ্দ্যেশ্য করে। এর সার্বজনীন কোন মূল্য নেই। উপরন্তু হাদিসে বিকৃতি ও বাহিরের হস্তক্ষেপ অনুপ্রবেশ করায় এটা সর্বৈভ সন্দেহযুক্ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামী নারীবাদের প্রথম এবং প্রধান দাবীই হলো কুরআনের পূনঃর্পাঠ নির্মান করা, এবং সেটা হবে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আর এই পূনঃপাঠ নির্মান করতে গিয়ে ইসলামের যে অপরাপর জ্ঞান শাখা রয়েছে সেগুলোকে প্রত্যখ্যান করা। এ ক্ষেত্রে তাদের বিখ্যাত কয়েকটি বইয়ের শিরোনামের দিকে লক্ষ্য করলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। আমিনা ওয়াদুদের বইয়ের নাম – Quran and Women: Reading the sacred text from a Women's perspective)

পাকিস্তানি-আমেরিকান লেখিকা আসমা বারলাসের বইয়ের নাম- Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal interpretations of the Quran

মরক্কোর বিখ্যাত নারীবাদী চিন্তক ফাতেমা মেরনিসির বইয়ের নাম- The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women rights in Islam

এর বাইরে ইউরোপ, আরব ও এশিয়ায় যে অসংখ্য কাজ হচ্ছে ইসলামি নারীবাদ নিয়ে, সেগুলোর বক্তব্যও প্রায় একই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তারা প্রত্যেকেই

ইসলাম কে বা কুরআনকে বিশেষ একটা মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন । সুতরাং শুরুতেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের এই পাঠ নিরপেক্ষ ও যথাযথ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কোন বিষয়ে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে আপনি যদি সেখানে নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধানে যান তাহলে সেটা নিতান্তই এক হাস্যকর প্রচেষ্টা হবে বটে।অথবা তারা যদি মনে করেন তাদের নিজেদের মতো করে সত্য কে তৈরী করবেন, কুরআনের টেক্সটকে তার স্বভাব ও মর্মগত অর্থের বাইরে এনে নিজের মতো করে অর্থ দান করবেন, তাহলে সেটা হবে তাদের স্বনির্মিত সত্য, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য না।

ইসলামী নারীবাদ হাদিসকে অস্বীকার ও মেনে নেয়ার মাঝামাঝি জায়গায় ঝুলে আছে। তাদের কেউ হাদিসকে পুরোপুরি বর্জন করার পক্ষে, যেহেতু হাদিসকে গ্রহণ করলে কুরআনের ব্যখ্যায় পর্যাপ্ত স্বাধীনতা লাভ করা যায়না। আবার কেউ হাদিসকে আংশিক গ্রহণ করার পক্ষে। অর্থাৎ যেসব হাদিস তাদের নারীবাদী রুচি ও চাহিদার অনুগামি হবে সেসব হাদিস গ্রহন করা হবে, এর বিপরীত হলে সে হাদিস বর্জন করা হবে। হাদিস গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে এই উম্মতের মহান মনিষীরা যেসব মূলনীতি ও শাস্ত্রের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন এবং যেগুলো ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে আসছে সেসব মূলনীতি ও শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়না তাদের। বরং কোন হাদিসের ক্ষেত্রে যদি মনে হয় এমন কথা রাসূল সাঃ এর জন্য বলা শোভনীয় না, তাহলে সেই হাদিস বর্জনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ। শাস্ত্রের বিচারে সেটা যত বিশুদ্ধ হাদিসই হোক।

ইসলামি নারীবাদ ফিকহে ইসলামিকে পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবচে বড় দায়ী হিসেবে সাব্যস্ত করে। তারা মনে করেন, ফুকাহায়ে কেরাম ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজেদের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য ভয়াবহ রকমের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এবং নিজেদের সেইসব পক্ষপাতমূলক মতামতই শরিইয়াহর বিধান হিসেবে উম্মতের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দার মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্প্রতি রীতা ফারাজ নামক এক লেবানিজ নারীবাদী লেখিকা একটি বই লিখেছেন, বইয়ের নাম হলো “ ইমরাআতুল ফুক্কাহা ওয়া ইমরাআতুল হাদাসাহ”, অর্থাৎ মুসলিম ফকীহদের নির্মিত নারী ধারণা এবং আধুনিকতায় নারী ধারনা। সেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন ফকীহরা কিভাবে নিজস্ব ইজতেহাদ ও বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর কর্তাসত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে নাই করে দিয়েছেন। অত:পর পশ্চিমা আধুনিকতা সেই হারানো কর্তাসত্ত্বাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে।

ফিকহে ইসলামীর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখেন এমন যে কেউ এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফকীহগণ যখন শরিয়তের কোন হুকুম অনুসন্ধান করতেন তখন তাদের সামনে কেবলই কুরআন ও হাদিসের টেক্সট থাকতো। সেই টেক্সট থেকে যে নির্দেশনা পেতেন কেবল তারই অনুসরণ করতেন। সেই নির্দেশনা নারী বা পুরুষের পক্ষে নাকি বিপক্ষে যাচ্ছে সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিলোনা। টেক্সট এর বিদ্যমান অবস্থায় নিজস্ব কোন চিন্তা, মতবাদ বা অভিরুচি সেখানে প্রয়োগ করার বিন্দুমাত্র সুযোগও ছিলোনা। এমন কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বস্ততা ও সততার কারণেই আজ পর্যন্ত তারা এই উম্মাহর সর্বোচ্চ সম্মানীত ইমাম ও পথ প্রদর্শক। এককভাবে কাউকে আমরা ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করিনা, কিন্তু তাদের সম্মিলিত ও সমষ্টিগত যে প্রচেষ্টা রয়েছে ফিকহে ইসলামী নামক ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানস্তম্ভ নির্মানে , সেখানে একদল উন্মাদ অন্ধের এলোপাথাড়ি লাঠি চালনায় সামন্য আঁচড়ও পড়বেনা।

শেষ কথা

আমেরিকান মুসলিম একটিভিস্ট ড্যানিয়েল হাকীকাতজু তার এক লেখায় দেখিয়েছেন ইসলামি নারীবাদ কিভাবে চারটি ধাপ অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত ধর্মহীন সেক্যুলার নারীবাদে পরিণত হয়। ইসলামী নারীবাদ আর সেক্যুলার নারীবাদের মধ্যকার দূরত্ব খুব সামান্যই এবং অতি সহজেই মানুষ সেই দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলে। উভয়ের পার্থক্য উনিশ আর বিশ। প্রথমে মনে হতে পারে ইসলাম নারীকে তার যথাযথ অধিকার দিয়েছে ঠিকই কিন্তু এর ব্যাখ্যাকারগণ একে পুরুষতান্ত্রিক ও নারীবিরোধী বানিয়েছেন। সেখান থেকে একটা পর্যায়ে গিয়ে গোটা ইসলাম, কুরআন হাদিসকেও পুরুষতন্ত্রের বানানো বলে মনে হবে। এর অসংখ্য দুঃখজনক উদাহরণ আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি। ইসলামী নারীবাদই এখন দ্বীন ত্যাগের সবচে বড় দরোজায় পরিণত হয়েছে মুসলিম নারীদের জন্য। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাঃ থেকে কোন বিধান আসার পর এর অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের আগে তারা সেখানে সর্বাগ্রে নারী স্বার্থের তালাশ করেন। আল্লাহ্র আনুগত্যের চাইতে নিজেদের "স্বার্থ" রক্ষাই মূখ্য হয়ে দাড়িয়েছে তাদের জন্য। এর জন্য তারা বানিয়ে নিয়েছেন নিজের মন মতো কিছু পদ্ধতি। যেমন বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন ইসলামি নারীবাদী এক্টিভিস্টের বক্তব্য হলো – আমি নিজেকে ইসলাম ধর্মের একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে কল্পনা করি। কারণ ইসলামই আমাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছে। সুতরাং আমার সামনে যা কিছুই আসুক আমি নিজের সেই প্রাপ্ত

স্বাধীনতার সাথে সেটাকে মিলিয়ে দেখি। যদি দেখি উভয়টা কোনভাবে সাংঘর্ষিক হচ্ছে তাহলে নিশ্চিতভাবেই বুঝে নেই এখানে ঝামেলার কিছু আছে এবং সেটা গ্রহণযোগ্য না। সেটার জন্য আমি আমার স্বাধীনতাকে কম্প্রোমাইজ করবোনা।এটা যদি ইসলাম হয় তাহলে প্রবৃত্তির অনুসরণ কাকে বলে? নুসূসে শরিয়াহ এবং আহকামে শরিয়াহ কে যাচাই বাছাই করার এমন উদ্ভট মানদন্ড ইতিপূর্বে আর কেউ আবিষ্কার করেছে বলে মনে হয়না। মোটাদাগে বাংলাদেশের ইসলামী নারীবাদ এখনও এই স্তরেই রয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা দ্বীন ও ধর্মের কথা বলেন, ইসলামের মহত্তের কথাও প্রচার করেন, কিন্তু সেটা সিলেক্টিভ এবং স্বার্থবাদী। সেই স্বার্থের পাল্লায় মেপে ইসলামের বিধানাবলী ও নুসুস কে গ্রহন ও বর্জন করেন। ইসলামের পদ্ধতিগত যে শাস্ত্রীয় জ্ঞান রয়েছে , সেখানে তারা নিতান্তই ব-কলম। তবুও উম্মাহর সকল ইমাম, ফকীহ, মুফাসসীর , মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে নিজেরাই নেমে পড়েছেন সেইসব জ্ঞানের ময়দানে। যেন ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, তবু নিধিরাম সর্দার।

বিগত কয়েক শতকে ইসলামের বিরুদ্ধে সবচে বেশি যে অস্ত্রটি ব্যাবহার করা হয়েছে তা হলো ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন। নারীই হলো সাংস্কৃতিক ও সভ্যতা কেন্দ্রিক লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার। মুসলিম নারীরা কিভাবে পুরুষতন্ত্রের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে নিদারুণ নিপীড়িত ও বঞ্চিত জীবন যাপন করছে, সেটা প্রমাণ করাই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নারী প্রশ্নে পরাজিত হয়েছে ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী চার্চ, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহুদী ধর্ম। কারণ জয়ী হওয়ার মতো নৈতিক যোগ্যতা তাদের ছিলো না। ব্যাতিক্রম শুধু ইসলাম। এবং কেবল ইসলামই এখন পর্যন্ত মানব জাতীর জাগতিক ও ইহজাগতিক সকল যাত্রার পরম নিরাপদ গন্তব্য । নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আমরা আল্লাহ্‌র দাস। আমাদের নেই নিজস্ব কোন অধিকার আর কল্পিত স্বাধীনতার জন্য ব্যকুলতা। কারন আমাদের মুক্তি নিহিত তাঁর দাসত্ত্বেই।

রিদ্দার পথে একজন মুসলিম ফেমিনিস্টের যাত্রা

এ লেখায় আমার উদ্দেশ্য হলো নারীবাদ কীভাবে ধাপে ধাপে একজন মুসলিমকে রিদ্দার দিকে নিয়ে যায়, তা তুলে ধরা। আমি আশা করি এ বিষয়টা স্পষ্ট হলে মুসলিমরা বাস্তবতা উপলব্ধি করবে এবং নারীবাদের বিরুদ্ধে নীরবতা ভাঙবে।

তাহলে রিদ্দার পথে একজন মুসলিম ফেমিনিস্টের যাত্রার কথা শোনা যাক।

প্রথম ধাপ

শুরুটা হয় যৌক্তিক কিছু অভিযোগ, কিছু ক্ষোভ দিয়ে। এমন অনেক মুসলিম পুরুষ আছে যারা স্ত্রীর হক্ব আদায় করে না, স্ত্রী ওপর যুলুম করে। এমন অনেক মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই যুলুমের বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। নারীর প্রয়োজন এবং তাকে উপযুক্ত সহায়তা দেয়ার দিকগুলো তারা উপেক্ষা করে। এমন অনেক মুসলিম দেশ আছে, যেখানে এ ধরনের যুলুমগুলোকে একধরনের সামাজিক বৈধতা দেয়া হয়। অনেক সমাজে কন্যাসন্তানকে অবহেলা করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো যারা এই যুলুমগুলো করে অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের যুলুমকে দ্বীন ইসলামের নামে বৈধতা দিতে চায়।

এই সমস্যাগুলো আছে,এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। একইসাথে এটাও বোঝা দরকার যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান নারীবাদ না। এর সমাধান হলো ইসলামী জ্ঞানের যে কমতি আছে, শরীয়াহর ব্যাপারে যে অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে আছে সেটা দূর করা। এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয় হক্বপন্থী আলিমদের মাধ্যমে। ওইসব আলিম ও দাঈদের মাধ্যমে, যারা মডার্নিসম, লিবারেলিসম এবং নারীবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত । দুঃখজনকভাবে, এই ইলম আজ দুর্লভ। ফলে অনেক মুসলিম নারী (এবং পুরুষ) নিজ হতাশা এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে নারীবাদকে। এভাবেই শুরু হয় নারীবাদের পথে একজন মুসলিমের পথচলা।

নারী নির্যাতন যদি অসুখ হয় তাহলে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হলো এর সহজাত, প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অন্যদিকে নারীবাদ হলো এমন এক বিষাক্ত ওষুধ, যার ফলে রোগ হয়তো অল্প কিছুটা দূর হবে কিন্তু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় একদিকে রোগী মরার দশা হবে অন্যদিকে আরও দশটা নতুন অসুখ দেখা দেবে।

নারী নির্যাতনের বিষয়টা নারীবাদ কীভাবে উপস্থাপন করে?

নারীবাদ তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে, 'সবকিছুর মূলে হলো পুরুষতন্ত্র।' নারীবাদের বক্তব্য হলো–পুরুষ জাতটাতেই সমস্যা। যেসব নারী পুরুষতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে তারাও সমস্যার অংশ। নারীবাদের মতে, পুরুষরা সহজাতভাবে নারীকে শোষণ আর নির্যাতন করতে চায়। চায় নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিতে। এটা হলো বাস্তব সমস্যা আর ন্যায্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ ভাষার ব্যবহার। আর একসময় সমস্যাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে ভাষাই।

দ্বিতীয় ধাপ

প্রথম ধাপে ক্ষোভ এবং অভিযোগের কারণ ছিল কিছু পুরুষ (এবং নারীর) যুলুম। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ও ক্ষোভগুলো বাস্তবতা থেকে মোড় নেয় নানা বিমূর্ত, মতাদর্শিক দিকে।

অমুক ইসলামী কনফারেন্সে কোনো নারী বক্তাকে রাখা হয়নি কেন? অনুষ্ঠানের পোস্টারে পুরুষ বক্তাদের ছবি থাকলেও নারী বক্তাদের ছবি নেই কেন?

হিজাব নিয়ে পুরুষ ইমামরা কেন লেকচার দিচ্ছে? মুসলিম নারীরা কী পরবে সেটা নিয়ে পুরুষরা কেন কথা বলবে?

নারী ও পুরুষের সালাতের জায়গার মাঝখানে পার্টিশান কেন? আজকের যুগেও নারীপুরুষের মেলামেশায় কেন এত কড়াকড়ি? কেন নারী আর পুরুষের স্থান পৃথক হবে?

পুরুষ হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পাবার কথা মুসলিম পুরুষরা কেন স্বীকার করে না? নারীদের কেন শালীন আর বিনম্র হতে হবে? পুরুষ কেন নারীর বিষয়ে কথা বলবে? পুরুষরা কেন নারীবাদ নিয়ে কথা বলবে?

নারীবাদ ঢালাওভাবে পুরুষের বিরুদ্ধে শোষক ও নিপীড়ক হবার অভিযোগ তোলে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়া অভিযুক্তের অধিকার। কিন্তু যখনই কোনো পুরুষ সেটা করতে যায় তখন সেটা হয়ে যায় 'পুরুষতান্ত্রিক বয়ান'। নারীবাদের কাছে সব প্রশ্নের মুখস্থ উত্তর একটাই–পুরুষতন্ত্র। সবকিছুর জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্র।

প্রথম ধাপে সমস্যাগুলো সংজ্ঞায়িত হয়েছিল ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী নারী ও পুরুষের হক এবং যুলুম ও ইনসাফের জায়গা থেকে। দ্বিতীয় ধাপে এসে আলোচনার কাঠামো গড়ে ওঠে এবং চালিত হয় পশ্চিমা নারীবাদী এবং লিবারেল অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এর প্রমাণ হলো দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা এমন অনেক বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী আইন

ও শরীয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন : পর্দা, ঘরের বাইরে নারীর চলাফেরা, নারী ও পুরুষের মেলামেশা; বিশেষ করে গাইর-মাহরাম পুরুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শরীয়াহর সীমারেখা, ইত্যাদি।অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্বিতীয় ধাপের মুসলিম নারীবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে খুব একটা জানে না। যেসব বিষয়ে তারা আপত্তি তোলে সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামী আইন এবং কুরআন-সুন্নাহর দলিলের অবস্থান তাদের অজানা। এ বিষয়গুলো যখন জানানো হয় তখন তারা এগিয়ে যায় তৃতীয় ধাপের দিকে।

তৃতীয় ধাপ

এই ধাপে এসে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় ইসলামী ইলম এবং ইলমের সিলসিলাকে। দ্বিতীয় ধাপে অভিযোগ ছিল মুসলিম সমাজের বিভিন্ন আচার আর বিধিবিধান নিয়ে। তৃতীয় ধাপে এসে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে অতীত প্রজন্ম এবং আলিমগণকে।

নারীবাদের দর্শন অনুযায়ী, নারীদের আজ যে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে তার মূল কারণ পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্র হলো এমন এক অশুভ ব্যবস্থা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীদের শোষণ করে আসছে। কাজেই নারীবাদের জায়গা থেকে এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে অতীত প্রজন্মগুলোর সময়েও পুরুষতন্ত্র ছিল এবং আজকের চেয়ে আরও শক্তিশালী ছিল।

এমন অবস্থায় একজন নারীবাদী নিজেকে প্রশ্ন করে–

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে যে আলিমরা এসেছেন তাঁরা সবাই কি এই পুরুষতন্ত্রের অধীনেই ছিলেন না? পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা আর নারীবিদ্বেষের লেন্সের আলোকেই কি তাঁরা তাদের ফতোয়াগুলো লেখেননি? যে নারীবিদ্বেষ আজকের আলিমদের মধ্যে আমরা দেখি সেটা কি কয়েকশ কিংবা হাজার বছর আগের আলিমদের মধ্যে আরও বেশি মাত্রায় ছিল না?

ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো সময়ের যেকোনো আলিমের বই খুললে আমরা এমন অসংখ্যা অবস্থান পাব যেগুলো শরীয়াহর দিক থেকে, কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে সঠিক। কিন্তু নারীবাদের দৃষ্টিতে 'পুরুষতান্ত্রিক' এবং 'নারীবিদ্বেষী'। এ কারণেই তৃতীয় ধাপে এসে এমন অনেক নারীকে দেখা যায়, একসময় যারা খুব আগ্রহ নিয়ে ইলম অর্জনের চেষ্টা করত–হয়তো কোনো আলিমের অধীনে কিংবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা নিয়ে পড়ত, কিন্তু তারা যখন আলিমগণের লেখায় এমন কিছু খুঁজে

পায়, যা নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী 'ভুল' বা 'ঘৃণ্য', তখন ইলম থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। পুরো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের আলিমগণ তাদের চোখে পরিণত হয় পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূতে।

মুসলিম নারীবাদী তখন সিদ্ধান্ত নেয় সে কোনো আলিমের (অতীত কিংবা বর্তমান) কথা শুনবে না। সে সরাসরি কুরআন আর সুন্নাহর কাছে যাবে। কেবল কুরআন আর সুন্নাহই পুরুষতন্ত্রের কালো থাবা থেকে মুক্ত।

কিন্তু...

চতুর্থ ধাপ

কুরআন ও সুন্নাহয় তারা এমন অবস্থান দেখতে পায়, যা নারীবাদের মানদণ্ডে টিকে না।

সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত[1]

সূরা বাক্বারার ২২৮ নং আয়াত[2]

দুই জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান[3]

উত্তরাধিকারের ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান[4]

আক্বল ও দ্বীনে নারীর অসম্পূর্ণতা

জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারী[5]

যদি কোনো মানুষকে সিজদাহ করার অনুমতি থাকত তাহলে স্বামীকে সিজদাহ করার হাদীস[6]..

.

মুসলিম ফেমিনিস্ট এমন আয়াত ও হাদীসের মুখোমুখি হয়, যেগুলো নারীবাদের অবস্থান থেকে কোনোভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব না। কীভাবে সে নারীবাদের আদর্শের সাথে এই আয়াত ও হাদীসগুলোর সমন্বয় করবে? কীভাবে আল্লাহ্ এতগুলো আয়াত এবং হাদীস নাযিল করলেন, যেগুলো নারীবাদের সংজ্ঞানুযায়ী নারীবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই না?

মরিয়া হয়ে সে সমন্বয়ের চেষ্টা করে–

হয়তো এই সবগুলো আয়াত আর হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হয়তো চেষ্টা করলে নারীবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো-না-কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে। যে ওয়াহিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্পষ্টভাবে বুঝেছে, যা এখনো পর্যন্ত প্রজ্ঞা, ভাষাগত উৎকর্ষ এবং ন্যায়ের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে–হয়তো সেটাকে গত ১০০ বছরের

সেক্যুলার জেন্ডার স্টাডিস প্রফেসরদের অসংলগ্ন প্রলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে!

কিন্তু এই মনোভাব খুব বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। চতুর্থ ধাপে পৌঁছানোর পর 'মুসলিম ফেমিনিস্ট' উপলব্ধি করে যে বৃত্তকে কখনো ত্রিভুজ বানানো যায় না। নারীবাদের সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর একমাত্র উপায় হলো কুরআনের ঐশ্বরিক উৎসকে অস্বীকার করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর প্রয়োগযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করা।

এই ধাপের নারীবাদীদের মধ্যে এমন অনেককে আপনি পাবেন যারাবলে–

*আমাদের কুরআনকে না বলা শিখতে হবে।*এমনকি এমনও মানুষ পাবেন, যারা নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপার কুৎসিত-সব শব্দ ব্যবহার করে, কারণ তাঁরা নাকি 'পুরুষতান্ত্রিক'! ইয়াদুবিল্লাহ!।

চতুর্থ ধাপে এসে নারীবাদীরা অবলীলায় এমন-সব কথা বলে, যা স্পষ্ট কুফর। একই সাথে এমন-সব বিষয়ের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে যেগুলো ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যেমন : জামাতের সালাতে কোনো মহিলাকে ইমাম বানানো, মুসলিম নারীর সাথে কাফির পুরুষের বিয়ে, সমকামিতার বৈধতা, ট্রান্সজেন্ডারিসমের পক্ষে অবস্থান, যিনা এবং ব্যভিচারকে জায়েজ মনে করা, ইত্যাদি।এটা কীভাবে সম্ভব?

কারণ, চতুর্থ ধাপে পা দেয়া 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট এরই মধ্যে ইতিহাসের সব আলিমের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শরীয়াহর চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় এবং আবশ্যক কোনো অবস্থান থাকতে পারে যা মুসলিমদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে–এটাও সে অস্বীকার করে বসেছে। যখনই কেউ বলে–আল্লাহ্ আমাদের এমনটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন– তখনই পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি সাব্যস্ত করে তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়। কারণ, তাদের কাছে কর্তৃত্বের ধারণাটাও পুরুষতন্ত্রের ফসল।

খুব বেশি দিন চতুর্থ ধাপে থাকা যায় না। পরস্পরবিরোধী দুটো অবস্থান (ইসলাম এবং নারীবাদ) একসাথে নিজের মধ্যে ধারণ করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটা কাজ। এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবার পর, এমন-সব অবস্থান গ্রহণ করার পর নিজেকে মুসলিম মনে করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে যুক্ত হয় 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের অদ্ভুত কথাবার্তা এবং কুফরি অবস্থানের কারণে অন্যান্য মুসলিমদের কাছ থেকে আসা যৌক্তিক বিরোধিতা ও সমালোচনা। সবকিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে। নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়েও তাদের মধ্যে তিক্ততা কাজ করে।

আর তারপর...

পঞ্চম ধাপ

পঞ্চম ধাপে এসে 'মুসলিম' ফেমিনিস্ট প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়। পৌঁছে যায় খাদের কি

নারায়।

আল্লাহর যদি নারী ও পুরুষের ব্যাপারে সাম্যবাদী হন তাহলে নিজের ব্যাপারে কুরআনে কেন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করলেন?

আল্লাহ্ কেন প্রথমে আদমকে (আলাইহিস সালাম); একজন পুরুষকে সৃষ্টি করলেন? কেন প্রথমে নারীকে সৃষ্টি করলেন না?

শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন একজন পুরষ? কেন নারী নন?

কেন আল্লাহর ওয়াহি নারীর মাধ্যমে না এসে পুরুষের মাধ্যমে এল?

জন্ম নেয় একের পর এক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের স্রোত একসময় তাকে নিয়ে যায় কুফর ও রিদ্দার অন্ধকারে। আর যে প্রশ্ন দিয়ে এ পথচলা শুরু হয়েছিল সেই প্রশ্নটাই শেষ ধাক্কা দিয়ে তাকে খাঁদে ফেলে দেয়–

আল্লাহ্ কেন পুরুষতন্ত্রকে টিকে থাকতে দিলেন? আল্লাহ্ কেন হাজার হাজার বছর ধরে বিলিয়ন বিলিয়ন নারীকে পরাধীন এবং ধর্ষিত হতে দিলেন?

আর এই ধাপে এবং বাকি সব ধাপে নারীবাদের উত্তর একটাই–

আল্লাহ্ বলে কেউ নেই। ধর্ম হলো পুরুষতন্ত্রের বানানো গল্প, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখা।

সমাপ্তি।

***

নারীবাদের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এটা একটা চেইন রিঅ্যাকশনের মতো। একজন মানুষ যখন সবকিছুকে 'পুরুষতন্ত্র' দিয়ে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে তখন বাকি ধাপগুলোতে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সব ধরনের অবিচারকে পুরুষতন্ত্রের দোষ বলে চালিয়ে দেয়ার এই ব্যাখ্যা যদিও ভুল, কিন্তু এটা একটা সর্বগ্রাসী ব্যাখ্যা। আসলে পঞ্চম ধাপে থাকা ফেমিনিস্টরা আগের ৪ ধাপের মুসলিম ফেমিনিস্টদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সৎ। পঞ্চম ধাপের নারীবাদী তার আদর্শিক সমীকরণের চূড়ান্ত ধাপ পর্যন্ত গেছে। অন্যরা যায়নি।

মূল - ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজু ('নারীবাদী ইসলামের' ভয়ঙ্কর পরিণতি)
বই - সংশয়বাদী
* * *
* * *

[1] পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিণী ওই বিষয়ের, যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদের ত্যাগ করো এবং তাদের (মৃদু) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। [তরজমা, সূরা নিসা, ৩৪]
[2] তরজমা, সূরা বাক্বারাহ, ২২৮—এবং পুরুষদের ওপর নারীদেরও হাক্ব আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের ওপরও হাক্ব আছে, অবশ্য নারীদের ওপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল।
[3] আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী রাখো। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারী, যাদের তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। [তরজমা, সূরা বাক্বারাহ, ২৮২]
[4] আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক।... [তরজমা, সূরা নিসা, ১১]
[5] আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে মহিলা-সমাজ, তোমরা সা'দকা করতে থাকো। **কারণ, আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক**।
তাঁরা আরয করলেন : কী কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ?

তিনি বললেন : তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর না-শোকরী করে থাকো। **বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও** একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি।
তাঁরা বললেন : আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
তিনি বললেন : একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হাঁ।' তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি। [সহীহ বুখারী]
[6] হযরত মুয়াজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে অন্য কাউকে সিজদাহ করার আদেশ দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীদের আদেশ দিতাম তাদের স্বামীকে সিজদাহ দিতে।'-সুনানু আবি দাউদ
[7] "Personally, I have come to places where how the text says what it says is just plain inadequate or unacceptable, however much interpretation is enacted upon it", and where particular articulations in the Qur'ān as a text are problematic, there is the **"possibility of refuting the text, to talk back, to even say "no"**. Wadud, Amina. Inside the Gender Jihad, Oxford, Onworld(2006),p 209

মুসলিম সমাজে নারীবাদ দূরীকরণে করণীয়

(কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ)

১. বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞানচর্চা প্রতিষ্ঠা

মুসলিম সমাজে নারীবাদ বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞানের অভাব। যখন মুসলিম নারী-পুরুষ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজেদের পরিচয়, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না, তখন তারা পশ্চিমা মতাদর্শ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। তাই মুসলিম সমাজে সর্বপ্রথম প্রয়োজন Quran and Sunnah ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা প্রতিষ্ঠা করা।

~কুরআনের দলিল

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"তাদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে কেন একটি দল বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে তাদের জাতিকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সতর্ক হয়।"

—(সূরা আত-তাওবা, ৯:১২২)

~হাদিসের দলিল

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

"জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

—[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪]

বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায় যে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক বালিগ মুসলিম নারী-পুরুষের দায়িত্ব। ইসলামী জ্ঞানই মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্তিকর মতবাদ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

২. ইসলাম ও সংস্কৃতির পার্থক্য স্পষ্ট করা

অনেক মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক কুসংস্কার ও নারীর প্রতি অবিচারকে ইসলামের নামে উপস্থাপন করা হয়। Forced marriage, নারীশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা কিংবা পারিবারিক নির্যাতনের মতো বিষয়গুলো ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু এসবকে ইসলাম হিসেবে উপস্থাপন করার ফলে অনেক নারী feminism-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

~কুরআনের দলিল

اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ও সদাচারের নির্দেশ দেন।"

— সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০

~হাদিসের দলিল

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

"তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।"

— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৮৬

— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৬৮

বিশ্লেষণ

ইসলাম নারীর প্রতি জুলুম সমর্থন করে না। তাই মুসলিম সমাজকে বুঝতে হবে যে culture কখনোই Islam নয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে পারলে নারীবাদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা দুর্বল হয়ে পড়বে।

৩. পরিবারব্যবস্থা সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করা

Modern feminism-এর অন্যতম আক্রমণের লক্ষ্য হলো traditional family structure। অথচ ইসলাম পরিবারকে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

~কুরআনের দলিল

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وجعل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

"তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"

— সূরা আর-রূম, ৩০:২১

~হাদিসের দলিল

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম।"

— জামে তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫

বিশ্লেষণ

ইসলাম পরিবারকে একটি ইবাদতপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে। তাই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মান, সন্তানদের ইসলামী تربية এবং পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী করতে হবে।

৪. শালীনতা ও ইসলামী নৈতিকতা রক্ষা

নারীবাদের অনেক ধারা unrestricted freedom ও sexual autonomy প্রচার করে, যা মুসলিম সমাজে নৈতিক সংকট সৃষ্টি করছে। ইসলাম শালীনতা, লজ্জাশীলতা ও নৈতিক পবিত্রতার উপর গুরুত্বারোপ করে।

~কুরআনের দলিল

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

"মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"

— সূরা আন-নূর, ২৪:৩১

~হাদিসের দলিল

«الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

“লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।”

— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৩৫

বিশ্লেষণ

ইসলামী সভ্যতার অন্যতম সৌন্দর্য হলো haya বা লজ্জাশীলতা। তাই মুসলিম সমাজে modesty culture পুনরুজ্জীবিত করা এবং অশ্লীলতা প্রতিরোধ করা জরুরি।

৫. মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলা

বর্তমানে social media, cinema ও entertainment industry feminism ও immoral lifestyle প্রচারের বড় মাধ্যম।

~কুরআনের দলিল

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”

— সূরা আন-নূর, ২৪:১৯

~হাদিসের দলিল

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”

— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৯৩

— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮২৯

বিশ্লেষণ

মুসলিম সমাজে ইসলামিক মিডিয়া, halal entertainment ও educational content বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে নতুন প্রজন্ম নৈতিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে।

৬. মুসলিম নারীদের প্রকৃত অধিকার বাস্তবায়ন

যখন মুসলিম সমাজ ইসলামে প্রদত্ত নারীর অধিকার বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়, তখন feminism বিকল্প সমাধান হিসেবে প্রবেশ করে। তাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে।

~কুরআনের দলিল

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“নারীদের জন্যও ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের উপর দায়িত্ব।”

— সূরা আল-বাকারা, ২:২২৮

~হাদিসের দলিল

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ :الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»

“আমি এতিম ও নারীর অধিকার নষ্ট করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা দিচ্ছি।”

— সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৬৭৮

বিশ্লেষণ

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই মুসলিম সমাজকে নারীর প্রকৃত ইসলামি অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. তরুণ প্রজন্মকে ইসলামী পরিচয়ে গড়ে তোলা

বর্তমান প্রজন্ম social media ideology দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হচ্ছে। তাই ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের Islamic worldview শেখাতে হবে।

~কুরআনের দলিল

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরিম, ৬৬:৬

~হাদিসের দলিল

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ»

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।”

— সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৫

বিশ্লেষণ

ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের ইসলামী আকীদা, নৈতিকতা, haya ও family values শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা বিভ্রান্তিকর মতাদর্শ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, নারীবাদ কেবল একটি নারী অধিকার আন্দোলন নয়; বরং এটি আধুনিক বিশ্বের একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাদর্শন, যা মানুষ, পরিবার, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চায়। এর কিছু দাবি মানবিক অবিচারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভূত হলেও এর বহু ধারা ধীরে ধীরে আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক কাঠামো, পরিবারব্যবস্থা ও gender balance-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ফলে মুসলিম সমাজে নারীবাদের প্রভাব শুধু সামাজিক পরিবর্তন নয়; বরং আকীদা, নৈতিকতা ও সভ্যতাগত পরিচয়ের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়; বরং পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ইসলাম neither oppression nor absolute liberalism; বরং justice, balance and responsibility-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে নারীকে সম্মান দেওয়া হয় তার ঈমান, চরিত্র, taqwa ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে—পুঁজিবাদী ভোগবাদ বা বাহ্যিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নয়।

আজ মুসলিম উম্মাহর সামনে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো—ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ও ভারসাম্যপূর্ণ নারী-দর্শনকে পুনর্জীবিত করা। কারণ যখন মুসলিম সমাজ নিজেই কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যায়, তখনই বিভ্রান্তিকর মতবাদগুলো "মুক্তি"র বিকল্প স্লোগান নিয়ে প্রবেশ করে। তাই প্রয়োজন এমন এক প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা পশ্চিমা মতাদর্শ দ্বারা নয়; বরং ওহীর আলো দ্বারা নিজেদের পরিচয় নির্ধারণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾

"অতঃপর তারা যদি তোমাদের মতো ঈমান আনে, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"

— সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৭

অতএব মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণ কোনো imported ideology (আমদানিকৃত মতবাদ)-এর মাধ্যমে নয়; বরং Quran ও Sunnah-কেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। কারণ প্রকৃত স্বাধীনতা সেই জীবনব্যবস্থাতেই নিহিত, যা মানুষকে তার রবের সাথে সংযুক্ত করে, পরিবারকে নিরাপদ রাখে এবং সমাজকে নৈতিক ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে।

রেফারেন্সঃ(ধারাবাহিকভাবে)

১.ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
(লেখকঃসাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভি)
২.মাসিক আল কাউসার পত্রিকা
৩.মুসলিম নারীদের বীরত্বগাথা
(লেখকঃআল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.)
৪.ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি
(লেখকঃশায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি)
৫.নির্ভরযোগ্য জার্নাল ও ডিবেটের লিখিতরূপ
৬.হিউম্যান বিয়িং
(লেখকঃ ইফতেখার সিফাত)
৭.বুদ্ধিভিত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত
(লেখকঃ মাওলানা ইসমাঈল রেহান)
৮.সফলতার কান্না
(লেখিকাঃ সিলভিয়া অ্যান হিউলেট)
৯.FATEH 24(হকের পক্ষে) সংবাদমাধ্যম
১০.সংশয়বাদী
(লেখকঃড্যানিয়েল হাক্কিকাতজু)